বিজ্ঞাপন।

অধুনা হিন্দুসমাজে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চ্চা পূর্ব্বাপেক্ষা অতি অল্পমাত্র হওয়াতে আস্তিক সম্প্রদায়ের অনেকেই
অনভিজ্ঞতা বশতঃ ক্রমশঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব
সন্দিহান হইয়া উঠিতেছেন। এমন কি,
দিন উচ্ছিন্ন প্রায় হইতেছে। এই নিমি
ত্মারা নানাস্থানে নানা প্রকার ধর্ম্ম-সং
করিতেছেন*। এই রূপে এই নদীয়া জে
ড়িতে একটী ধর্ম্মরক্ষণী সভা সংস্থাপিত
সভাতে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধর্ম্ম সংক্র
বক্তৃতা করি, তৎশ্রবণে অত্রত্য অনেক
সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য সকল সরল বঙ্গী
কারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছি
[illegible]শ অতি অল্প, বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে
নামক একখানি ভক্তিবিষয়ক সংগীতগ্র
ক্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এই গ্রন্থ
নাই। তদনন্তর কিঞ্চিৎ অবকাশ পা
নামে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি।
অনুসারে সাংসারিক ও পারমার্থিক
উপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গ্রন্থ চারি ভাগে বি

* যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে আছে যে, রাজা দশরথ সভা কা[illegible]
যোগ শুনিয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে।

ইহার প্রথম ভাগে বিংশতি অধ্যায় ও দ্বিতীয় ভাগে একাদশ অধ্যায় ও তৃতীয় ভাগে দ্বাবিংশতি অধ্যায় ও চতুর্থ ভাগে অষ্টমাধ্যায় এইরূপে ভাগচতুষ্টয়ে একষষ্টি বিষয় ও তদন্তর্গত অনেক বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা আছে। এতাবতায় এই গ্রন্থে সাংসারিক ও পারমার্থিক প্রয়োজনীয় বিষয় সকলই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ সকল বিষয় শাস্ত্রীয় যুক্তি ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে যে লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞ ও পণ্ডিত মহাশয়েরা অনুমোদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় ও নানাবিধপদার্থ জ্ঞান হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব নিবেদন, পাঠক মহোদয়গণ ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক একবার পাঠ করিবেন, তাহাতেই আমার পরিশ্রমের সার্থকতা হইবেক। অতঃপর ইহাও বলিতে সাহসী হইতেছি না যে, মহোদয়গণ ইহার সকল দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গ্রহণ করুন। কারণ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির কৃত গ্রন্থে অবশ্যই অনেক দোষ থাকিতে পারে। তাহা সমুদায় পরিত্যাগ করিলে পাছে গ্রন্থ খানি পরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে। তবে তাঁহারা ঔদার্য্যগুণে ইহার গুণ গ্রহণ করেন, তাহাতে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। ফলতঃ ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যদি কেহ কোন দোষ দৃষ্টি করেন, তবে তাহা লিখিলে সন্তুষ্ট হইব। কেননা ঐ দোষ সঙ্গত হইলে পশ্চাৎ তাহার সংশোধনের উপায় বিধান করা যাইবেক।

সাঙ্কাডাঙ্গা।
২০এ ভাদ্র, ১২৮৭ সাল। } শ্রীজনমেজয় ঘটক।

সমালোচিত বিজ্ঞাপন।

———***———

এই পুস্তকের অনেক বিষয় সমালোচনা হওয়াতে কেহ কেহ বলেন যে, ইহার দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম অধ্যায়, যাহাতে পৃথিবী ঘোরে না লেখা আছে, তাহা নব্য সম্প্রদায়ের এবং প্রচলিত শিক্ষা বিভাগের মতের বিপরীত বিধায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না এই অধ্যায় পরিত্যাগ করিলে উহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ৫ ও ৬ অধ্যায়, যাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত পৃথিবীস্থিতি ও রাশিচক্রের বিবরণ লেখা আছে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হয়, নতুবা তাহা অসমাপ্ত থাকে এবং এই দুই অধ্যায় সমেত পরিত্যক্ত হইলে হিন্দু শাস্ত্র মতে পৃথিবীস্থিতি ও দিবারাত্রি প্রভৃতি কি প্রকারে হয়, তাহার বিবরণ প্রকাশ না হওয়ায় গ্রন্থে একটী প্রধান বিষয়ে অসম্পূর্ণ দোষ ঘটিয়া উঠে। এই উভয় সঙ্কট দোষের পরিহার জন্য নিবেদন এই যে, যিনি পৃথিবী ঘোরে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি ও শিক্ষাবিভাগের পক্ষে দূষ্য জ্ঞান হইলে ঐ বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্রগণ মনে মনে প্রোক্ত সপ্তম অধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য অধ্যায় সকল পাঠ করিবেন, নতুবা এই উভয় সঙ্কট নিবারণের অন্য উপায় নাই, নিবেদন ইতি।

শ্রীজনমেজয় ঘটক।

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

বিষয়	অধ্যায়।	পৃষ্ঠা।
তাঁহার কার্য্য সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করা ...	৬	২০
শাস্ত্র সকল ঈশ্বর হইতে প্রকাশ হয় ...	৭	২১
শাস্ত্রের নাম এবং যে শাস্ত্রে যাহা আছে তাহার বিবরণ	৮	২৫
শাস্ত্র সকল লিখিত হওয়ার সময় নিরূপণ ...	৯	৩১
গৌতম প্রণীত ন্যায়-দর্শন বিলুপ্ত হওয়ার কারণ	১০	৩৩
প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রের উৎপত্তি বিবরণ ...	”	”
পরমাণু ও দিক কাল গগণ এবং জীব গৌণ নিত্য থাকার মীমাংসা ...	”	৩৪
বৈশেষিক দর্শনের সহিত ন্যায় দর্শনের ঐক্য মীমাংসা	”	৩৬
সাংখ্যদর্শনের সার ...	১১	৩৭
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপণ ...	”	”
বেদান্ত-দর্শনের সার ✓ ...	১২	৩৮
সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনের ঐক্য মীমাংসা ...	১৩	৪০
দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও ঐক্য মীমাংসা ...	১৪	৪২
নানাশাস্ত্র মতে ঈশ্বরের স্বরূপ ও কার্য্য নির্ণয় ✓	১৫	৪৪
সৃষ্ট্যাদির কারণ-স্বরূপা শক্তি নির্ণয় ...	১৬	৪৯
অনন্ত শব্দের ব্যাখ্যা ...	”	”
সগুণ ব্রহ্মনির্ণয় ✓ ...	১৭	৫১
সাকার নিরাকার মীমাংসা ...	”	৫২
প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় ...	১৮	৫৪
প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ...	”	”
অপরা ও পরা প্রকৃতি ...	”	”
প্রবাহরূপে প্রকৃতি ও জগতের অনাদিত্ব মীমাংসা	”	৫৫
জগৎ সত্য মিথ্যা থাকার বিচার ...	”	”
সাকার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কালী দুর্গা প্রভৃতি একই ঈশ্বর পদার্থ ব্যতীত ভিন্ন পদার্থ না থাকা মীমাংসা	১৯	৫৮

দ্বিতীয় ভাগ।

তৃতীয় ভাগ।

বিষয়		অধ্যায়।	পৃষ্ঠা।
খণ্ডনীয় প্রারব্ধ	...	৬	১৪৩
পুরুষকারের শ্রেষ্ঠতা	...	,,	১৪৫
ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়	...	৭	১৬৬
ধর্ম্মাধর্ম্ম শাস্ত্রমূলক ব্যতীত যুক্তিমূলক নহে		,,	১৪৯
ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বেচ্ছাচারীর মতে প্রচলিত না থাকা কার্য্যের বিধি নির্দ্দেশ	...	৮	১৫০
উৎপত্তিবিধি, উপায়বিধি	..	,,	,,
নিয়ম পরিসংখ্যা নিষেধ পর্য্যুদাস বিধি নির্ণয়		,,	১৫১
কি কার্য্যে ধর্ম্ম ও কি কার্য্যে অধর্ম্ম হয়	...	,,	১৫২
রাজা ও রাজনিয়ম কি	...	৯	১৫৩
ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ও অদৃষ্টবশতঃ লোকে রাজপদ প্রাপ্তের যোগ্য	...	,,	১৫৪
নানা প্রকার ধর্ম্মের কারণ নির্ণয়	...	১০	১৫৫
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি আদিম জাতি থাকার মীমাংসা	...	,,	,,
নানা প্রকার জাতির উৎপত্তি মীমাংসা	...	,,	,,
ভারতবর্ষের বিশেষ ধর্ম্ম	..	১১	১৫৯
ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থের ধর্ম্ম	...	,,	১৬০
সংন্যাসীর ধর্ম্ম	...	,,	১৬১
গৃহস্থের ধর্ম্ম	...	১২	,,
চারি জাতির ব্যবহারিক ধর্ম্ম	...	,,	১৬২
পারমার্থিক ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিহার	...	,,	১৬৩
চারিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ	..	১৩	১৬৫
ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন	...	,,	,,
কলিযুগের ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্ণন	...	,,	১৬৭
দেবতা নির্দ্দেশ	...	১৩	১৭০

বিষয়		অধ্যায়।	পৃষ্ঠা।
অসুরের উৎপত্তি	...	১৪	১৭১
বুদ্ধ অবতারের বিবরণ	...	,,	১৭৪
দেবতাদিগের পূজা ও হোমের প্রয়োজন		,,	১৭৫
পিতৃলোক নির্দ্দেশ	...	১৫	,,
পিতৃমাতৃভক্তির কারণ	...	,,	১৭৭
শ্রাদ্ধের প্রয়োজন	...	,,	১৭৮
শ্রাদ্ধের ও দেবপূজার দ্রব্যাদির নিয়ম	...	১৬	১৮০
স্তবের আবশ্যকতা ও তাহার ফল	...	,,	,,
যজ্ঞাদিতে পশু হিংসার বিধি	...	১৭	১৮৩
স্ত্রীপশু হিংসা নিষেধ ও তাহার কারণ নির্ণয়		,,	১৮৪
বলিদান বিষয়ক বিচার ও বৈধহিংসার দোষ না থাকা নির্ণয়	...	,,	,,
নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত থাকায় স্বধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য ১৮৬			১৮
স্বধর্ম্ম নির্ণয়	...	,,	১৮৭
পৈত্রিক ধর্ম্ম যাজন করা কর্ত্তব্য	...	,,	১৯০
স্বেচ্ছাচার অনুচিত	...	,,	১৯১
স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নির্ণয়	...	১৯	১৯২
পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নির্ণয়	...	,,	,,
ব্যভিচার দূষণাবহ	...	,,	৯৩
স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ	..	,,	১৯৫
অহল্যা প্রভৃতির সতীত্ব বর্ণন	...	,,	১৯৬
বালকের-ধর্ম্ম নির্ণয়	...	,,	১৯৮
পরমায়ুর সংখ্যানিরূপণ	...	,,	,,
ব্যক্তি ভেদে পরমায়ুর হ্রাস ও বৃদ্ধির বিবরণ		,,	১৯৮
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না থাকায় ঐরূপ ঘটনা হওয়া নির্ণয়	...	,,	,,

---

চতুর্থ ভাগ।

জ্ঞানতত্ত্বদর্শন।

প্রথম ভাগ।

মঙ্গলাচরণ

দুর্গাশঙ্করপাদাব্জং, ভক্ত্যা নত্বা প্রকাশ্যতে।
ময়া সর্ব্বোপকারায় জ্ঞানতত্ত্বস্য দর্শনং॥
তত্র বিঘ্নবিঘাতায় তথৈবাশু সমাপ্তয়ে।
অজ্ঞানধ্বান্তনাশায় সর্ব্বকল্যাণহেতবে।
সরস্বত্যৈ তথা লক্ষ্মৈ বিষ্ণবে পরমেষ্ঠিনে,
গণেশায় দিনেশায় গুরুদেবায় বৈ নমঃ॥

সারার্থ।

দুর্গা এবং শিবের পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া সকলের উপকারের জন্য জ্ঞানতত্ত্বদর্শন নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। এই গ্রন্থের বিঘ্ন বিনাশের ও তাহা শীঘ্র সমাপ্তি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধাকার-নাশক এবং সকল কল্যাণের হেতু সরস্বতী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, গণেশ, সূর্য্য এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি।

প্রথম অধ্যায়।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য, নাম ও উপক্রম।

অধুনা চারি প্রকার মনুষ্য দেখা যায়, তন্মধ্যে কেহ কেহ ইহকালের সুখসম্ভোগকে উপেক্ষা করিয়া কেবল পরকালের চিন্তায় নিমগ্ন, কেহবা পরলোককে বিসর্জ্জন দিয়া ইহকালের সুখাস্বাদনে নিরত আছেন এবং কেহ কেহ ইহকালে সুখী নহেন, অথবা পরকালেরও শুভ চেষ্টা করেন না; কতকগুলি লোক ইহকাল ও পরকালের সুখের চেষ্টায় থাকেন। এই চতুর্বিধ লোকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর নাই ও পরকালও নাই। কেহ বলেন যে, ঈশ্বর আছেন ও পরকালও আছে। এই উভয়বিধ ব্যক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে নাস্তিক ও কুতর্কবাদী এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে আস্তিক সম্প্রদায়ের লোক বলা যায়। ঐ আস্তিক সম্প্রদায়ের লোকেরা কি জন্য ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা অনেকেই জানেন না। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দেন যে, পুরুষানুক্রমে সকলেই ঈশ্বর ও পরকাল থাকা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন বলিয়া আমরাও মান্য করি। কিন্তু সময় সময় কুতর্কবাদীদিগের সংসর্গে পতিত ও তাহাদিগের কুতর্কে মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব নাই বলিয়া স্থির করেন; ইহা কেবল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত না থাকাতেই ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের যে, আপৎকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ফলতঃ অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতীত ধন উপার্জ্জন করা ঘটে না এবং ধন ব্যতীত ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না; সুতরাং অর্থশাস্ত্রে নিমগ্ন হইতে হয় বলিয়া, পারমার্থিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কঠিন হইয়াছে। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় শাস্ত্র সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও বহু বিস্তৃত থাকায়, তাহা সহজে সকলের বোধগম্যও হয় না; তজ্জন্য আস্তিকসমাজের অনেক বিশৃঙ্খলতা ঘটিতেছে। অতএব আস্তিকসমাজের লোকেরা সহজে এ দেশীয় শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ও জীবের স্বরূপ,

এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইহকাল, পরকালে সুখ দুঃখের কারণ জ্ঞান এবং মুক্তি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল অবগত হইয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত আমি অনেক মহোদয়গণের অনুরোধে সরল বঙ্গীয় ভাষায় এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু আমার বিদ্যা বুদ্ধি অতি অল্প বিধায়, আমি একটী ক্ষুদ্র মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত; তাহাতে এই বৃহৎ ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইয়া কত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা জগদীশ্বর জানেন। ফলতঃ ইহাতে ঈশ্বরের নাম স্বরূপ এবং কার্য্য প্রভৃতি গুণানুবাদ বর্ণিত থাকায় গ্রন্থ খানি অবশ্যই সাধুসমাজে আদরণীয় হইবেক, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি আরও ভরসা করি যে, কুতর্কবাদী মহাশয়েরা স্বকপোলকল্পিত কুতর্ক সকল পরিত্যাগ করিয়া, মনোনিবেশপূর্ব্বক ইহা এক এক বার পাঠ করিলে, তাঁহাদিগকে পুনরায় কুতর্কে আক্রান্ত হইতে হইবেক না। তবে তাঁহারা অভিসন্ধিপূর্ব্বক স্বীয় কুতর্ক বলবৎ করিতে চেষ্টা করিলে তাহার উপায় নাই। কারণ যে ব্যক্তি যত প্রকার সিদ্ধান্তই করুন্ না কেন, বুদ্ধিমান লোকেরা তাহার উপর পুনরায় কুতর্ক করিতে পারেন; কিন্তু চির কাল যে কুতর্ক করিতেই হইবেক, ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব অজ্ঞ ও কুতর্কবাদীদিগের কুতর্কাদি দোষ সকলের পরিহার এবং আস্তিক সমাজের লোকদিগের ঈশ্বরে অস্তিত্বাদি বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন ও সর্ব্বসাধারণের উত্তম জ্ঞান লাভ হইবার উদ্দেশে এই জ্ঞানতত্ত্বদর্শন নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। যেরূপ বৃহৎ পুষ্পোদ্যানের মধ্যে জনৈক পুষ্পার্থী ব্যক্তি গমন করতঃ কতকগুলি বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুষ্প চয়ন করিয়া একটী পাত্র পরিপূর্ণ করে; তদ্রূপ আমিও প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের কৃত মীমাংসার কিয়দংশ সার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইতেছি। ফলতঃ এই গ্রন্থে আমার স্বকপোল কল্পিত কোন ব্যাপার লিখিত হইবেক না; তবে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইবেক; তাহাতে আমার কোন প্রকার প্রগল্‌ভতা আদি দোষের সম্ভাবনা নাই। অতঃপর এই গ্রন্থে যে যে বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা করা যাইবেক, তাহার উপক্রম করা যাইতেছে। এই গ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত হইবেক। তাহার প্রথম ভাগের প্রথমাধ্যায়ে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, নাম এবং উপক্রম; দ্বিতীয়ে ন্যায়, যুক্তি, প্রমাণ ও নিত্যানিত্যের লক্ষণ; তৃতীয়ে জগৎ কাহাকে বলে ও তাহা

নিত্য, কি উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট; চতুর্থে জগতের কর্ত্তা নিরূপণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বনির্ণয়; পঞ্চমে পরমাণুনির্ণয় ও স্বভাবের মীমাংসা; ষষ্ঠে জগৎকর্ত্তার নাম, স্বরূপ ও কার্য্যবিবরণ; সপ্তমে শাস্ত্র কি ও তাহা কোথা হইতে প্রকাশ হইয়াছে; অষ্টমে শাস্ত্র কত প্রকার, তাহার নির্ণয়; নবমে শাস্ত্র কোন্ সময় লিখিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ; দশমে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন শাস্ত্রের সার ও ঐক্য মীমাংসা; একাদশে সাংখ্য-দর্শন-শাস্ত্রের সার; দ্বাদশে বেদান্ত-দর্শনের সার; ত্রয়োদশে সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনের ঐক্য মীমাংসা; চতুর্দ্দশে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও সারভাগের ঐক্য নির্ণয়; পঞ্চদশে নানা শাস্ত্রের যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও কার্য্য নির্ণয়; ষোড়শে সৃষ্ট্যাদির কারণস্বরূপা শক্তিনির্ণয়; সপ্তদশে সগুণ ব্রহ্মনির্ণয়; অষ্টাদশে প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়; ঊনবিংশে সাকার প্রকৃতিপুরুষনির্ণয়; এবং বিংশে পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব নির্ণয়।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথমাধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রণালীর সংক্ষেপ বিবরণ; দ্বিতীয়ে সৃষ্টি-বিষয়ক বিস্তারিত মীমাংসা; তৃতীয়ে স্থূল দেহের উৎপত্তি বিবরণ; চতুর্থে সৃষ্টিবিষয়ক নানা শাস্ত্র এবং নিরাকার ও সাকারের কার্য্য মীমাংসা; পঞ্চমে পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের স্থিতি; ষষ্ঠে রাশি চক্রের বিবরণ; সপ্তমে পৃথিবীর আবর্ত্তন অর্থাৎ ভ্রমণবিষয়ক বিচার; অষ্টমে পৃথিব্যাদির স্থিতির কালনির্ণয়; নবমে প্রলয়নির্ণয়; দশমে ঈশ্বরের নিয়মাধীন কার্য্যের প্রবলতা ও পদার্থ-বিচার; একাদশে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নির্দ্দয়তা দোষের পরিহার।

তৃতীয় ভাগের প্রথমাধ্যায়ে জীবের স্বরূপ নির্ণয়; দ্বিতীয়ে সুখ ও দুঃখ কি; তৃতীয়ে জীবের পরলোকগমন কি প্রকারে হয়; চতুর্থে জীবের পর-লোকে স্বর্গ ও নরক ভোগ কিরূপে হয়; পঞ্চমে জীবের পুনর্জ্জন্ম কি প্রকারে হয়; ষষ্ঠে অদৃষ্ট ও পুরুষকারনির্ণয়; সপ্তমে ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়; অষ্টমে কার্য্যের বিধিনির্দ্দেশ; নবমে রাজা ও রাজনিয়ম; দশমে নানাপ্রকার ধর্ম্মের কারণ নির্ণয়; একাদশে ভারতবর্ষের বিশেষ ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসীর ধর্ম্মনির্ণয়; দ্বাদশে গৃহস্থের ধর্ম্ম; ত্রয়োদশে যুগধর্ম্মনিরূপণ এবং কলিযুগের অবস্থা বর্ণন; চতুর্দ্দশে দেবতা নির্দ্দেশ ও তাঁহাদিগের পূজার প্রয়োজন; পঞ্চদশে পিতৃলোক ও তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা;

ষোড়শে শ্রাদ্ধ ও দেব পূজার দ্রব্যাদির নিয়ম ও স্তবের ফল; সপ্তদশে যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার কারণ; অষ্টাদশে নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিতের মধ্যে স্বধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য ও স্বেচ্ছাচার অনৌচিত্য; ঊনবিংশে স্ত্রীলোকের ও বালকের ধর্ম্মনির্ণয়; বিংশে পরমায়ুর সংখ্যা ও সদসৎ কার্য্যে তাহার বৃদ্ধি ও ক্ষয়নির্ণয়; একবিংশে ঈশ্বরের অবতারের কারণ ও প্রকার ভেদ এবং দ্বাবিংশে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার নির্ণয়।

চতুর্থ ভাগের প্রথমাধ্যায়ে বৈরাগ্যলক্ষণ; দ্বিতীয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণ; তৃতীয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়; চতুর্থে জ্ঞানীর লক্ষণ; পঞ্চমে মুক্তি ও তাহার প্রকার-ভেদ; ষষ্ঠে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয় সপ্তমে গ্রন্থের উপসংহার এবং অষ্টমে পরমেশ্বরের স্তব ও গ্রন্থসমাপ্তি। এই সকল বিষয় এবং ইহার আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ের মীমাংসা করা যাইবেক। ফলতঃ ইহা কোন একখানি গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ হইতেছে না; কারণ পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা সকল পর্য্যায়ক্রমে কোন এক খানি গ্রন্থে থাকা দৃষ্ট হয় না বলিয়া, মধুমক্ষিকার মধু-সংগ্রহের ন্যায় নানা শাস্ত্রের নানা স্থান হইতে সার সঙ্কলন করা যাইতেছে; সুতরাং ইহাকে সারসংগ্রহগ্রন্থ বলা যাইবেক। এক্ষণে তদ্বিষয়ে অধিক বাগাড়ম্বরে ক্ষান্ত থাকিয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ন্যায় যুক্তি, প্রমাণ এবং নিত্যানিত্যের লক্ষণ অগ্রে মীমাংসা না করিলে কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করা যায় না। অতএব ঐ সকল বিষয় মীমাংসা করা যাউক্।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ন্যায় যুক্তি ও প্রমাণ এবং নিত্যানিত্যের লক্ষণ।

উপক্রমের লিখিত মত জগৎ নিত্য, কি উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে ন্যায়যুক্তি ও শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা ব্যতীত মীমাংসিত হইতে পারে না। ঐ যুক্তি আবার ন্যায্য তর্কের দ্বারা খণ্ডিন হইতে না পারিলে, সেই যুক্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে। অতএব বিষয়,

সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ, প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত এই পাঁচ প্রকারে যে যুক্তি নির্ণয় হয়, ঐ যুক্তিই গ্রহণীয়। বিষয় অর্থাৎ বিচার যোগ্য বাক্য; সন্দেহ অর্থাৎ সংশয়; পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ অসম্ভাবনা-প্রতিপাদন, যাহা সম্ভব নহে তাহা প্রতিপন্ন করণের চেষ্টা; প্রমাণ অর্থাৎ মীমাংসার পথপ্রকাশক; সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আরোপিত দোষ সকল নিরাকরণ পূর্ব্বক সঙ্গত অর্থ নির্ণয়; কিন্তু প্রমাণ ইহার মূল কারণ, কেননা প্রমাণ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্তই স্থির হইতে পারে না। কারণ স্বপক্ষ প্রতিপাদনে সকল পক্ষই যত্নবান্ হওয়ায়, প্রমাণ ব্যতীত কোন উপায় নাই। প্রমাণ, প্রমার করণকে বলে; প্রমা অর্থাৎ জ্ঞান, তাহার করণকে প্রমাণ বলা যায়। ঐ জ্ঞান দুই প্রকার অনুভূতি অর্থাৎ অনুভব এবং স্মৃতি অর্থাৎ সংস্কার জন্য স্মরণ। সংস্কার স্বভাবতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের কার্য্য বশতঃ অথবা উপদেশ জন্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, কখন কখন স্বপ্ন জন্য সংস্কার হয়। এই দুই প্রকার প্রমা; ইহার করণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং উপকরণ শাস্ত্রনিদর্শন, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, সাক্ষী লেখ্য প্রভৃতি; ইহাদিগকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ চারি প্রকার; প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সাক্ষাৎ প্রমাণ বলা যায়। তাহা ছয় প্রকার অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও মনঃ; ইহারা যে সময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত যোগ প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ ভাবে স্ব স্ব কার্য্য সকল পৃথক পৃথক্ রূপে পরিচালন করিতে থাকে, সেই সময় তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা যায়। পৃথক্ পৃথক্ রূপে বলার তাৎপর্য্য এই যে, এক ইন্দ্রিয় দ্বারা তৎকার্য্য সাধন ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না; কেননা চক্ষুর দ্বারা দর্শন ব্যতীত ঘ্রাণ হইতে পারে না; ঘ্রাণ নাসিকার কার্য্য।

অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের নিশ্চয় করণের হেতুর নাম অনুমান প্রমাণ। কিন্তু হেতু সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ব্যতীত লক্ষ্য বস্তুর অনুমান হয় না; যথা রন্ধন-শালায় চুল্লী অর্থাৎ চুলা হইতে যে রূপ অগ্নির ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ ধূম পর্ব্বতের গুহা হইতে নির্গত হওয়া দেখিলে, ঐ গুহাতে অগ্নি না দেখা সত্ত্বেও, তথায় অগ্নি থাকার অনুমান হয়; কিন্তু ধূম দর্শন ব্যতীত অগ্নির অনুমান হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, ইচ্ছা থাকিলে প্রত্যক্ষ

বিষয়েরও অনুমান হয়; কিন্তু তাহা দর্শন প্রত্যক্ষ বিষয়ে সঙ্গত নহে, তবে অন্যান্য প্রত্যক্ষ স্থলে ঐ রূপ হইতে পারে।

উপমান প্রমাণকে সাদৃশ্য প্রমাণ বলে; অর্থাৎ এক বস্তুর সদৃশ অন্য বস্তু থাকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ ঐ সদৃশ বস্তু দর্শনকে সাদৃশ্য প্রমাণ বলা যায়। যথা কেহ গোরুর সদৃশ গবয় নামে একটী জন্তু আছে, ইহা কোন ব্যক্তির মুখে পূর্ব্বে শুনিয়া, পশ্চাৎ গবয় দর্শন করে; ইহাই উপমান প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ শব্দ দ্বারা বিষয়ের অনুভব হওয়াতে শব্দকে প্রমাণ বলে। শব্দ, দুই প্রকার—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক; যে সকল শব্দ আঘাত দ্বারা অথবা স্বভাব বশতঃ মৃদঙ্গ, মুরজাদি হইতে কেবল ধ্বনি মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ধ্বন্যাত্মক ও কণ্ঠ তালুর অভিঘাত দ্বারা উচ্চারিত অকারাদি বর্ণ রূপ শব্দকে বর্ণাত্মক বলা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, বর্ণাত্মক শব্দই প্রমাণ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রমাণ নহে; কিন্তু ইহা অসঙ্গত; কারণ ধ্বন্যাত্মক শব্দ অনেক সময় স্থল বিশেষে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যদিচ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণের মূল ও তাহা ব্যতীত অন্য প্রমাণ সকল স্বাধীন নহে; কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা লোকের স্পষ্ট রূপ বোধের নিমিত্ত ঐ চারি প্রকার প্রমাণ বর্ণন করিয়াছেন; ও তাহা সচরাচর স্থল বিশেষে পৃথক্ রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকায়, ঐ চারি প্রকার প্রমাণের বিবরণ লিখিত হইল। এক্ষণে নিত্য ও অনিত্য কি এবং তাহা কত প্রকার, তাহার মীমাংসা করা যাউক।

নিত্য চিরস্থায়ী বস্তুকে বলে; তাহা দুই প্রকার, মুখ্য নিত্য ও গৌণ নিত্য। যাহা অতীত এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই কালত্রয়ে সমভাবে থাকে; ও যাহা ছয় প্রকার বিকারবর্জিত হয় অর্থাৎ যাহার জন্ম, এবং জন্মিয়া বর্ত্তমানতা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ না থাকে, তাঁহাকে মুখ্য নিত্য বলে *। যে বস্তু উৎপন্ন হইয়া বহুকাল স্থিতির পরে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ঐ রূপ সৃষ্ট স্থিত ও বিনষ্ট হয়; এবং প্রবাহ রূপে চিরকাল ঐ রূপ

* জন্ম উৎপত্তি। জন্মিয়া বর্ত্তমান অর্থাৎ স্থিতি, বৃদ্ধি বড় হওয়া, পরিণাম, রূপান্তর, যে রূপ দুগ্ধের পরিণাম দধি ঘৃত। কিন্তু সুবর্ণের কুণ্ডল, মৃত্তিকার ঘট প্রকৃত পরিণাম নহে; তাহা আরোপ পরিণাম। অপক্ষয়, (কিয়দংশ ক্ষয়) বিনাশ, এককালে ধ্বংস।

হইতে থাকে, তাহাকে গৌণ নিত্য বলা যায়। কেহ কেহ ঐ গৌণ নিত্যকে নিত্যানিত্য বলিয়া থাকেন। কেননা উৎপত্তি বিনাশের বিরাম না থাকায়, তাহার প্রবাহকে নিত্য এবং বস্তুর উৎপত্তি হইয়া বিনষ্ট হওয়াতে তাহাকে অনিত্য বলা যাইতে পারে। ফলতঃ অনিত্য শব্দের অর্থ দ্বারাও ঐ রূপ মীমাংসা হইতেছে। কেননা নিত্য শব্দে নঞ যোগ করিলে অনিত্য হয়; ঐ নঞের অর্থ ছয় প্রকার—সাদৃশ্য, অভাব, অন্যত্ব, অল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ; এই ছয় প্রকারের মধ্যে সাদৃশ্য, অল্পতা এবং অপ্রাশস্ত্য এই তিন প্রকার অনিত্যকে গৌণ নিত্য অথবা নিত্যানিত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যে হেতু নিত্য সদৃশ অল্প নিত্য এবং অপ্রশস্ত নিত্য বলিলে এককালীন নিত্যাভাব বুঝা যায় না; অতএব গৌণ নিত্যও তদ্রূপ; নিত্যাভাব অথবা সম্যক্ প্রকারে নিত্য নহে। আর যে স্থলে নিত্য রহিত অনিত্য শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সে স্থলে অভাব, অন্যত্ব এবং বিরোধ, এই তিন প্রকার নঞার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে, যথা যে বস্তু উৎপন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পুনরায় আর উৎপন্ন হয় না, তাহাকে নিত্য বিরুদ্ধ অথবা নিত্য ভিন্ন কিম্বা নিত্যাভাব রূপ অনিত্য বলা যায়। এই সকল কারণে নিত্য শব্দে মুখ্য নিত্য অথবা গৌণ নিত্য, এবং অনিত্য শব্দে গৌণ নিত্য অথবা নিত্যাভাব বুঝায়। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা যে যে স্থলে নিত্য অথবা অনিত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে স্থল বিশেষে যুক্তি সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবেক। যথা শাস্ত্রে আছে যে, পরমেশ্বর নিত্য; সেস্থলে পরমেশ্বরকে মুখ্য নিত্যই বলিয়াছেন; এমত অনুমান করিতে হইবেক। এবং শাস্ত্রকারেরা জগৎ নিত্য বলিয়া যেস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন; সেস্থলে জগৎকে গৌণ নিত্য; এবং যে স্থলে জগৎ অনিত্য বলিয়াছেন, তথাতেও গৌণ নিত্য বলাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক। আর যে স্থলে কোন বস্তু, দেহ এবং ঘট পটাদিকে অনিত্য বলা হইয়াছে; তথায় তাহা নিত্যাভাব বুঝিতে হইবেক। কেননা বস্তুর প্রকৃতি অনুসারেই ঐরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে। যদি বল যে, পরমেশ্বর মুখ্য নিত্য এবং জগৎ গৌণ নিত্য, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, অগ্রে জগৎ পদার্থ নির্ণয় করিয়া, যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জগদুৎপত্তি

বিনাশবিশিষ্ট, তবে তাহা গৌণ নিত্য বটে; এবং ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইলে তাহার কর্ত্তা থাকা অবশ্যই অনুমান হইবেক; এবং সেই কর্ত্তা পরমেশ্বর মুখ্য নিত্য পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারিবেক। অতএব জগৎ কাহাকে বলে, তাহা নিত্য, কি উৎপত্তি বিনাশবিশিষ্ট তাহার মীমাংসা করা যাউক।

তৃতীয় অধ্যায়।

জগৎ কাহাকে বলে ও তাহা নিত্য কি উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট।

জগৎ কাহাকে বলে, ইহা বস্তু নির্ণয় দ্বারা মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে সংক্ষেপে দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু সকলের নাম নির্দ্দিষ্টরূপে লিখিত হইতেছে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই প্রাকৃতিক স্থূলভূত পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জলচর, ভূচর, খেচর প্রভৃতি জন্তু সকল বৈকারিক ভূত, অর্থাৎ ভূতের বিকার হইতে উৎপন্ন। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত, পরমাণু ও শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র; এবং মনের স্থূক্ষ্মাবস্থা অহঙ্কার; ও বুদ্ধির সূক্ষ্মাবস্থা মহত্তত্ব; এবং সত্বঃ রজ, ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি মায়া; ইহারা প্রাকৃতিক পদার্থ; অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব একত্র হইয়া সূক্ষ্ম শরীর হয়। ইহাতে আবির্ভূত চৈতন্যের নাম জীব; এবং ঐ জীবের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি গুণ সকল। এবং মনুষ্যাদির কৃত ঘট পটাদি নানা প্রকার বস্তু সকলকে জগৎ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকল থাকাতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বলে। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সমূহের সমষ্টির নাম জগৎ; ইহার ব্যষ্টি অনন্ত পদার্থও তদন্তর্ভূত। এই জগৎ নিত্য কি উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে যুক্তি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। এবং যুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে প্রমাণের

প্রয়োজন। ঐ প্রমাণ শাস্ত্র ঘটিত এবং অবস্থা ঘটিত; এই দুই প্রকার প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ কিছুই নাই। যদিও শাস্ত্র ঘটিত প্রমাণ বলবান বটে, কেন না শাস্ত্রের লিখিত কথা সকল বিশ্বাস করিলে অন্য কোন প্রমাণের, অথবা যুক্তির আবশ্যক রাখে না; কিন্তু শাস্ত্র সকল সত্য কি না তদ্বিষয় মীমাংসা ব্যতীত শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করা যায় না। এজন্য প্রথমতঃ অবস্থা ঘটিত প্রমাণের দ্বারা জগৎ উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট ও তাহার কর্ত্তার দ্বারা উৎপত্তি হওয়া নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ শাস্ত্র সকল সত্য থাকা মীমাংসা পূর্ব্বক তদনন্তর শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি অবলম্বন করা যাইবেক। এক্ষণে অবস্থা ঘটিত অনুমান প্রমাণ অবলম্বন করিয়া জগৎ গৌণ নিত্য, এবং তাহার উৎপত্তি বিনাশ থাকার মীমাংসা করা যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও মহৎতত্ত্ব এবং অহঙ্কার মন বুদ্ধি প্রাণ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি বহুতর অদৃশ্য পদার্থ সকল দৃশ্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অনুমান করা যায়। ঐ সকল পদার্থ কি, তাহা পশ্চাৎ মীমাংসিত হইবেক। কেন না দেহাদি দৃশ্য বস্তু ব্যতীত যখন তাহার উপলব্ধি হইতেছে না, তখন দৃশ্য বস্তুর মীমাংসা অগ্রে করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বস্তুর মীমাংসা হইবেক; তাহার সন্দেহ নাই। দৃশ্য বস্তু, পর্ব্বত বৃক্ষ ও গুল্ম লতা এবং মনুষ্যাদি সচল প্রাণীর দেহ ও প্রাণীর কৃত পদার্থ সকল যে উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে, তদ্বিষয়ে কোন বাদীরই মতের বিভিন্নতা নাই। তবে পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট কি না, তদ্বিষয়ের মীমাংসা করা যাউক। কেহ কেহ বলেন যে, আকাশ শূন্য মাত্র; তাহা কোন পদার্থ নহে। কেবল ক্ষিতি জল তেজ বায়ু এই চারিটী ভূত জগতের মূল কারণ হওয়াতে, ঐ চারি ভূতময় এই জগৎ হইতেছে। এবং জগতের সমুদায় দৃশ্য পদার্থ ঐ সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ঐ ভূত চতুষ্টয় মুখ্য নিত্য পদার্থ, তাহার ক্ষয় উদয় নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে (আকাশের বিষয় পশ্চাৎ মীমাংসা করা যাইবেক) এক্ষণে ভূত চতুষ্টয়ের বিচারে দেখা যায় যে, উহা মুখ্য নিত্য নহে; কেন না ভূত শব্দের অর্থ এই যে, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভূত। এবং জগৎ শব্দের অর্থ গচ্ছতি ইতি জগৎ; গচ্ছতি অর্থাৎ যাহা যায়; অর্থাৎ

ক্ষয় হইয়া যায় তাহাকে জগৎ বলে। অতএব ভূতময় জগৎ উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে; বিশেষতঃ ভূত চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রধান ভূত সর্ব্বাধারা পৃথিবী; তাহা ক্ষয়শীলা বলিয়া তাহার নাম ক্ষিতি হইয়াছে। পরন্তু বৈকারিক পদার্থ অর্থাৎ ভূতের বিকার হইতে প্রাণীর দেহ এবং বৃক্ষাদি, ও প্রাণী কৃত ঘট পটাদি সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্তে পুনরায় ভূতত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুভব হয় যে, মূল ভূত চতুষ্টয় ঐ রূপ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি বল যে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ভূত চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, ভূত চতুষ্টয় এবং অন্যান্য দৃশ্য বস্তু সকল পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া স্থূল রূপে যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সমস্ত পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন। এবং বিজ্ঞান দ্বারা ও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাহা নিশ্চয় রূপে জানা যাইতে পারে। এই সকল কারণে পূর্ব্বোক্ত ভূত চতুষ্টয় পরমাণু যোগে উৎপন্ন হওয়াই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে; সুতরাং ভূতময় জগৎও ঐরূপ, তাহাব আর সন্দেহ নাই। যদি বল যে, ভূতময় জগৎ উৎপত্তিবিশিষ্ট হইলেই যে বিনাশ বিশিষ্ট হইবেক, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে, জগতে যে কিছু পদার্থ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেক বস্তুই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ বিশিষ্ট। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সমুদায় ভূতময় জগৎ যে ঐরূপ হইবেক, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরন্তু উৎপত্তি বিশিষ্ট বস্তু মাত্রেই বিনাশী; এবং যে বস্তুর বিনাশ হয়, তাহা আবার দ্রব্যান্তরের ন্যায় ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া, পুনরায় উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, পুনঃ পুনঃ এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হইয়া থাকে। যে হেতু পরমাণু সংযোগে বর্ত্তমান জগদুৎপন্ন হওয়া অনুমান করিলে, ইহার পূর্ব্বে অবশ্য প্রলয় অবস্থা স্বীকার করিতে হয়; এবং তাহার পূর্ব্বেও জগৎ ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তদ্রূপ এই জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় সৃষ্ট হইতে পারে; তাহা অবশ্যই মীমাংসা হইতেছে। অতএব জগৎ প্রবাহের বিরাম না থাকায়, তাহা প্রবাহরূপে নিত্য; এবং পদার্থ সকল উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট বলিয়া তাহা অনিত্য; সুতরাং জগৎ গৌণ-নিত্য থাকা সিদ্ধান্ত হইতেছে। যদি

বল যে, পদার্থ সকল উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট হইলেও তাহার এক কালে ধ্বংস না হওয়ায় তৎসমুদায় অনিত্য বলিয়া কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ? তাহাতে বক্তব্য এই যে, জগতের দৃশ্য পদার্থ সকলের মধ্যে পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি এবং প্রাণী বর্গের স্থূল দেহ ও ঘটপটাদি বস্তু সকল একবার বিনষ্ট হইলে পুনরায় ঐ সকল বস্তুর ভৌতিকাংশ সকলকে তদ্রূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া তত্তৎ পদার্থরূপে উৎপন্ন হইতে আর কখনই দেখা যায় না। সুতরাং তৎসমুদয় নিত্যাভাব-রূপ অনিত্য; এবং জগৎ বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত ভূত চতুষ্টয় ও তাহার বৈকারিক পদার্থ সকল এক কালে অভাব হয় না বলিয়া তাহা নিত্য সদৃশ মাত্র কথিত হয়। ফলতঃ মুখ্য-নিত্য নহে; কেন না জগৎ বিনষ্ট হইলে ভূত সকলের বিনাশ হয় বলিয়া পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে তৎ পদার্থ সকলকে অনিত্য বলা যাইতে পারে। এবং তৎকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি ও মহৎতত্ত্ব এবং অহঙ্কার প্রভৃতি অদৃশ্য পদার্থ সকলের আর অনুমান হয় না; বরং তাহা বিনষ্ট হইয়া পুনরায় জগতের সহিত উৎপন্ন হওয়াই অনুমান হয়; অতএব জগৎ গৌণ নিত্য অথবা নিত্যানিত্য বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে না। যদি বলা যায় যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর বিনাশ হইলে পুনরায় কাহাদ্বারা জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে ? তাহাতে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্য পরমেশ্বর, যিনি মুখ্য নিত্য পদার্থ, তিনি জগৎকর্ত্তা; তাঁহাদ্বারা জগৎ উৎপন্ন হয়। যদি বল যে, জগদ্বিনষ্ট হইলে শক্তিমান চৈতন্যেরও অনুমান না হওয়ায় তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না এবং যুক্তি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ভূত চতুষ্টয়ের বিনাশ হইলেও তাহার পরমাণু সকলের বিনাশ হওয়ার সম্ভব নহে এবং স্বভাবতঃ পরমাণু সকলের পরস্পরের যোগ হইয়া পৃথিবী জল তেজ বায়ু বৃহদাকার ধারণ করে, ও তাহা হইতে বৈকারিক পদার্থ সকল স্বভাব বশতঃ উৎপন্ন হইয়া জগৎকার্য্য চলিতে থাকে। অতএব জগৎকর্ত্তা শক্তিমান চৈতন্য পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন কিছুই দৃষ্ট হয় না? ইহাতে বক্তব্য এই যে, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর ব্যতীত পরমাণুর স্বভাববশতঃ কোনক্রমেই জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না; তন্নিমিত্ত জগতের কর্ত্তা নিরূপণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যাইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জগতের কর্ত্তা নিরূপণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয়।

এই জগতে দৃশ্য বস্তু মাত্রই উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট; এবং দৃশ্য বস্তুর অভাবে প্রকৃতি প্রভৃতি অদৃশ্য বস্তুর উপলব্ধি না হওয়ায় তাহা দৃশ্য বস্তুর সহিত উৎপন্ন ও বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু জগতের মূলপদার্থ সকল কর্ত্তাদ্বারা অথবা পরমাণু-সংযোগে স্বভাব বশতঃ উৎপন্ন হয়। তদ্বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ থাকাতে তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। তাহাতে বক্তব্য এই যে, পরিদৃশ্যমান্ জগতের মূল পদার্থ সকল স্বভাবতঃ পরমাণু-সংযোগে উৎপন্ন হওয়া কোন-ক্রমেই বলা যাইতে পারে না; বরং তাহা কর্ত্তার কার্য্য বলিয়া নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কেননা পরমাণু জড়পদার্থ; তাহা আপনি সংযুক্ত হয় না। যেমন দুইখানি প্রস্তর অথবা দুইটী লোষ্ট্র স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে আপনি যোগ হয় না; তদ্রূপ পরমাণুরও যোগ হইতে পারে না। যদি বল যে, যেরূপ চুম্বক প্রস্তর ও লৌহ পরস্পর স্বীয় স্বীয় আকর্ষণী শক্তি ক্রমে যোগ হয়; তদ্রূপ পরমাণুর আকর্ষণী শক্তি ক্রমে পরস্পর পরমাণু সকলের যোগ হইতে পারে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে; কেননা চুম্বক প্রস্তর ও লৌহ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাহাদিগের উভয়ের সন্নিধান বশতঃ পরস্পরের আকর্ষণী শক্তি ক্রমে মিলিত হইতে পারে। কিন্তু একজাতীয় পরমাণু স্বজাতীয় পরমাণুর সহিত যে, আকর্ষণী শক্তিক্রমে সংযুক্ত হইতে পারে, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। বিশেষতঃ চুম্বক এবং লৌহ বিকৃত পার্থিব-পদার্থ; তাহাদিগের স্বতন্ত্র গুণ থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত পার্থিব পরমাণুতে তদ্রূপ গুণ যে আছে, তাহা অনুমান করিবার কোন দৃষ্টান্ত প্রমাণ নাই। পরন্তু পরমাণুর আকর্ষণী শক্তি থাকা স্বীকার করিলেও ঐ শক্তিকে কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিতে হয়। যদি বল যে, ঐ শক্তিকে পরমাণুর স্বভাব বলিব? কিন্তু তাহা পশ্চাৎ বিচারদ্বারা খণ্ডন করা যাইবেক; আপাততঃ তর্কের নিমিত্ত তাহা স্বীকার করিলে তাহাতেও

কর্ত্তা ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না; কেননা পরমাণু সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে বিযুক্ত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ বস্তুর পৃথকত্ব না থাকিলে সংযোগ হয় না। তন্নিমিত্ত পরমাণু সকলের সংযোগের পূর্ব্বে পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু ছিল না; কেবল পরমাণুময় ছিল। তবে তৎকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষ গুল্ম লতা মনুষ্য ও কীট পতঙ্গ কিছুই ছিল না; ফলতঃ আধার ব্যতীত কিছুই থাকিবার সম্ভব নহে। তবে ঐ সকল পদার্থ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল? যদি বল যে, বৃক্ষ গুল্ম লতা সকল ভূমি হইতে প্রথম আপনি উৎপন্ন হইয়াছে? কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ বীজ, কাণ্ড অথবা শাখা হইতে ঐ সকল পদার্থের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। তন্নিমিত্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম বীজ অথবা বৃক্ষ কিপ্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং মনুষ্য ও পশু পক্ষী ইত্যাদি জরায়ুজ ও অণ্ডজ পদার্থ সকল, যাহা স্ত্রী পুরুষ মিলিত হওয়ায় স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার প্রথম স্ত্রী পুরুষ কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল? এ বিষয়ের আর কোন উত্তর না থাকায়, সুতরাং তাহা অবশ্যই কর্ত্তার কার্য্য; এবং তাঁহার কৌশলে উৎপন্ন হওয়া স্বীকার করিতে হইবেক। যদি বল যে, পৃথিবী জল তেজ বায়ু এবং অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ সকল বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ দেখা যাইতেছে, ইহা ঐরূপ অবস্থায় চিরকাল রহিয়াছে; ইহার আদি ও অন্ত নাই; কেবল স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সকল কার্য্য চলিতেছে ও মনুষ্যাদির জন্ম মৃত্যু এবং সুখ দুঃখাদি হইতেছে। আর পরমাণুর স্বভাব বশতঃ এক দেশ সংযোগ, এবং অন্যদেশ বিয়োগ হইতে থাকে। এবং নূতন সংযোজিত দেশে মনুষ্যাদিরা বাস করে, ও পূর্ব্ব বসতি দেশ হইতে বীজাদি লইয়া যায়, তাহাতে মূল কর্ত্তার প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। কারণ এরূপ ঘটনা হইবার সম্ভব নাই, বরং একটী পৃথিবী গোলাকার ও তাহা সর্ব্বত্র অখণ্ডরূপে থাকা অনুমান হইতেছে। এমত অবস্থায় খণ্ডরূপে পৃথিবীর এক দেশ বিনাশ ও অন্য দেশ বর্ত্তমান থাকার কথা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিরুদ্ধ। ফলতঃ কর্ত্তা ব্যতীত কেবল পরমাণুর স্বভাব বশতঃ সংযোগ ও বিয়োগ হওয়া স্বীকার করিলে, সংযোগ হইতে হইতে বিয়োগ হওয়াও স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে আদৌ

মৃত্তিকার অথবা গোলাকাররূপে পৃথিবীর সংস্থান হইতে পারে না। বিশেষতঃ পৃথিবীর চারি দিকে গোলাকার যে সমুদ্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে তাহার কোন দেশ নাশ ও কোন দেশ উৎপন্ন কি প্রকারে হইতে পারে? যদি বল যে, সমুদ্রের দ্বীপের ন্যায় এক দেশ সংযোগ ও অন্য দেশ বিয়োগ হইতে পারে ইহা সঙ্গত নহে। কেননা মূল পৃথিবী গোলাকারের ন্যায় একটী পদার্থ, ইহা ভুগোলতত্ত্বদর্শনে জানা যায়; এবং তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত বটে; কিন্তু ইহার কিয়দংশ যে, এককালে পরমাণুময় হইয়াছে, তাহা কখনই শুনা যায় না। অতএব এই তর্ক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পরন্তু পরমাণুর ঐরূপ স্বভাব হইলে এইক্ষণেও ঐরূপ হইতে পারিত; তাহা হইলে আমাদিগের উপরিভাগে শূন্যমার্গে নূতন পৃথিবী উৎপন্ন হওয়া দেখিতে পাইতাম; কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত দেখা অথবা শুনা যায় নাই। এতাবতায় কর্ত্তা ব্যতীত স্বভাব অনুসারে পরমাণু সংযোগে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, এবং প্রথম বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ও মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি কোনক্রমে উৎপন্ন হওয়া অনুমান হইতে পারে না। বিশেষতঃ মনুষ্যাদির জন্ম মৃত্যুর নিয়ম এবং নানা প্রকার আকৃতি ও সুখ দুঃখাদির কারণ এবং তাহা ভোগ হওয়া ইত্যাদি জগতের অশেষবিধ ব্যাপার ও কার্য্য সকল, মূল কর্ত্তা ব্যতীত কোনক্রমে নির্ব্বাহ হওয়ার সম্ভব ছিল না ও নাই। অতএব এই সকল কারণে জগতের কর্ত্তা থাকা সিদ্ধান্ত হইতেছে; এবং ঐ কর্ত্তার নিত্য অস্তিত্বও অনুমান হইতেছে; কেননা কর্ত্তার বিনাশ হইলে কাহাদ্বারা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে? (অর্থাৎ পারে না) তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ে নিত্য বিদ্যমান ও কর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। যদি বল, ঈশ্বর নিত্য হইলেও পরমাণুও নিত্য বটে, এবং ঈশ্বর কেবল তাহার সংযোগ ও বিয়োগকর্ত্তা ব্যতীত উৎপাদক নহে; তবে তাঁহাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে; কেননা তিনি কেবল সহকারী কারণ মাত্র; তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যায় না; তজ্জন্য পরমাণু নিত্য কি জন্য, এবং জন্য হইলে, ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন কি স্বভাব বশতঃ উৎপন্ন হয়? এই বিষয়ের মীমাংসা করা প্রয়োজন হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরমাণু নির্ণয় ও স্বভাবের মীমাংসা।

পরমাণু শব্দে পরম-অণু, অতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থ; তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, গবাক্ষদ্বার দিয়া যে সূক্ষ্ম ধূলি পদার্থ নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহাকে ত্র্যসরেণু বলে। তাহার ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগকে পরমাণু বলে। ইহা পরমাণুর স্বরূপ। ঐ পরমাণু দ্রব্যের বিভাগে উৎপন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইহারা জড়পদার্থ; ও দ্রব্য নামে কথিত। ঐ সকল দ্রব্যে যে গুণ আছে, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; অর্থাৎ আকাশে শব্দ, বায়ুতে স্পর্শ, তেজে রূপ, জলে রস ও পৃথিবীতে গন্ধ গুণ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আকাশ কোন পদার্থ নহে; উহা শূন্য মাত্র। কিন্তু তাহা অসঙ্গত। কারণ শব্দ সকল আকাশ হইতে প্রকাশ ও তাহাতে বিলীন হয়। এবং পদার্থ সকলের অবকাশ আকাশ ব্যতীত হয় না; ইহা যোগীরা যোগবলে, ও সূক্ষ্মবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অনুভব করিতে পারেন; তদ্ভিন্ন সচরাচর সকলের বোধগম্য হওয়া কঠিন। বায়ু প্রভৃতির গুণ সকল স্পষ্ট অনুভব হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, গুণ সমবায়ী কারণ অর্থাৎ গুণের আশ্রয়ীভূত পদার্থের নাম দ্রব্য; তাহা আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে সঙ্গত বটে, কিন্তু তত্ত্ব-বিচারে সঙ্গত হয় না; কেননা দ্রব্যের যে গুণ, তাহা তাহার সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপী; একদেশব্যাপী নহে; অর্থাৎ পৃথিবীর সমুদয় মৃত্তিকাতে গন্ধ, জলের সমুদায় অংশে রস, তেজের সমুদায় অবয়বে রূপ, ও বায়ুর সর্ব্বস্থানে স্পর্শ, এবং আকাশের সর্ব্বত্র শব্দগুণ লক্ষিত হয়। তাহাতে তাহাদিগের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশেও ঐ ঐ গুণ থাকা সিদ্ধান্ত হইতেছে। এমত অবস্থায় পরমাণুর অবয়ব কল্পনা করিলেও তাহার সমুদায় স্থানে গুণ থাকা অনুমান হওয়াতে দ্রব্য আর স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অতএব গুণময় পদার্থই দ্রব্য, ইহা নির্ণয় করা হইতেছে। যেহেতু উপরি উক্ত শব্দ

স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গুণ সকল দ্রব্যরূপে উৎপন্ন হইবার সময় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাণুরূপে উৎপন্ন হইয়া, তৎপরে তাহা সজাতীয় পরমাণু সংযোগে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত নামে বিখ্যাত হয়। তদনন্তর ঐ অপঞ্চীকৃত ভূতসকলের পরস্পরের সহিত পরস্পরের যোগে তাহারা স্থূল ভূতরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা নির্ণীত হয় যে, গুণসমূহের একীকরণের নাম দ্রব্য। এবং ঐ দ্রব্য বিভাগ করিলে গুণ সকল পৃথক্ পৃথক্ হওয়ায় আর দ্রব্য থাকে না। যেমন শীল জলময় পদার্থ অর্থাৎ জল জমিয়া শীল হয়; তাহাকে দ্রব্য বলা যায়; ঐ শীল গলিয়া আবার জলময় হয়। তদ্রূপ গুণ দ্রব্যরূপে পরিণত হয়; পরে বিভাগ হইয়া প্রথমতঃ পরমাণু; তদনন্তর গুণময় হইয়া পড়ে। অতএব পরমাণু গুণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহাকে মুখ্য নিত্য বলা যাইতে পারে না। যদি বল যে, গুণসমূহের একীকরণকে দ্রব্য বলিলে তাহা হইতে গুরুত্ব সমত্ব প্রভৃতি গুণ কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? কেন না গুণে গুণ থাকেনা বলিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে, গুণ সকল সংযুক্ত হইয়া দ্রব্যরূপে পরিণত হওয়ায়, তাহাতে অবান্তর গুণ সকল যে উৎপন্ন হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন নানাপ্রকার ওষধি দ্রব্য একত্র হইলে রোগ নাশক গুণ উৎপন্ন হয়; এবং দুই খানি প্রস্তর যোগ হইলে অধিক ভার অর্থাৎ গুরুত্ব গুণ উৎপন্ন হয়; তদ্রূপ ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে গন্ধ তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্রের যোগ হইলে গুরুত্ব গুণ, ও তেজে তেজ সংযোগ, ও শব্দগুণে স্পর্শগুণ সংযোগ হইলে সমত্ব গুণ উৎপন্ন হয় ইহা অসম্ভব নহে। অতএব পরমাণু নিত্য নহে; তাহা জন্য; এবং যে গুণ হইতে ঐ পরমাণু উৎপন্ন হয় তাহাও জন্য পদার্থ। কেন না দ্রব্যের প্রলয় অবস্থায়, অথবা উৎপত্তির পূর্ব্বে গুণ সকল নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না; তাহা অবশ্যই লয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং তাহার উৎপত্তি হওয়া স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু ঐ সকল গুণের কার্য্য দর্শনে তাহাতে শক্তি থাকা অনুভব হওয়ায় ঐ শক্তি তাহার উপাদান কারণ হইতেছে। এবং শক্তি ঐ সকল গুণের সর্ব্বাবয়বব্যাপী বিধায় গুণকে শক্তিময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।* এক্ষণে ঐ শক্তি কি পদার্থ তাহা দেখা যাউক্।

* প্রত্যেক পরমাণুতে অনেক শক্তি থাকে এবং তাহা যোগযুক্ত হইলে অসংখ্য শক্তির

শক্তি, পরমেশ্বরের ব্যতীত অন্য কাহারও নাই; পরমেশ্বর শক্তিমান্ চৈতন্য; অর্থাৎ অভিন্ন শক্তিযুক্ত চৈতন্য তাঁহার শক্তিতে সকল কার্য্য হইতেছে। তিনি জ্ঞানময় শক্তিময়, এই বিষয় পশ্চাৎ পরিষ্কাররূপে মীমাংসা করা যাইবেক। আপাততঃ প্রোক্ত গুণসকল শক্তি হইতে উৎপন্ন ও তাহা জন্য পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে।

যদি বল যে, স্বভাব বশতঃ গুণ সকলের উৎপত্তি হয়; এবং গুণ হইতে পরমাণু, তাহা হইতে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য কারণ সম্বন্ধে জগৎ কার্য্য চলিতে পারে; অতএব পরমেশ্বরীয় শক্তি হইতে যে গুণের উৎপত্তি হয় ইহা কি জন্য স্বীকার করিব? ইহাতে বক্তব্য যে, স্বভাব নিত্য, বা স্বাধীন পদার্থ নহে। এবং কোন ব্যক্তি, বা বস্তুর স্বভাব ব্যতীত স্বাধীন ও নিত্য স্বভাবের অনুভব হয় না। পরন্তু স্বভাবের কারণ বস্তু বা ব্যক্তি হওয়াতে ঐ ঐ বস্তু বা ব্যক্তির অভাবে স্বভাবের অভাব হইয়া যায়। অতএব স্বভাব স্বাধীন বা নিত্য পদার্থ না হওয়ায় কেবল স্বভাব হইতে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, স্বভাব উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট হইলেও তাহার অভাব হয় না; যেমন কার্য্যের অভাব হইলেও কারণ-রূপ স্বভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। ইহা বলিতে পার না; কেন না কারণ তিন প্রকার; নিমিত্ত, সহকারী, ও উপাদান; তাহাতে নিমিত্ত ও সহকারী কারণ মনুষ্যাদি, এবং উপাদান কারণ বস্তু সকল কিন্তু এই তিন কারণই জন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এবং এই তিন কারণ হইতেই স্বভাবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে দেখা যায়; ইহাতে ঐ তিন কারণের মূল কারণ কখনই স্বভাব হইতে পারে না। অতএব ঐ সকল কারণের মূল অন্য কোন কারণ অর্থাৎ নিরাকার কারণ স্বরূপ পদার্থ থাকা স্বীকার করিতে হয়। যদি এরূপ তর্ক কর যে ঐ নিরাকার কাবণকে স্বভাব বলিব? কিন্তু তাহা বলিতে পার না; কেন না স্বভাব কি বস্তু তাহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট না হইলে তাহাকে কারণ বলিয়া গণ্য করা যায় না। ফলতঃ যদি স্বভাব কোন বস্তু না হয়, তবে তাহা হইতে কোন বস্তুর উৎপত্তি

কার্য্য প্রকাশ হয়, ইহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইহেছে, অতএব পরমাণুর উপাদান শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না।

হওয়া সম্ভব নহে; বিশেষতঃ কোন নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিতে হইলে জ্ঞান ও শক্তিরও প্রয়োজন আছে। যদি বল যে জ্ঞান ও শক্তিমান পদার্থই স্বভাব; তাহাও সঙ্গত নহে; কেন না স্বশব্দে আত্মা, তাহার ভাবকে স্বভাব বলা যায়। তদ্ব্যতীত স্বভাবের জ্ঞান ও শক্তি থাকা বলা যাইতে পারে না; তবে শক্তিমান চৈতন্য পদার্থের স্বভাব হইতে বস্তুর উৎপত্তি হওয়া স্বীকার কর; ক্ষতি নাই। অতএব স্বভাব স্বাধীন কোন পদার্থ নহে। এবং পরমাণু ও তাহার উৎপাদক গুণ সকল জন্য পদার্থ থাকা সিদ্ধান্ত হওয়াতে ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা ও তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ের যে মীমাংসা করা হইয়াছে; তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে না। এক্ষণে ঐ কর্ত্তার নাম ও স্বরূপ এবং কার্য্য কি তাহা স্পষ্টরূপে মীমাংসা করা যাউক্।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জগৎকর্ত্তার নাম, স্বরূপ ও কার্য্য-বিবরণ।

জগৎকর্ত্তার নাম অনন্ত শক্তিমান চৈতন্য*। জগৎকর্ত্তা জগৎপাতা জগৎসংহর্ত্তা ঈশ্বর ও পরমেশ্বর ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার স্বরূপগত ও কার্য্যগত অথবা তাহার অর্থগত উপরি উক্ত নাম এবং অন্যান্য নামও ভাষান্তরে নানাপ্রকার নাম প্রচলিত আছে। ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে, তাঁহার স্বরূপ ও কার্য্যানুরূপ নাম সকল প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ অনন্ত শক্তিমান চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ ও সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় তাঁহার কার্য্য। কেন না জগতের সমুদায় বস্তু জন্য ও নাশ্য বিধায় তৎ উৎপত্তি ও বিনাশ শক্তিমান্ চৈতন্য, অর্থাৎ শক্তিযুক্ত জ্ঞান ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। যেহেতু চৈতন্য, অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত সুশৃঙ্খলরূপে অভিমত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না; এবং শক্তি না থাকিলে সৃষ্টি কার্য্যে প্রয়োজনীয় বস্তু

* শক্তিমচ্চৈতন্য শব্দ ব্যাকরণ শুদ্ধ হয় কিন্তু সকলের বোধগম্য হয় না বলিয়া পৃথক্ পদ রাখাতে শক্তিমান চৈতন্য শব্দ প্রয়োগ হইতেছে। এবং উভয় পদই ব্যবহার হইবেক।

সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদ্রূপ ইহার স্থিতি ও বিনাশকালেও জ্ঞান শক্তির আবশ্যক আছে। অতএব জগৎ পদার্থ বিনষ্ট হইলে পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য অনন্ত শক্তিমান চৈতন্য দ্বারা হওয়াই সিদ্ধান্ত হইতেছে। এবং ঐ শক্তিমান চৈতন্য পদার্থই মুখ্য নিত্য ও কস্মিন্‌কলেও তাঁহার উৎপত্তি বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি তাঁহাকে জন্য পদার্থ বল তবে তাঁহার জনক কে? অর্থাৎ জনক কেহ নাই। কেন না এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ, অনন্ত শক্তিমান্ চৈতন্যদ্বারা নির্ব্বাহ হওয়াতে ইহার অতীত আর কোন পদার্থ থাকা অনুমান হয় না এবং অন্য কোন পদার্থের কল্পনা করারও প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব যেরূপ মূলের মূল নাই; তদ্রূপ জগৎকর্ত্তা শক্তিমান চৈতন্যই সকলের মূল, তাঁহার জনক নাই। তিনি নিমিত্ত ও সহকারী এবং উপাদান কারণ রূপে সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে ও সকল কার্য্যে লক্ষিত ও অলক্ষিত ভাবে আছেন; অর্থাৎ সচেতন বস্তুতে লক্ষিত ভাবে; ও অচেতন ধূলি কর্দ্দম প্রভৃতিতে অলক্ষিত ভাবে আছেন। যদি বল যে ধূলি কর্দ্দম প্রভৃতি অচেতন পদার্থে যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে, অচেতন পদার্থ দ্বারা নানাপ্রকার রোগ শান্তি হওয়াতে অনুমান হয় যে, তাহাতে শক্তিমান চৈতন্য পদার্থ আছে; নতুবা তদ্দ্বারা অভিমত রোগ শান্তি হইবার সম্ভব ছিল না। অতএব এই সকল কারণে শক্তিযুক্ত চৈতন্যই তাহার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য কি তাহার মীমাংসা করা যাউক।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পরমেশ্বরের নিত্য সিদ্ধ কার্য্য; কেননা জগতের সমুদায় বস্তু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিশিষ্ট দেখা যায়। অথচ তাহা কর্ত্তা ব্যতীত হয় না; এবং তাহার মূল কর্ত্তাও পরমেশ্বর বটেন; সুতরাং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহারই কার্য্য হইতেছে। যদি বল তিনি কি জন্য ঐ কার্য্য করেন? তাহাতে বক্তব্য এই যে, অনন্ত শক্তিমান চৈতন্য পরমেশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্যের কারণ নাই ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য; অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃতিই ঐ রূপ বলিতে হইবেক। বিশেষতঃ যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তিনিই পরমেশ্বর। এবং পরমেশ্বরের কার্য্যই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়; এইরূপ সাশ্রয় সাপেক্ষ ভাব জগতের সহিত তাঁহার আছে। ফলতঃ তিনি

সৃষ্ট্যাদি কার্য্য না করিলে কেহ তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে, ও তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিত না; এবং তাঁহার স্বরূপ অনন্ত শক্তিমান্ চৈতন্য না হইলে তিনি জগৎ কার্য্য করিতে পারিতেন না। এতাবতায় জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর ও তাঁহার কার্য্য এই জগৎ। তাঁহার শক্তি অনন্ত প্রযুক্ত অনন্ত কার্য্য ও অনন্ত পদার্থ প্রকাশ হইতেছে। শক্তি ব্যক্ত হইলে জগৎ ব্যক্ত হয়; শক্তি অব্যক্ত হইলে জগৎ কার্য্য রহিত হইয়া প্রলয় অবস্থা হয়। অতএব যুক্তি অনুসারে জগৎ কর্ত্তার নাম স্বরূপ ও কার্য্য এই পর্য্যন্ত মীমাংসা করা হইল। এই সকল বিষয় শাস্ত্রের সহিত ঐক্য আছে। বরং শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে আরও পরিষ্কাররূপে মীমাংসা করা যাইবেক। তন্নিমিত্ত শাস্ত্র কি ও কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়।

শাস্ত্র কি ও তাহা কোথা হইতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহার নির্ণয়।

পরমেশ্বর আছেন ও তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তাহা অনুমান প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া ন্যায় যুক্তি অনুসারে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে। এক্ষণে শাস্ত্র যে ইহার প্রত্যক্ষ মূলক প্রমাণ তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে। শাস্ত্র সকল, জগৎকর্ত্তার-দ্বারা এবং তাঁহার অভিপ্রায় মতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে। যথা প্রথমতঃ বেদ, অগ্রে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ হইয়াছিল। তৎপরে বেদশব্দ দ্বারা তাবৎ বস্তুর নাম রূপ ও কর্ম্ম সকল জ্ঞাত হইয়া ঐ প্রজাপতি ব্রহ্মা এই জগৎ রচনা করেন*। তৎপরে ব্রহ্মা, ঋষিদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এবং শত সহস্র অধ্যায় সংযুক্ত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত পূর্ব্বক

* মনুর ১ম অধ্যায়ের ২১ শ্লোক।

মনুকে পড়াইয়াছিলেন; এবং মনু তাহা প্রজাপতিদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন; পরে ভৃগু ঐ গ্রন্থ সংক্ষেপ করিয়া ঋষিদিগকে উপদেশ দেন; এবং অন্যান্য ঋষিরা বেদ হইতে, এবং ব্রহ্মার কৃত ঐ গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ এবং সহজ করিয়া নানা গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এই সকল বিষয় মনু ও মহাভারতে আছে। শাস্ত্রে মীমাংসা করা হইয়াছে যে, সনাতন বেদ গৌণ নিত্য, এবং অপৌরুষেয় তাহা অন্য কাহার দ্বারা রচিত হয় নাই, কেবল ঈশ্বর হইতে নিশ্বাসের ন্যায় প্রকাশ হইয়াছে ও তাহা প্রতিকল্পে সমানরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, বিষয়ক সংকল্পই বেদ। কেননা সৃষ্টি কি প্রণালীতে হইবেক, এবং সৃষ্টি কার্য্যে কি কি দ্রব্য ও ভাবের প্রয়োজন, এবং কিরূপে স্থিতি হইবেক ও প্রজারা কি প্রকার আচরণ করিবেক, ও তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির নিয়ম কি হইবেক, এবং কতকাল ইহার স্থিতি হইবেক, এবং প্রলয়ের প্রণালী কি ইত্যাদি সমুদায় ব্যাপার চিন্তা না করিয়া সৃষ্টি করা হইতে পারে না।

এইজন্য পরমেশ্বর অগ্রে এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া পরে সৃষ্টি কার্য্য করিয়াছেন। যদ্যপি বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞানের করণ; কিন্তু এ স্থলে কিঞ্চিৎ লাক্ষণিক অর্থ করিতে হইবেক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয, বিষয়ক নিয়ম রূপ সংকল্প নির্ণায়ক জ্ঞানের করণকে বেদ বলা যায়। নতুবা অন্য কোন জ্ঞানের করণ হইতে পারে না। এই বেদ হইতে মন্বাদি শাস্ত্র সকল প্রচাব হইয়াছে। বেদ ভিন্ন কোন কার্য্যই হইবার সম্ভব ছিল না। ইহা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত দ্বাবা মীমাংসা হইতেছে যে; সামান্য মনুষ্য সকলে যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার নির্ব্বাহ বিষয়ক চিন্তা অগ্রে না করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যদি বল যে, ঈশ্বর সকলের শ্রেষ্ঠ তিনি অগ্রে সংকল্প না করিয়াও সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সমাধা করিতে পাবেন, তাঁহার বেদ করিবার প্রয়োজন কি। ইহা হইলে উন্মত্তেব প্রলাপের ন্যায় হইয়া পড়ে; কেননা কার্য্যের সুশৃঙ্খলা কোন মতেই হইতে পারে না। হয় ত সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইতে হইতেই প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে; এজন্য সংকল্প পূর্ব্বক কার্য্য করাই সম্ভব।* যদি বলা যায় যে, প্রচলিত বেদ ও মন্বাদি শাস্ত্র সকল

* দৃষ্টান্ত ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত বৃহদ্বস্তুর হইয়া থাকে।

যে ঈশ্বরের সংকল্পরূপ বেদ হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি। তাহার প্রমাণ এই যে, বেদ ও শাস্ত্র সকল আদিম পুরুষের সময় হইতে ক্রমাগত ধারা বাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং এই সকল শাস্ত্রকে ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া মান্য করা হইয়াছে; ও ইহা যে কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই। এতদ্বিষয়ে অনেক দেশীয় পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারেন নাই যে বেদ ও মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র কোন্ সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে। তবে অনুমান করি যা যিনি যাহা লিখুন্ না কেন তাহা কর্ম্মণ্য নহে। কারণ আদিশাস্ত্র আর কিছুই দেখা যায় না কেবল বেদই আদি শাস্ত্র। তদনন্তর মন্বাদি শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে; ঐ মন্বাদি শাস্ত্রে বেদের উল্লেখ আছে এবং তদনন্তর যে সকল শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও বেদ ও মনুর কথা আছে। ইহার দ্বারা নির্ণয় হয় যে বেদের পূর্ব্বে আর কোন শাস্ত্র প্রচলিত ছিল না; ও প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্র মনুর গ্রন্থ যাহা ব্রহ্মার কৃত গ্রন্থ হইতে প্রকাশ হইয়াছে। ইহার রচনা দর্শনে ঐ সকল শাস্ত্র আদি শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি* ব্রহ্মা আদি প্রজাপতি; তাহা হইতে বিরাট, বিরাট হইতে মনু ও তদনন্তর মনু হইতে মানব আদি স্থুল সৃষ্টি সকল প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মা ও মনু দ্বারা বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রকাশ হওয়াই নিতান্ত সম্ভব। ঐ বেদ, ও ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বিভাগ মতে নানা ঋষি দ্বারা নানা শাস্ত্র যে প্রচার হইয়াছে তাহা বেদের অর্থ প্রকাশক মাত্র। ইহার আরো তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যখন প্রজা সৃষ্টি করিলেন তখন প্রজাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম আচার ব্যবহার রাজনীতি এবং অন্যান্য ব্যাপার সাধন জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করা নিতান্ত সম্ভব। যেমন রাজার ব্যবস্থা না থাকিলে প্রজা সকল স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিনষ্ট হইতে থাকে, তদ্রূপ দয়ালু ঈশ্বর প্রজা শাসনের নিমিত্ত স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য চলিবার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব। নতুবা প্রজাদিগের পাপ পুণ্য বোধ হইতে পারে না; এই বিষয় পশ্চাৎ আরও প্রকাশ করা যাইবেক। এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে শাস্ত্রের লিখিত বিষয়

* ঈশ্বর সাকার হইয়াই সাকারের সৃষ্টি করা সম্ভব এবং কার্য্য কারণ দর্শনে তাহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে কেননা সাকার জগৎ, সাকার হইতে হইয়াছে বলিতে হইবেক।

সকল সত্য যেহেতু যাঁহারা শাস্ত্র প্রচলিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মিথ্যা কথা লেখারও কোন কারণ দৃষ্ট হয় না ; কেননা তাঁহারা সামান্য লোকের ন্যায় লোভী ছিলেন না বিশেষতঃ শাস্ত্র সকল পূর্ব্বকাল হইতে ধারাবাহিক রূপে অবিরোধে চলিয়া আসিতেছে এবং উহার রচনাতেও পক্ষপাতের লেশ মাত্রও নাই। বরং পুরাণে বেদব্যাসের স্বীয় জন্ম বৃত্তান্ত স্বয়ং লেখায় তদ্দর্শনে তাহা বিশেষরূপে প্রতীতি হইতেছে।

আরো দেখা যায় যে, পুরাণাদি শাস্ত্রে কলির যে অবস্থা ভবিষ্যৎ উক্তিতে লেখা আছে তাহাই ঘটিয়াছে ইহা দ্বারা বোধ হয় যে যাঁহারা শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য নহেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে লোক শিক্ষার্থে শাস্ত্র প্রচার করিবার নিমিত্তই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শাস্ত্র প্রকাশক ঋষিদিগের গ্রন্থই শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য ব্যক্তিদিগের কৃত গ্রন্থ কখনই শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতে দেখা যায় না। কেন না ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ব্যতীত ঈশ্বরের অভিপ্রায় অজ্ঞ লোকের জানিবার ও তদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ম সংস্থাপন করিবার সম্ভব নহে। তবে শাস্ত্রসকল নানাপ্রকার হওয়াতে অনেকে বলেন যে ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুরূপ নহে। তাহা বলিতে পার না, কেন না জগতে বহুতর লোক সমাজের বহু ব্যাপার নির্ব্বাহ জন্য ও লোকের অজ্ঞতা দূর করিবার নিমিত্তে ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে ক্রমশঃ নানা শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। কিন্তু তাৎপর্য্য এই যে, সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বর তত্ত্ব নির্ণয় ও সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় মীমাংসা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা ও সৎকর্ম্ম এবং কুকর্ম্মের ফল সকল প্রাপ্তিবিষয়ক মীমাংসা করা হইয়াছে ; যদিও শাস্ত্র অনন্ত তথাপি প্রচলিত কত শাস্ত্র আছে ও তাহার মধ্যে যাহাতে যে বিষয় মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

অষ্টম অধ্যায়।

শাস্ত্র কত প্রকার।

শাস্ত্র কত প্রকার তাহা প্রথমতঃ সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত রূপে লেখা যাইবেক। বেদ চারি প্রকার ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। বেদাঙ্গ ছয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ। বেদের উপাঙ্গ চারি, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি। এবং ইহার অন্তর্ভূত অন্যান্য শাস্ত্র। পুরাণের অন্তর্ভূত উপপুরাণ; ন্যায়ের অন্তর্ভূত বৈশেষিক; মীমাংসা মধ্যে বেদান্ত। ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত; ও বৈষ্ণব শাস্ত্র আদি এই সমুদায় চতুর্দশ বিদ্যা। আর উপবেদ চারি প্রকার;—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অর্থ শাস্ত্র। এই চারি একত্র করিলে, অষ্টাদশ বিদ্যা হয়; তদ্ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র। শাস্ত্রের এই সংক্ষেপ বিবরণ। ইহার বিস্তার এই।

বেদশাস্ত্র সকলের মূল। তাহা স্পষ্টরূপে জানিবার জন্য ভগবন্নারায়ণের অংশাবতার বেদব্যাস ঋষি তাহা প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এক ভাগ মন্ত্র, অপর ভাগ ব্রাহ্মণ। মন্ত্র চারি ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, যে সকল মন্ত্র শ্লোকবৎ পাদবন্ধ এবং ছন্দো বিশিষ্ট, তাহাকে ঋক্ বলে। ও যে ভাগ স্বরাদি সংযোগে গীতি বিশিষ্ট, তাহাকে সাম বলে। এবং যাহা ছন্দোবিশিষ্ট পাদবন্ধ অথবা স্বরাদি সংযুক্ত গীতি-বিশিষ্ট নহে তাহাকে যজুর্ব্বেদ বলে। অথর্ব্ব বেদ কেবল শান্তিক পৌষ্টিক অভিচারিক কার্য্যে প্রতিপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ ভাগ তিন অংশে বিভক্ত। বিধি, অর্থবাদ, বেদান্ত। বিধি চারি প্রকার। উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ, প্রয়োগ। উৎপত্তি বিধি, যাগাদি কর্ম্মের স্বরূপ বোধক বাক্য। যে কর্ম্মে যাহার অধিকার আছে তদ্বোধককে অধিকার বিধি বলে। বিনিয়োগ বিধি যাগাদির ফল সম্বন্ধ বাক্য। এবং উক্ত বিধির ঐক্যের নাম প্রয়োগ বিধি।

অর্থবাদ তিন প্রকার। গুণবাদ, অনুবাদ, ভূতার্থবাদ। যাহাতে অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধ অর্থ হয় তাহার নাম গুণবাদ। যাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ বোধক হয় তাহার নাম অনুবাদ। ও যাহাতে এই উভয় ব্যাপার নাই তাহার নাম ভূতার্থবাদ।

বেদান্তকে উপনিষদ বলে. ইহা কেবল পরব্রহ্মের প্রতিপাদক। অর্থাৎ ব্রহ্ম কি তাহা নির্ণয়। কেহ কেহ ইহাকে বিধি ও অর্থবাদ বলিয়া থাকেন। উক্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড নির্ণয় হই-য়াছে। কর্ম্মকাণ্ড ধর্ম্মার্থকামের সাধন। ও ব্রহ্মকাণ্ড মোক্ষ সাধন বলিয়া নির্ণয় আছে।

বেদাঙ্গ, শিক্ষা শাস্ত্র দ্বারা উদাত্ত অনুদাত্ত স্বর অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুৎ বিশিষ্ট স্বর ও ব্যঞ্জনের স্বরূপ বর্ণ সকলের উচ্চারণের জ্ঞান হয়।

কল্পশাস্ত্র দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ ক্রম জ্ঞান হয়।

মহেশ প্রণীত মাহেশ; এবং ঋষি প্রণীত পাণিনি ব্যাকরণ ইহা দ্বারা বৈদিক পদের সাধুত্ব অসাধুত্ব অর্থাৎ শুদ্ধি অশুদ্ধির জ্ঞান হয়। উপরি উক্ত ব্যাকরণ দ্বয় হইতে কলাপ, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ, সারস্বত প্রভৃতি অনেক ব্যাকরণ পরে প্রচলিত হইয়াছে।

ভগবান যাস্ক ঋষি নিরুক্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; ইহাতে বৈদিক মন্ত্র ও পদের অর্থ নিরূপণ করা হইয়াছে।

বিবৃত্তি ছন্দো নামে ছন্দো গ্রন্থ পিঙ্গল ঋষি প্রস্তুত করেন; ইহাতে বেদ মন্ত্রের ছন্দো নিরূপণ আছে।

আদিত্য ও গর্গ প্রভৃতি ঋষিগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহাতে বেদোক্ত কর্ম্মের শুভাশুভ সময় নিরূপণ, ও লোকের অদৃষ্টাধীন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, কালে শুভাশুভ জানিবার, এবং তিথি, নক্ষত্র, বার, যোগাদি, ও রাশিচক্র, এবং চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণ প্রভৃতি জানিবার উপায়; এবং ঈশ্বর নিরূপণ করিবার, ও নানা কার্য্য ও ব্যবহার করিবার উপায় বিধান আছে। বেদের উপাঙ্গ চারি প্রকারের মধ্যে পুরাণ শাস্ত্র অষ্টাদশ প্রকার; ভগবান্ বেদব্যাস ঋষি যে সকল পুরাণ প্রণয়ন করেন; তাহা, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড,

ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত,* নারদীয়, মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন প্রচলিত বিংশতি উপপুরাণ আছে। যথা, সানৎকুমার, নারসিংহ, নান্দী, শিবধর্ম্ম, দৌর্ব্বাস, নারদীয়, কাপিল, মানব, ঔশনস, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালী, বাশিষ্ঠ, লৈঙ্গ, মাহেশ্বর, সাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ, ভার্গব; এতদ্ভিন্ন কল্কি, দেবীপুরাণ প্রভৃতি অনেক আছে।† পুরাণ শাস্ত্রে প্রধানতঃ সৃষ্টি, অবান্তর সৃষ্টি, মন্বন্তর।

রাজাদির বংশ ও তাহারদিগের চরিত্র, এই পাঁচটি বর্ণিত আছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে কর্ম্মকাণ্ড ও পূজা এবং ব্রত নিয়মাদি, ও ঈশ্বরে ভক্তি ও জ্ঞান মুক্তি প্রভৃতি বহুতর উপদেশও আছে।

ন্যায়শাস্ত্র, ইহার নামান্তর আন্বীক্ষিকী। ইহা গোতম ঋষি প্রণীত; ইহাতে প্রমাণ, প্রমেয়, ইত্যাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব নিশ্চয় হইলে মুক্তি হইবার কথা লেখা আছে। বৈশেষিক ইহার অন্তর্গত, ইহাতে দ্রব্যগুণ প্রভৃতি ষট্ পদার্থ নিশ্চয়ে ঈশ্বর তত্ত্ব নিশ্চয় ও মুক্তিলাভ হইবার বিধান কণাদ ঋষি করিয়াছেন।

মীমাংসা দুই প্রকার। কর্ম্ম মীমাংসা ও ব্রহ্ম মীমাংসা। জৈমিনি ঋষি কর্ম্ম মীমাংসা ও সংকর্ষণ কাণ্ড ও দেবতা কাণ্ড নামে তিনখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এবং ব্রহ্ম মীমাংসা, অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন, বেদব্যাস প্রণীত। ইহা চারি অধ্যায়। জীব ব্রহ্মের ঐক্য, প্রারব্ধ নির্ণয়, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন; সগুণ নিগুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নির্ণয়। সাঙ্খ্যশাস্ত্র কপিলদেব প্রণয়ন করেন। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। বিষয় নিরূপণ প্রকৃতির কার্য্য, বৈরাগ্য, উপদেশ, পরোক্ষ নির্ণয়, এবং এই সমস্ত বিষয়ে সারার্থ বিষয়ক উপসংহার।

পতঞ্জলি ঋষি প্রণীত যোগশাস্ত্র ইহা চতুষ্পাদে সংস্থাপিত হয়। প্রথম সমাধি অভ্যাস, ও বিষয় বৈরাগ্যের কারণ নিরূপণ। দ্বিতীয়ে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সবিকল্পক, ও নির্ব্বিকল্পক,

* মহাভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, এবং দেবী ভাগবত, এই তিন ভাগবত লইয়া কিছু বিরোধ আছে। ফলতঃ মহাভাগবত এই অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়; কেননা তাহাতে লেখা আছে যে সপ্তদশ পুরাণান্তে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

† প্রভৃতির মধ্যে সাম্ব, পাদ্ম, বায়বীয়, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, বৃহৎকূর্ম্ম পুরাণ প্রভৃতি আছে। উপপুরাণের সংখ্যা গণনায় ন্যূনাতিরেক আছে। অনুমানে প্রায় সকলই লেখা হইয়াছে।

সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ নিরূপণ। তৃতীয়ে, যোগ বিভূতি বর্ণন। চতুর্থে কৈবল্য মুক্তি নিরূপণ।

পাশুপত শাস্ত্র মহাদেবের কৃত; এই গ্রন্থে পাঁচ অধ্যায় আছে কার্য্যরূপী জীব পশু, ও ঈশ্বর রূপ পতিতে চিত্ত সমাধান, ত্রৈকালিক স্নানাদি বিধি নিরূপণ, দুঃখ, ও দুঃখের অন্তমোক্ষরূপ প্রয়োজন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র নারদাদি ঋষি প্রণীত। ইহাতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এবং মন ও অহঙ্কার এই চারিরূপে মূর্ত্তি চতুষ্টয়ে ভগবানের আরাধনায় মুক্তিলাভ হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গার্গ, প্রচেতা, মরীচি, পুলস্ত্য ভৃগু, নারদ, বিশ্বামিত্র, দেবল, ঋষ্যশৃঙ্গ, গার্গ, বৌধায়ন, পৈঠীনসি, জাবালি, সুমন্ত, পারস্কর, লোকাক্ষী, কুথুমি, অগ্নি. চ্যবন, ছাগলেয়, যাতুকরণ, পিতামহ, প্রজাপতি, বুধ, শাতায়ন, সোম, ধৌম্য, আশ্বলায়ন, দত্ত, ভাগুরি, কাষ্ণজিনি, এই সকল ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে কাহার কাহার, বৃদ্ধ, লঘূ, বৃহৎ, নামে তিন তিন সংহিতা আছে। যথা বৃদ্ধ মনু, ও বৃহন্মনু, ও লঘু মনু।*

এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে আরও অনেক আছে, তাহা রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সংগ্রহ; অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব দর্শনে জানা যায়, অর্থাৎ নাড়ীজঙ্ঘ, গোভিল, সূত্র ইত্যাদি অনেক আছে কিন্তু তৎসমস্ত সংহিতা নামে খ্যাত কি না জানিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্ন বাল্মীকি ঋষি প্রণীত রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণ ও মহাভারত ও যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

উপবেদের মধ্যে, প্রথম আয়ুর্ব্বেদের অষ্টস্থান। সূত্র, শারীর, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প, সিদ্ধি। ব্রহ্মা প্রজাপতি অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ্য এই অষ্ট ঋষি, চরককে এই

* সংখ্যা গণনা সংহিতাতে ন্যূনাতিরেক আছে তাহার ঐক্য করিয়া দ্বিরুক্তিভাগ ত্যাগ করিয়া অতিরিক্ত লওয়া হইল।

অষ্ট স্থানের উপদেশ দেন। চরক ঋষি সংক্ষেপ করিয়া চরক নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায় যুক্ত যে গ্রন্থ প্রস্তুত করেন তাহা আবার তিনিই সংক্ষিপ্ত করেন। ঐ গ্রন্থ হইতে ধন্বন্তরির উপদেশ মতে সুশ্রুত নিজ নামে সুশ্রুত নামক এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহাতে ১ শল্যতন্ত্র। ২ সালোক্য। ৩ কায়চিকিৎসা। ৪ ভূত-বিদ্যা। কৌমারভৃত্য অর্থাৎ বাল্য চিকিৎসা। অগদতন্ত্র, সর্প বিষাদি চিকিৎসা; রসায়নতন্ত্র অর্থাৎ আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও বলকরাদি, রাসায়নিক। বাজী-করণ তন্ত্র শুক্র, বল, পুষ্টি, করণাদি ব্যাপার; এই সকল বিষয় মীমাংসা আছে। এই দুই গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন রূপে ৫ বাভট্ট একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন তাহার নাম বাভট। এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত কামশাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ বাৎস্যায়ন ঋষি প্রস্তুত করেন। ইহাতে বৈরাগ্য উৎপাদনের উপায় নিরূপণ আছে; এই সকল শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য রোগ ও তাহার কারণ এবং রোগ নিবৃত্তির উপায় পরি-জ্ঞান। দ্বিতীয় উপবেদ, ধনুর্ব্বেদ। ইহা বিশ্বামিত্র ঋষি প্রণয়ন করেন। এই শাস্ত্র চারিপাদে বিভক্ত। দীক্ষাপাদ, সংগ্রহ, সিদ্ধি, ও প্রয়োগ; প্রথম পাদে দীক্ষাপাদ অস্ত্রের লক্ষণ, ও অধিকারী নির্ণয়, অস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত; মুক্ত অর্থাৎ চক্রাদি, অমুক্ত অর্থাৎ খড়্গাদি, মুক্তামুক্ত অর্থাৎ শল্যাদি; যন্ত্রমুক্ত অর্থাৎ শরাদি; দ্বিতীয় সর্ব্বপ্রকার শস্ত্র সংগ্রহ, ও তদ্বিদ্যায় পার-দর্শী গুরুর লক্ষণ। এবং শস্ত্র গ্রহণের প্রকার নির্ণয়। তৃতীয় পাদে শস্ত্র অভ্যাস প্রভৃতি কার্য্য নির্ণয়। চতুর্থ পাদে দৈব অস্ত্রের প্রয়োগ বিবরণ। এই শাস্ত্র দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতির রাজত্ব বিষয়ক প্রজাপালনাদি ধর্ম্ম সকল নিরূপণ হইয়াছে। তৃতীয় উপবেদ গন্ধর্ব্ববেদ, ভরত ঋষি এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন; ইনি শিবের শিষ্য ও তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ইহাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য, শিক্ষার উপায়বিধান আছে। ইহা দ্বারা দেবতা আরাধনা ও সমাধি সিদ্ধি হইতে পারে। নারদ প্রভৃতি

১ অস্ত্র চিকিৎসা। ২ ঊর্দ্ধ শরীরগত রোগ।
৩ জরাদি রোগ চিকিৎসা। ৪ দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদি উপশমনার্থে শান্তি।
৫ বাভট ঋষি নহে ও শাস্ত্রকর্ত্তা নহে।

অনেক ঋষি সংগীত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; সংগীত শাস্ত্র যেমন পরমার্থিক উপকারজনক তদ্রূপ ব্যবহারেও অতি মনোহর পদার্থ।

চতুর্থ উপবেদ অর্থশাস্ত্র; ইহা বিবিধপ্রকার, যথা নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সূপকার-পাকশাস্ত্র, এবং চতুঃষষ্ঠি কলাশাস্ত্র। এই সকল শাস্ত্র নানা ঋষিগণ প্রস্তুত করেন। ইহাতে লৌকিক প্রয়োজন সকল সিদ্ধ হয়।

তন্ত্র শাস্ত্র সকল, শিবের কৃত ইহাকে আগম শাস্ত্রও বলে। ইহা বহু সংখ্যক যথা। সিদ্ধীশ্বর মহাতন্ত্র, কালীতন্ত্র, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, নীলতন্ত্র, ফেৎকারী, দেব্যাগম, উত্তরাখ্য, শ্রীক্রম, সিদ্ধিযামল, মৎস্যসূক্ত, সিদ্ধিসার, সিদ্ধিসারস্বত, বারাহী, যোগিনী, গণেশমর্দ্দিনী, নিত্যাতন্ত্র, শিবাগমতন্ত্র, চামুণ্ডাখ্য, মুণ্ডমালা, হংসমাহেশ্বরতন্ত্র, নিরুত্তর, কুলপ্রকাশক, কল্প, গান্ধর্ব্বক, ক্রিয়াসার, নিবন্ধাখ্য, সম্মোহনতন্ত্ররাজ, ললিতাখ্য, রাধাতন্ত্র, মালিনী, রুদ্রযামল, বৃহৎশ্রীক্রম, গবাক্ষ, সুকুমুদিনী, বিশুদ্ধেশ্বর, মালিনী বিজয়. সময়াচারতন্ত্র, ভৈরবী, যোগিনীহৃদয়, ভৈরব, সনৎকুমার, যোনি, নবরত্নেশ্বর, কুলচূড়ামণি, ভাবচূড়ামণি, কামাখ্যা, কামধেনু, কুমারী, ভূতডামর, মানিনীবিজয়, যামল, ব্রহ্মযামল, বিশ্বসার মহাতন্ত্র, মহাকাল, কুলামৃত, কুলোড্ডীশ, কুব্জিকা, মন্ত্রচিন্তামণি, নির্ব্বাণ, মহানির্ব্বাণ, মহিষমর্দ্দিনী, কাত্যায়নী, কঙ্কালমালিনী, কালীকুলসর্ব্বস্বতন্ত্র, কালীবিলাসাদিতন্ত্র, মহাচীনাদি তন্ত্র; এতদ্ভিন্ন যামল, ও ডামর ঐশ্বরকল্প, মুক্তকাখ্য, প্রপঞ্চ, সারদা, নারদ, মহার্ণব, কপিল, যোগকল্প. কপিঞ্জল, অমৃত. শুদ্ধিবীর, সিদ্ধসম্বরণ। ইহা সমস্ত তন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। আর ঋষিদিগের কৃত উপতন্ত্র, যথা—বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ভার্গব, সিদ্ধ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি, প্রভৃতির অনেক গ্রন্থ আছে। তন্ত্রশাস্ত্র যে আরও কত আছে তাহা সঙ্খ্যা করা যায় না। ভগবান ভবানীপতি বেদকে শব্দান্তর দ্বারা তন্ত্র শাস্ত্র রূপে প্রস্তুত করিয়াছেন। নিগম বেদকে বলা যায়। এবং ভগবতী মহাদেবকে যাহা বলেন. তাহাকেও নিগম শাস্ত্র বলে। এতদ্ভিন্ন সংগ্রহকার দিগের গ্রন্থে যে আরও কত শাস্ত্রের কথা ও নাম উল্লেখ আছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির

দ্বারা কোন ক্রমেই হয় না।* তবে অনুসন্ধান করতঃ নানা গ্রন্থ হইতে যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লিপি করিলাম। ফলতঃ শাস্ত্র সকল অনন্ত, তাহার সীমা নাই। কারণ পরমেশ্বর অনন্ত ও তাঁহার কার্য্যও অনন্ত, এবং অনন্তপ্রকার; মনুষ্য অনন্তপ্রকার প্রবৃত্তি, ও অনন্ত আচার, অনন্ত ব্যবহার, অনন্ত দেশ অনন্ত বস্তু সকল সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে জগৎসংসারের কোন বস্তুরই অন্ত জানা যায় না। তবে আমাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় জানা হইলেই যথেষ্ট হইল, এ জন্য সনাতন ধর্ম্মের উপযোগী শাস্ত্র সকলের নাম প্রায় লেখা হইল। এতদ্ভিন্ন অন্য দেশীয় শাস্ত্র, ও নাস্তিকদিগের শাস্ত্র সকলের নাম ও কার্য্য সকল অপ্রয়োজনবিধায় অনুসন্ধান করা হইল না। এক্ষণে শাস্ত্র সকল কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যাউক।

নবম অধ্যায়।

শাস্ত্র সকল কোন্ সময় লিখিত হয়, তাহার নির্ণয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বেদ ব্রহ্মার মনে স্বয়ং প্রকাশিত হয়। তদনন্তর ব্রহ্মা, মনু ও প্রজাপতিগণকে উপদেশ দেন; তাঁহারা তদনুসারে সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন। তদনন্তর ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায় যুক্ত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তৎপরে মনুর গ্রন্থ প্রকাশ হয়; তদনন্তর অন্যান্য শাস্ত্র ও পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র প্রায় লিখিত ছিল না। কারণ ঋষিরা তেজস্বী ও যোগী ছিলেন। তাহাদিগের কণ্ঠস্থ ছিল। এজন্য বেদের নাম শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ দ্বারা অধ্যয়ন হইত। এবং তৎপরে যে সকল স্মৃতি হইয়াছে তাহা স্মরণ অর্থাৎ বেদের বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত হওয়াতে তাহার নাম স্মৃতি হইয়াছে। পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন ঐতিহাসাত্মক গ্রন্থকে পুরাণ বলা যায়। এবং আগম ভবিষ্যৎ ব্যাপার সঙ্কলন।

---

* প্রবাদ আছে যে এদেশ যবনাধিকার হওয়াতে ঐ রাজারা অনেক পুস্তক দগ্ধ করিয়া আমারদিগের শাস্ত্রের অনেক নষ্ট করেন। পরে হিন্দুরা নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু সকল উদ্ধার হওয়া অনুমান হয় না।

এই সমস্ত শাস্ত্র ও বেদান্ত সকল প্রশ্নোত্তর ছলে বলা হইয়াছে। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ যে রচনাকালে লিখিত বা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তবে রাজকার্য্য প্রয়োজন জন্য কোন কোন ব্যবহারিক বিষয় লেখা পড়া পূর্ব্বে থাকা অনুমান হয় বটে; কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। তবে দ্বাপর যুগেব শেষে বেদব্যাস ঋষি বেদ বিভাগ করেন; এবং পুরাণ প্রস্তুত করেন। তৎপরে শাস্ত্র সকল লিখিত হওয়া অনুমান হয়। কারণ কলিযুগের লোক সকল অল্পায়ু ও অল্প বিদ্যা বুদ্ধিমান হইবেক, তাহারা কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিবেক না বিবেচনায় ঋষিগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্র সকল লিখিত হইবার সম্ভব; কেননা কলিযুগের প্রথমে রাজা জন্মেজয় সর্পক্ষয় যজ্ঞ করার পরে যে সময় নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে সৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করেন; তখনও মহাভারত ও পুবাণ সকল লিখিত হওয়া বোধ হয় না; কারণ তখনও প্রশ্নোত্তর ছলে, জিজ্ঞাসা করায় পুরাণ প্রচার হইতেছে। ইহাতে তৎকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র সকল লিখিত না হওয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে। যদিচ মহাভারতে আছে যে গণেশ মহাভারত লিপি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা দেবলোকে যাওয়ারই সম্ভব; কেননা মহাভারতে লেখা আছে যে, ষাইট লক্ষ শ্লোক মহাভারত গ্রন্থে রচিত হয়, তাহা স্থানে স্থানে যায় অর্থাৎ দেবলোকে ও নাগলোকে এবং অন্যান্য স্থানে যায়। তদ্রূপ শাস্ত্রান্তরে আছে যে বেদের মন্ত্রভাগ ও তন্ত্র শাস্ত্র গণেশ লিখিয়াছেন। ফলতঃ ঐ লিখিত গ্রন্থ মনুষ্য-লোকে থাকার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপিচ স্মৃতি ও বেদান্তে এবং পুবাণের কতকাংশে ভবিষ্যৎ বাণী ও ভবিষ্যৎ আচরণ করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে সৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষিরা নৈমিষারণ্যে যজ্ঞকার্য্য সমাধা অন্তে পুরাণাদি শ্রবণ করত, দয়ার পরতন্ত্র হইয়া বহুতর শাস্ত্র লিপি করত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সাধারণের গোচর ছিল না, এবং জনপ্রবাদও ঐরূপ আছে। সুতরাং বহুতর শাস্ত্র ঐ সময়ে লিখিত হওয়াই নির্ণীত হইতেছে। ঐসকল শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এবং তাঁহার কার্য্য সকল বর্ণিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ জগৎ পদার্থ

দর্শনে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ এবং কার্য্য মীমাংসা করা হইয়াছে; তদ্রূপ শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎকর্ত্তৃক এই জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বিশিষ্ট হওয়া জানা যাইবেক। ফলতঃ অনুলোম ও বিলোম* ক্রমে যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও কার্য্য এবং স্বরূপ নির্ণয় হয়। অতএব শাস্ত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত যুক্তিমূলক মীমাংসা ঐক্য করণ অভিপ্রায়ে, শাস্ত্র সকলের উল্লেখ করা হইল। ইহাতে প্রথমতঃ দর্শনশাস্ত্র ও তদনন্তর অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ঐক্য করা যাইবেক; তন্নিমিত্ত অগ্রে ন্যায়, দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনের সহিত ঐক্য মীমাংসা করা যাইতেছে।

দশম অধ্যায়।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন শাস্ত্রের সার ও ঐক্য মীমাংসা।

১০ অধ্যায়। মূল ন্যায়দর্শন গৌতম ঋষি প্রণীত। তাহাতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহ স্থান, এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব নিশ্চয় হইলে মুক্তিলাভ হয় এই কথা আছে। ঐ গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে; কারণ জনপ্রবাদ আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র, যখন পিতৃসত্য পালনে বনে গমন করেন, তখন জনৈক পণ্ডিত প্রোক্ত ন্যায়শাস্ত্রের কুতর্ক দ্বারা তাঁহাকে বনগমনে নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন রামচন্দ্র অভিশাপ প্রাদন করেন যে, এই কুতর্ক শাস্ত্র যে পাঠ করিবেক, সে শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত হইবেক। তৎকারণে ঐ গ্রন্থ কেহ পাঠ করেন না। তদনন্তর বহুকালগতে যখন এই প্রদেশে অধিক লোক নাস্তিক হইয়াছিল, তখন কেহ তাহাদিগকে বিচারে পরাভব করিতে না পারায় বর্ত্তমান প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার আদি গ্রন্থ কুসুমা-

---

* জগৎ হইতে ঈশ্বরের, অস্তিত্ব ও ঈশ্বর হইতে এই জগৎ হয়। এই অনুলোম বিলোম মীমাংসা।

গুলি ; ও তদনন্তর চারি চিন্তামণি গ্রন্থ প্রস্তুত হয়।* পরে ভাষা পরিচ্ছেদ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রস্তুত করণান্তে, তাহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানিতে অতিশয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে ; ঐ গ্রন্থে দ্রব্য গুণ প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহা ব্যবহারে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং তাহাতে ঈশ্বরকে নিত্য পদার্থ বলিয়া স্থির করতঃ তাঁহার স্বরূপ ও কার্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। যথা ঈশ্বর, নিত্য জ্ঞান, ও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য কৃতিমান্। এবং তাঁহার নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কৃতিত্ব আছে। এ বিষয় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি মূলক সিদ্ধান্তের সহিত অনৈক্য নহে ; কেননা ঈশ্বর শক্তিযুক্ত চৈতন্য। এবং তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন। পরন্তু ঐ গ্রন্থকার ঈশ্বরে আরও কতকগুলি গুণ থাকা বলেন ; তাহাতে বোধ হয় ঐ গ্রন্থকার† সগুণ ব্রহ্মের বর্ণন করিয়াছেন। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করেন নাই। কিন্তু এই গ্রন্থে যে ঈশ্বরকে শক্তিমচ্চৈতন্য, ও সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলা হইয়াছে তাহার সহিত অনৈক্য নাই। তবে ভাষা পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, পরমাণু, দিক্ ও কাল, এবং গগণ, ও জীব নিত্য। ইহা এই গ্রন্থের সহিত অনৈক্য বটে, কিন্তু তাহা সাঙ্খ্য ও বেদান্তের সহিত অনৈক্য নহে। তবে ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা যে উহা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার কারণ এই যে, নাস্তিকেরা যুক্তি অনুসারে ঐ সকল পদার্থকে নিত্য পদার্থ বলাতে, ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা নাস্তিকের মতকে স্বীকার করিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহারা ঐ সকল পদার্থকে মুখ্য নিত্য বলিয়া মীমাংসা করেন নাই। যদিও নিত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা গৌণ নিত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই অনুমান হইতেছে। কেননা গৌণ নিত্য শব্দের যে লক্ষণা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে, পরমাণু, ও দিক্, কাল, গগণ, এবং জীব, গৌণ নিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। এবং ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইলে, বেদান্তদর্শন, ও সাঙ্খ্যদর্শন প্রভৃতি কোন শাস্ত্রের সহিত কোন শাস্ত্রের অনৈক্য

---

* কেহ বলেন যে অগ্রে চারি চিন্তামণির গ্রন্থ হয় পরে কুসুমাঞ্জলি

† সগুণ, নির্গুণ পরে মিমাংসা হইবেক

থাকে না। কারণ মহাপ্রলয় সময়ে পরমেশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তুই থাকে না; কেবল মুখ্য নিত্য অব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্য পরমেশ্বর থাকেন।* তাঁহা হইতে ক্রমশঃ যে সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হয়; তাহা প্রতিকল্পে সমানরূপে ঐরূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া গৌণনিত্য। যেমন বেদ প্রতিকল্পে সমানরূপে প্রকাশ হওয়ায় প্রবাহরূপে নিত্য; এবং পরমেশ্বর হইতে নিশ্বাসের ন্যায় প্রকাশ হয় বলিয়া,জন্য বিধায় তাহা গৌণনিত্য। অথবা নিত্যানিত্য সিদ্ধান্তিত হইয়াছে†। তদ্রূপ দশ দিক্-রূপ, দিক্ সকল, চন্দ্র, সূর্য্য দ্বারা ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, প্রহর, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, অয়ন, বৎসর, যুগ, রূপে কাল; এবং শব্দ তন্মাত্রা হইতে অতিশয় সূক্ষ্ম শব্দ সকল, আকাশের পরমাণু। অন্যান্য তন্মাত্রা হইতে বায়ু প্রভৃতির পরমাণু উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ আকাশাদি স্থূল ভূত হয়। এবং সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীবে চৈতন্যের আবির্ভাব থাকাতে তাহাকে জীব বলে; তাহা উপাধি অর্থাৎ শরীর জন্য এবং চৈতন্যাংশ নিত্য‡ বিধায় ঐ সকল পদার্থ প্রতিকল্পে সমানরূপে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় বলিয়া, তাহাদিগকে গৌণ নিত্য অথবা নিত্যানিত্য বলা যায়। বিশেষতঃ বেদ বিধি দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য হওয়াতে, বেদ গৌণ নিত্য থাকায় সুতরাং অন্যান্য পদার্থও গৌণ নিত্য হইবে। এই কারণে ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে মুখ্য নিত্য বলেন নাই। তবে মহাকাল ও মহাদিক্ ব্রহ্ম শক্তির অন্তর্ভূত বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে নিত্য পদার্থ বলিয়াছেন, ফলতঃ ইহারা পরমেশ্বরের শক্তি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নহে। কেন না মহাপ্রলয় সময়ে পদার্থরূপে আর কিছুই অনুভব হয় না; তবে যদি বল, তৎকালে শক্তিমচ্চৈতন্যেরও অনুভব থাকে না। কিন্তু তাহার অস্তিত্বের অনুমান হয়, নতুবা তাহার অভাব হইলে সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। অতএব পূর্ব্বেই যে শক্তিমচ্চৈতন্য মুখ্য নিত্য পদার্থ মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত হইতেছে না। বিশেষতঃ চিচ্ছক্তির ক্ষয়,উদয় নাই। তাহা চৈতন্যের

* মনু ১ অধ্যায় ৫৪ ও ৫ শ্লোক।

† অধিকরণ মালার ৩ সূত্র।

‡ এই সকল বিষয় ক্রমশঃ মীমাংসা করা যাইবেক এবং জীবের স্বরূপ তৃতীয় ভাগ ১ম অধ্যায় দৃষ্ট কর।

সহিত অভিন্ন মুখ্য নিত্য পদার্থ; তাহা হইতে প্রকাশিত প্রোক্ত দিক্ কালাদি বস্তু সকল ত্রিগুণা প্রকৃতির অবস্থা বিশেষ। তাহা পরে আরও পরিষ্কার রূপে মীমাংসা করা যাইবেক *। এক্ষণে দেখা যাউক যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে কি প্রভেদ আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ দুই দর্শনে অল্প মাত্র প্রভেদ আছে। বর্ত্তমান ন্যায় দর্শনে দ্রব্যগুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, ও অভাব; এই সাতটি পদার্থের বিচার করা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে ষট্ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে; তাহাতে অভাব পদার্থ স্বীকৃত নহে। নতুবা ঐ দুই দর্শনের একই মত। এই দুই দর্শনকে আরম্ভবাদ বলা হইয়াছে; কেননা ইহারা বলেন যে, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র। যেমন কুম্ভকার চক্র, দণ্ড, সলিল, মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ ঈশ্বর জীবের অদৃষ্টানুসারে পরমাণু সংযোগ করিয়া ভূত চতুষ্টয় অর্থাৎ পৃথিবী, জল, ও তেজ, বায়ুর সৃষ্টি আরম্ভ করেন। পশ্চাৎ নিজ শক্তি প্রকাশ করতঃ দেহ ইত্যাদি পদার্থ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ দুই শাস্ত্রে জীব ও তাহার কর্ম্ম এবং অদৃষ্ট বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন; তদ্বিষয় পশ্চাৎ সিদ্ধান্ত করা যাইবেক।† তবে ঐ দুই গ্রন্থকার পরমাণু প্রভৃতি উপাদান সকল ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হওনার কথা মীমাংসা করেন নাই। কিন্তু ইহা অনৈক্যের কারণ নহে; কেননা নাস্তিক নিরাসের জন্য ব্যবহারিক যুক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় মীমাংসা না করায় অনৈক্য দোষ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের শাস্ত্র সকল পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, একখানি গ্রন্থে সমুদায় বিষয় মীমাংসা নাই; তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে কেবল অনৈক্য দোষ আছে কি না তাহাই মীমাংসা করা হইতেছে। অতএব ন্যায় ও বৈশেষিক গ্রন্থের আবশ্যকীয় সার ভাগের ঐক্য থাকা দেখান হইল। অতঃপর সাঙ্খ্য দর্শনের সার কি? তাহা দেখা যাউক্।

* দ্বিতীয় ভাগের ১০ম অধ্যায় দৃষ্ট কর।

† তৃতীয় ভাগ ৮ম অধ্যায় দৃষ্ট কর।

একাদশ অধ্যায়।

সাঙ্খ্য দর্শনের সার।

সাঙ্খ্যদর্শনে প্রকৃতি, পুরুষ, অনাদি ও নিত্য। স্বত্ব, ও রজঃ, এবং তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; এবং চৈতন্য বস্তু পুরুষ। এই পুরুষ ও প্রকৃতি যে সময় পৃথক্‌ভাবে থাকেন, তখন মহাপ্রলয় হয়। তদনন্তর যে সময়ে পুরুষ প্রকৃতির সহিত যোগ করেন, তখন সৃষ্টি স্থিতির কার্য্য চলিতে থাকে। অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করেন। এবং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যে প্রকৃতিই প্রধান; কেন না বিকার ও গুণ সকল প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়। প্রকৃতি পুরুষ উভয় উভয়কে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের সাহায্যে জগৎ কার্য্য করিতে থাকেন। যেমন অন্ধ ও পঙ্গুর একের চক্ষু ও অপরের চরণ নাই; কিন্তু এক ব্যক্তি অন্যকে স্কন্ধে করিলে স্কন্ধস্থ পঙ্গু যেমন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ জড় প্রকৃতি, পুরুষ চৈতন্যের সাহায্যে সৃষ্টি করিতে থাকেন। তাহাতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব,* ও তাহা হইতে অহঙ্কার তত্ব,† ও তাহা হইতে মনঃ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। এই শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা; ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, অর্থাৎ বাক্, ও হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ; এই দশেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ব বলে। চৈতন্য পুরুষ ইহার অতীত বলিয়া তাহা সমেৎ পঞ্চবিংশতি তত্ব নিরূপণ হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থের মধ্যে প্রকৃতি ও মহৎ এবং অহঙ্কার, ও পঞ্চ তন্মাত্রা এই আটটিকে, প্রকৃতি ও অবশিষ্ট মন ও দশেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত, এই ষোলটিকে বিকার বলা হইয়াছে। ইহার

---

* বুদ্ধির সূক্ষ্মাবস্থা।

† অহং—আমি।

মধ্যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহৎ অবধি ত্রয়োবিংশতি পদার্থ উদ্ভূত হওয়ায় তাহাদিগকে প্রকৃতির পরিণাম বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি পদার্থকে, তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু কেহ, কেহ মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ একাদশ ইন্দ্রিয় রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ও কেহ কেহ মহত্তত্ত্ব না বলিয়া তাহার স্থূল অবস্থা বুদ্ধিকে তত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। সাঙ্খ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি পুরুষের অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বতন্ত্র বস্তু থাকা মীমাংসিত না হওয়ায় ঐ শাস্ত্রকে কেহ কেহ অনীশ্বরবাদী বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর শব্দে জগতের কর্ত্তা বুঝায়; ও প্রকৃতিস্থ চৈতন্যকে বেদান্তদর্শনে সগুণ ও ঈশ্বর বলিয়াছেন। তবে সাঙ্খ্য শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম উল্লেখ না করিয়া ইহাকে প্রকৃতি পুরুষ বলাতে; এই শাস্ত্র নাস্তিক শাস্ত্র নহে, ইহা প্রধান আস্তিক শাস্ত্র। ইহাতে মুক্তির বিশিষ্ট উপায় নিরূপণ আছে; অতএব এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বেদান্ত দর্শনের সহিত ঐক্য থাকা মীমাংসা করার নিমিত্ত উদ্ধৃত করা হইল। এক্ষণে বেদান্তদর্শনের মত কি তাহা দেখা যাউক।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বেদান্তদর্শনের সার।

বেদান্ত দুই প্রকার। বেদের অন্তভাগ যে উপনিষদ তাহাকে বেদান্ত বলে। আর বেদব্যাস ঋষি কতকগুলি সূত্র করিয়া যে মীমংসা করেন, তাহার নাম শারীরিক সূত্র, অথবা বেদান্ত দর্শন। তাহাতে ঐ দর্শনের মত কি তাহার সার ভাগ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই দর্শনের প্রথম সূত্র, ("অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা") ব্রহ্ম কি বস্তু? এবং দ্বিতীয় সূত্র, ("জন্মাদ্যস্য যতঃ") অর্থাৎ যাঁহা হইতে জগদুৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হয়, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণা ও তটস্থ লক্ষণা দ্বারা নিরূপণ। তাহাতে স্বরূপ লক্ষণা (" সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম") অর্থাৎ তিনি নিত্য, জ্ঞান, ও অনন্ত

স্বরূপ। তটস্থ লক্ষণা, ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সম্বিশন্তি") অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে ভূত সকল জন্মিয়াছে; এবং তাহাতে স্থিত, পালিত, ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রূপ সকল বিষয় শ্রুতি যুক্তি অনুসারে নির্ণয় হইয়াছে। এই শাস্ত্রের মত এই যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়; অর্থাৎ তাঁহার সজাতীয় ও বিজাতীয় কোন বস্তু নাই। তিনি নিত্য, জ্ঞানময়, আনন্দময়; তিনি আত্মশক্তি মায়া সহকারে এই জগৎ সৃজন পালন সংহার করেন। ঐ মায়া অঘটন ঘটনা পটীয়সী ও ত্রিগুণাত্মিকা; তাহার সহকারে, জ্ঞানময়, ঈশ্বর, সংকল্প পূর্ব্বক এই বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া জড়, প্রকৃতির সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব নাই। চৈতন্য পদার্থের চারি অবস্থা, ও চারি নাম, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, নির্গুণ, তুরীয় ব্রহ্ম, ও ঈশ্বর এবং হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট চৈতন্য। তাহাতে ঈশ্বর, চৈতন্য হইতে আকাশাদি ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ ভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা পঞ্চ তন্মাত্রা, তদনন্তর অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত এবং পঞ্চীকৃত স্থূল ভূত সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সগুণ ব্রহ্ম, এবং কারণ শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য; ঈশ্বর। ও সূক্ষ্ম, শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ; এবং স্থূল শরীর বিশিষ্ট চৈতন্য বিরাট, ইহাদিগের সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে জগৎ সংসার হইতেছে। এবং ঐ দর্শনে অন্নময়, প্রাণ-ময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময়, এই পঞ্চ কোষ বিচার করা হইয়াছে। এবং ঐ গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, জগতের সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য। এই জ্ঞানের নাম অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান; এই জ্ঞান হইলে মুক্তি লাভ হয়। আর তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য অনাবৃত, এবং নির্গুণ, ইনি নিমিত্ত কারণ, ও বিবর্ত্ত উপাদান কারণ, ইত্যাদি বিষয় সকলও মীমাংসা করা হইয়াছে। এক্ষণে সাঙ্খ্য ও বেদান্ত দর্শনের মূল বিষয়ের ঐক্য মীমাংসা করণ জন্য, আর আর বিষয় সকল উদ্ধৃত না করিয়া, কেবল প্রোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল লেখা হইল। অতএব, উভয় দর্শনের ঐক্য কিরূপে হয় তাহা নির্ণয় করা যাউক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সাঙ্খ্য ও বেদান্তদর্শনের ঐক্য মীমাংসা।

বেদান্ত দর্শনে বলা হইয়াছে যে, তুরীয় ব্রহ্ম, চৈতন্য নিগু'ণ,ও অদ্বিতীয়, এবং তিনি মায়া সহযোগে সগুণ ঈশ্বর নামে খ্যাত হয়েন। ঐ মায়া বিদ্যা, ও অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সাঙ্খ্য শাস্ত্রে নিগু'ণ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য* উক্ত হয় নাই। কিন্তু ঐ শাস্ত্রের উক্তি মীমাংসা করিলে ঐ রূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কারণ ঐ শাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে, স্থূল ভূত সকল স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হইলে, যখন মহাপ্রলয় হয় তখন প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন ভাবে থাকেন। কিন্তু তদনন্তর কি হয় তাহা বলা হয় নাই। ফলতঃ প্রকৃতি পুরুষ উভয় নিরাকার। তন্মধ্যে পুরুষ চৈতন্য ও প্রকৃতি গুণময়ী। ঐ গুণময়ী প্রকৃতি পৃথক্ ভাবে থাকার কথা বলাতেই অনুভব হয় যে, প্রলয় কালে প্রথমতঃ পৃথক্ ভাবে থাকিয়া, পরে ঐ প্রকৃতি পুরুষে লয় হয়েন। কেন না বেদান্তে বলিয়াছেন যে, মহাপ্রলয় সময়ে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া পরব্রহ্মে লয় হয়েন। ইহার সহিত ঐক্য করিতে হইলে, সাঙ্খ্য মতে যে, প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন ভাব থাকা বলেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ পৃথক ভাবে থাকিয়া পরে প্রকৃতি পুরুষে লয় প্রাপ্ত হয়েন। বিশেষতঃ উভয় গ্রন্থের মতে সমাধি সাধন স্বীকার করিয়াছেন। সমাধির অবস্থা এই যে, কেবল আত্মাকারাত্মক্ জ্ঞান। তাহাতে মনকে, আত্মাতে বিলীন না করিলে, সমাধি হয় না। সমাধিও প্রলয় অবস্থা প্রায় একই বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সাঙ্খ্য মতে মনকে আত্মা হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে মুক্তি হয় যে বলা হইয়াছে, তাহা বস্তুর পৃথকত্ব থাকায় তদ্রূপ জ্ঞান করার বিধি হইয়াছে। ফলতঃ মনকে আত্মা হইতে স্থানান্তরিতরূপে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। মনকে আত্মাতে বিলীন করা যাইতে পারে। নতুবা এক দিকে মন; ও এক দিকে

* নিগু'ণ ব্রহ্ম।

আত্মা ইহা স্বতন্ত্র ভাবে রাখা সম্ভবপর নহে। সাধকেরা বলেন যে, মনের স্বরূপ আত্মাতে লয় হইলে মুক্তি হয়। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন ভাব অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ প্রকৃতি পুরুষে লয় হওয়াই অনুভব হয়, নতুবা তিনি মহাপ্রলয় সময়ে পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারেন না। বরং প্রকৃতি পুরুষে লয় হইয়া থাকাই সম্ভব; কেন না গুণময়ী প্রকৃতি অধিক কাল নিরাশ্রয় থাকিতে পারেন না; ও তাহা অন্য কোন দৃশ্য বস্তু নহে যে, স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবেন। যেমন স্থষ্টি স্থিতি কালে ব্যবহারে স্থূল জড় ও চৈতন্যের পৃথকত্ব অনুভব হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল জড় বস্তুর অভাব হইলে গুণময়ী প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপে চিরকাল থাকার সম্ভব নহে। এবং তাহার স্বরূপ আর কিছুই জানা যায় না; বরং দ্রব্যের গুণের ন্যায়, আত্মার গুণ স্বরূপ প্রকৃতিকে বিবেচনা করা যায়, ঐ প্রকৃতি মহাপ্রলয় সময়ে শক্তিমচ্চৈতন্যে তিরোভাব অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত, এবং তাহা হইতে আবির্ভূত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধ চৈতন্য তুরীয় ব্রহ্ম, তাঁহাতে ত্রিগুণা প্রকৃতি লয় হওয়ার পূর্ব্বে ভিন্ন ভাব হইয়া, পরে লয় প্রাপ্ত হওয়া সিদ্ধান্ত হইলে, তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য একমাত্র বস্তু মহাপ্রলয় সময়ে থাকেন, তাহা নির্ণয় হইতে পারে। এবং তাহাতে যে অভিন্নশক্তি আছেন তাঁহার প্রকাশ হইলেই, ত্রিগুণা প্রকৃতির প্রকাশ হয়। তিনি তখন ভিন্ন ভাব অবলম্বন করিয়া তদনন্তর চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলে স্থষ্টিস্থিতি হইতে থাকে। *

এই প্রকৃতি পুরুষকে বেদান্ত দর্শনে সগুণ ঈশ্বর চৈতন্য বলা হইয়াছে। সাঙ্খ্য মতে ঐ প্রকৃতি পুরুষকে যে অনাদি বলা হইয়াছে প্রবাহরূপে ঐ অনাদি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কেন না ঐ প্রকৃতি পুরুষ শক্তিমচ্চৈতন্যের অবস্থা বিশেষ থাকাতে; প্রতি কল্পেই তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে বলিয়া, ঐরূপ প্রবাহের আদি নাই, ফলতঃ কল্পে কল্পে আদি আছে; তাহা পরে মীমাংসা করা যাইবেক। আপাততঃ ঐরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, সাঙ্খ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি পুরুষ যাঁহাকে বেদান্তে সগুণ ঈশ্বর

* তাৎপর্য্য এই যে স্থষ্টিকালে তুরীয় ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি প্রকাশ হইলে ভিন্নভাব হয় এবং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেও ঐরূপ পৃথক্ ভাব হয়।

বলা হইয়াছে; তাহার সহিত ঐক্য আছে। তবে সাঙ্খ্য দর্শনে প্রয়োজন বশতঃ ঐ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিয়া, নিগুর্ণ ব্রহ্মের বিষয় মীমাংসা করেন নাই। বেদান্ত দর্শনে নিগুর্ণ তুরীয় ব্রহ্মের বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন বলিয়া অনৈক্যের কোন কারণ নাই। আর বেদান্তে বলেন যে, মায়া সহকারে কর্ত্তারূপে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন; সাঙ্খ্য দর্শনে বলেন যে, প্রকৃতিই প্রধান, তিনি পুরুষের সহিত যোগে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। ইহাতে বেদান্ত মতে মায়াকেই প্রকৃতি, এবং ঈশ্বরকে মায়িক পুরুষ যে বলা হইয়াছে * ইহা সাঙ্খ্য মতের সহিত ঐক্যই আছে; তবে কেহ প্রকৃতি প্রধান, ও কেহ পুরুষ প্রধান বলিয়া, যিনি যাহা উক্ত করুন না কেন, তাহাতে উভয় মত একই হইতেছে। কারণ যখন প্রকৃতি পুরুষ যোগ ব্যতীত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হইতে পারে না, তখন উভয়েরই যে, কর্ত্তৃত্ব আছে ইহার আর সন্দেহ নাই। বেদান্ত দর্শনে যে পঞ্চকোষ মীমাংসা করিয়া, জড় প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন থাকা দেখাইয়াছেন; তাহা সাঙ্খ্য মতের সহিত অনৈক্য নহে। আর সাঙ্খ্য শাস্ত্রে বলেন যে, জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। অতএব তাহাকে পরিণামবাদী বলা হইয়াছে। বেদান্তে ঐ পরিণামকে বিবর্ত্ত অর্থাৎ মায়িক পরিণাম বলিয়াছেন। এই বিষয় এবং আর আর বিষয় সকল, অন্যান্য শাস্ত্র যুক্তির সহিত ঈশ্বরের স্বরূপ মীমাংসা কালে সিদ্ধান্ত করা যাইবেক। এক্ষণে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি? তাহা নির্ণয় করা যাউক্।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও তাহার সার ভাগের ঐক্য নির্ণয়।

নাস্তিক নিরাস, ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসা পূর্ব্বক মুক্তি কিরূপে হইতে পারে; ইহাই দর্শন শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। তন্নিবন্ধন তাঁহারা জগৎ কি? এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কি? পদার্থ কি? ও কর্ম্ম, ও উপাসনা

* মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং। ইতি পঞ্চদশী গ্রন্থে চোক্তং।

কি? তৎসমুদায় আনুসঙ্গিক ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন। ঐ মীমাংসা সকল আপন আপন প্রয়োজন বশতঃ যুক্তি অনুসারে করা হইয়াছে। কিন্তু স্ব স্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত মীমাংসা কেহ করেন নাই। এবং এক দর্শনের মতের সহিত অন্য দর্শনের মত, ঐক্য অথবা অনৈক্য হউক, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই; বরং পরস্পরের মতকে, পরস্পর খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যাহা বলুন না কেন, ফলিতার্থে ঈশ্বর কি, বস্তু ও তাঁহার কার্য্য কি? তাহাতে কাহারও অনৈক্য নাই। কেন না প্রকৃতি পুরুষ হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয়; ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তবে প্রকৃতি পুরুষ বিচার বিষয়ে কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষকে পৃথক, কেহ কেহ একত্র অর্থাৎ যুক্ত, ও কেহ কেহ মিশ্রিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রণালী বিষয়ে, যিনি যে বস্তু, আদি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা হইতে সৃষ্টির প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বিশিষ্ট হওয়া, বিষয়ে কোন অনৈক্য নাই। মুক্তি বিষয়ে ন্যায়দর্শনে বলা হইয়াছে যে, প্রমাণ, প্রমেয়, প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব; এবং বৈশেষিক দর্শনে ষট্ পদার্থের তত্ত্ব; ও সাঙ্খ্য দর্শনে প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব নিশ্চয়রূপে জানিলে, এবং বেদান্ত দর্শনে সমস্ত বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মুক্তিলাভ হয়। এই চারি দর্শনের তাৎপর্য্য এই যে শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে, দৃশ্য পদার্থ সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে ও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারিলে মুক্তিলাভ হইতে পারে। মীমাংসা দর্শনে বলেন, কর্ম্মদ্বারা জীবের বন্ধন, এবং তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। পাতঞ্জল দর্শনে বলেন যে, যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং মুক্তিলাভ হয়। ইহাতে এই দুই দর্শনের তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর প্রসাদাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তিলাভ হইতে পারে। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত চারি দর্শনে, যে জড়াদি পদার্থের নিশ্চয়, ও তাহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা যে বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মতে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করিবারও প্রয়োজন থাকা মীমাংসিত হইয়াছে। এবং শেষোক্ত দুই দর্শনে, যে কর্ম্ম করার প্রয়োজন থাকা বলিয়াছেন, তাহাতেও ঈশ্বর বস্তু কি তাহা শাস্ত্র বিচার দ্বারা নির্ণয়

করিবার বিধিও আছে। অতএব কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হইলে মুক্তিলাভ হয়; ইহা সকল দর্শনকারেরই মত হইতেছে। তন্নিমিত্ত দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন অনৈক্য না থাকা দৃষ্ট হইতেছে। তবে ব্যবহার বিষয়ে যে অনৈক্য দেখা যায়, তাহা কর্ম্মণ্য নহে; কেন না যেমন নদ নদী সকল নানা পথগামী হইলেও সকলই সমুদ্রে গমন করে, তদ্রূপ দর্শনকারদিগের ব্যবহারিক মত সকল প্রভেদ থাকিলেও তত্ত্ব বিষয়ে, অর্থাৎ মুক্তিলাভ, ও ঈশ্বরের স্বরূপ এবং কার্য্য নিশ্চয় বিষয়ে একই মত থাকা বিবেচনা হয়। পরন্তু দর্শন শাস্ত্র সকল যদিও যুক্তিমূলক বটে; কিন্তু তাহা মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। এজন্য তাহাদিগের ব্যবহারিক মত পরস্পরের মতের সহিত অনৈক্য বিবেচনা করিলেও তাঁহার কোন্ মত উৎকৃষ্ট ও কোন্ মত অনুৎকৃষ্ট তাহা আমাদিগের বলিবার সাধ্য নাই। কেন না আমরা অতি ক্ষুদ্র মনুষ্য বিধায়, ঐ সকল মতের ভাল মন্দ বিচার করা উন্মত্তের কার্য্যের ন্যায় হইয়া পড়ে। এজন্য ঐ সকল মতকে শিরোধারণ পূর্ব্বক, তাহার সার ভাগের ঐক্য করিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে আমাদিগের কোন প্রগল্‌ভতা দোষের সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহার পরের অধ্যায় পর্য্যালোচনা করিলে, ঈশ্বরের স্বরূপ ও কার্য্য নির্ণয় বিষয়ে কোন শাস্ত্রেরই অনৈক্য না থাকা সিদ্ধান্ত হইবেক।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নানা-শাস্ত্রীয়-যুক্তি-দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ, ও কার্য্য নির্ণয়।

ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রাদিতে যে সকল মীমাংসা করা হইয়াছে; তাহার সমুদায় সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিতে হইলে গ্রন্থ বাহুল্য হয় বলিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শ্লোক অথবা শ্লোকাভাস্ নিম্নে লেখা গেল। পঞ্চদশী ধৃত চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে। ঋক্ শাখাধ্যায়ীরা বলেন যে, এই পরমাত্মা ঈশ্বরই অগ্রে ছিলেন তিনি এই জগৎ

সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়া সৃষ্টি করেন।* তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলেন যে, নিত্য, জ্ঞান, ও অনন্ত, ঈশ্বর প্রজা সৃষ্টি করিয়া বহু শরীরে ব্যাপ্ত হইবেন এই সংকল্পরূপ তপস্যা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।† ছান্দোগ্যোপনিষদে বলেন যে, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অদ্বিতীয় এক মাত্র সৎ পদার্থ পরমেশ্বর ‡ ছিলেন। তিনি সৃষ্টি করেন। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতি ও স্মৃতি এবং পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল পরমেশ্বর ছিলেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্থিতি ও পালন করিতেছেন, এবং লয় করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন। তিনি শক্তিমান্ চৈতন্য, অদ্বিতীয়, ও অনন্ত; এবং অনাদি, তাঁহার আদ্যন্ত নাই। তিনি এই জগতের আদি ও অন্ত; তিনি নিত্য, জ্ঞান, ও আনন্দময়; নির্গুণ, নিরাকার সগুণ, এবং সাকার § ও সর্ব্বব্যাপী, পরমাত্মা, ও কর্ত্তা এবং মহেশ্বর।

তিনি নির্ব্বিকার, অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, আদি ছয় প্রকার বিকার বর্জ্জিত, নিরঞ্জন, নিষ্ক্রিয়, অছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বরূপ, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মে অভিন্ন ভাবে শক্তি থাকাতে, তিনি সগুণ হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তাহা তাঁহার‖ স্বরূপ লক্ষণা, ও তটস্থ লক্ষণা দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। স্বরূপ, নির্গুণ চৈতন্য, এবং তটস্থ, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন; কিন্তু নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণ রহিত যে, চৈতন্য তাঁহাতে শক্তি না থাকিলে, তিনি কোন ক্রমেই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন না। অতএব যুক্তি

* আত্মা বা ইদমেক মেবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঈক্ষত লোকাননুসৃজা স ইমান্ লোকান্ সৃজতে।

† নিত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়। তপসোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্ব মসৃজত।

‡ সদেব সৌম্যেদ মগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং।

§ সাকার অর্থাৎ আকারের সহিত বর্ত্তমান নিরাকারকে সাকার বলা যায়।

‖ বেদান্ত দর্শনে এবং এই গ্রন্থের ১ম ভাগের দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে।

অনুসারে "পরমেশ্বরে নিশ্চয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি থাকা সিদ্ধান্ত কর যাইতে পারে; ভগবতী-গীতায় ভগবতী গিরিরাজকে বলিয়াছেন যে, শিব অর্থাৎ চৈতন্য প্রধান পুরুষ, ও শক্তি পরমা প্রকৃতি এই দুই পদার্থ অভিন্ন-ব্রহ্ম, তত্ত্বদর্শী যোগিরা ইহাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে শক্ত্যাত্মক্ চৈতন্য বলিয়া থাকেন*।

বিষ্ণুপুরাণের ১ম অংশ ৩য় অধ্যায়, মৈত্রেয় ঋষি, পরাশর ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন, যে, নিগুর্ণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ, নির্ম্মলাত্মা পরমেশ্বর কি রূপে সৃষ্ট্যাদি করেন?†

তাহাতে পরাশর বলেন যে, পরমেশ্বরে যে অভিন্ন শক্তি আছে তাহা অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, অচিন্ত্য, ও বুদ্ধির অগোচর। অতএব সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ঐ নিজশক্তি ক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করেন‡। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র এবং যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল দ্বারা মামাংসিত হইয়াছে যে, অচিন্ত্য শক্তিমচ্চৈতন্যই পরমেশ্বর। তিনিই অদ্বিতীয় ও অনন্ত ইত্যাদি রূপে ব্যক্তাব্যক্ত ভাবে আছেন। যদি বলা যায় যে, পরমেশ্বরে শক্তি থাকা স্বীকার করিলে ব্রহ্ম দ্বৈত হয়েন। ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কেন না ঐ দর্শনের মতে ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় কোন বস্তুই নাই; এবং শক্তি ও স্বতন্ত্র পদার্থ বটে ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্মে যে অভিন্ন শক্তি আছেন, ঐ শক্তি থাকাতেও বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মকে দ্বৈত আশঙ্কা করেন নাই; বরং শক্তি ও শক্তিমান পদার্থ অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন§।

---

* শিবঃ প্রধান পুরুষঃ শক্তিস্তু পরমা শিবা। শিব শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিন স্তত্ত্ব দর্শিনঃ বদন্তীমাং মহারাজ অতএব পরাৎপরঃ। ইতি ভগবতী গীতায়াং।

† নিগুর্ণস্যা প্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যোমলাত্মনঃ। কথং স্বর্গাদি কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে। বিষ্ণুপুরাণং।

‡ শক্তয়ঃ সর্ব্বভূতানামচিন্ত্য জ্ঞানগোচরাঃ যতোঽতো ব্রাহ্মণস্তাস্তং সর্গাদ্যাভাব শক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা। বিষ্ণুপুরাণম্। এই বিষয় কাশীখণ্ডের ২৬ অধ্যায় দেখ।

§ শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ। ইতি পঞ্চদশী ধৃতম্।

যদি ঐ দর্শনে ঐ রূপ সিদ্ধান্ত না করিতেন, তবে তাহাতে আরও দোষ বর্ত্তিত; কেন না শুদ্ধ চৈতন্য পরমেশ্বর নির্গুণ, তাহাতে শক্তি না থাকিলে সৃষ্টি হইবার সম্ভব ছিল না। যদি বলা যায় যে, অবিদ্যা মায়া দ্বারা সৃষ্টি আদি কার্য্য হইতে পারে? ইহা ঐ দর্শনের মত বটে, কিন্তু ঐ দর্শনে বলেন, অবিদ্যা মিথ্যা, ও তাহার কার্য্য রূপ জগৎও মিথ্যা; কিন্তু ব্যবহারে তাহা সঙ্গত নহে; কারণ মিথ্যা পদার্থ দ্বারা জীবের বন্ধন ও ক্রিয়া প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জগৎ পরিদৃশ্যমান হওয়া সম্ভব নহে। এবং ঐ পদার্থ কি রূপে স্থিতি ও কাহা দ্বারা উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা নির্ণয় হয় না। বিশেষতঃ আত্মা যদি শক্তি বিহীন হয়েন, তবে তাহা হইতে সত্য ও মিথ্যা, কোন পদার্থই উদ্ভূত হইতে পারে না। যদি বল যে, ঐ অবিদ্যা নিত্য পদার্থ? তাহা বলিতে পার না। কেন না তাহা পরমেশ্বরের বিজাতীয় পদার্থ বিধায়, তাহাকে নিত্য বলিলে, অদ্বৈত মীমাংসা খণ্ডন হয়। তবে অবিদ্যা ব্রহ্মশক্তি হইতে উদ্ভূত পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। অতএব চৈতন্য পদার্থে শক্তি আছেন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং চৈতন্য পদার্থে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি অদ্বিতীয়; যেমন অগ্নিতে দাহিকা শক্তি অভিন্ন ভাবে আছে, ও যেমন বাক্য এবং অর্থ অভিন্ন, তদ্রূপ পরব্রহ্মে শক্তি অভিন্ন ভাবে। আছেন। তাঁহাকে কখন প্রভেদ করা যায় না, ও ঐ অচিন্ত্য শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে শক্তি কার্য্যানুমেয় মাত্র। যেমন মণির উজ্জ্বল জ্যোতি রাত্রি কালে প্রকাশ হয়, ঐ জ্যোতিঃ, পদার্থ মণির সহিত অভিন্ন বটে, এবং দিবসে তাহাকে মণি বলিয়া বোধ হয় না, অন্ধকারে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে মণি বলিয়া জানা যায়; তদ্রূপ পরব্রহ্মে যে শক্তি আছেন, তাহা সৃষ্টি কার্য্য দ্বারা অনুভব হয়, এবং ঐ স্বীয় শক্তি দ্বারা পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকাশ হয়েন, এবং সৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। নতুবা প্রলয় কালে কোন পদার্থ না থাকায় তাহার অনুভব হইতে পারে না। অতএব চৈতন্য পদার্থে শক্তি থাকায়, ঐ শক্তিকে পৃথক করিতে না পারায়, অভিন্ন শক্তিমান্ চৈতন্যই ব্রহ্ম। ফলিতার্থে পরমেশ্বরকে চৈতন্য বলিয়া উল্লেখ করিলে শক্তিমচ্চৈতন্য বুঝাইবেক। এবং তাঁহাকে শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে চৈতন্যবতী শক্তি বুঝাইবে। ঐ শক্তিকে শাস্ত্রকারেরা

শক্তি, ও মূলাপ্রকৃতি, পরমাপ্রকৃতি,' ও পরাৎপরা প্রকৃতি, এবং মহামায়া, অজা বলিয়াছেন। ইনি গুণময়ী মায়া নহেন। ঐ ব্রহ্ম শক্তি হইতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে * সত্ব, রজ, তম, গুণ মূলা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়। অতএব ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার আবির্ভাব ও তিরোভাব, ব্রহ্মশক্তি হইতে হওয়াই' অনুমান হইতেছে। এই ত্রিগুণাত্মিকার আবির্ভাব তিরোভাবের কারণ এই যে, ঈশ্বরের দুইটি অবস্থা থাকা শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন; অর্থাৎ পরমেশ্বর অব্যক্ত ও ব্যক্ত। তিনি, সৃষ্টি স্থিতি কালে ব্যক্ত, ও মহাপ্রলয় সময়ে অব্যক্ত। ভগবান মনুর ১ম অধ্যায় ৫।৬।৭ শ্লোকে আছে যে, মহাপ্রলয় সময়ে এই জগতের সমস্ত বস্তু প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত, ও ঐ প্রকৃতি ব্রহ্মে লীন হইয়াছিলেন, যে তৎকালে প্রত্যক্ষ, ও অনুমান, এবং শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় সকল, অভাব হেতু পরমেশ্বর অব্যক্ত ছিলেন; পরে সৃষ্টি প্রকাশ করতঃ স্বয়ং প্রকাশ হইলেন। যদি বল যে, পরমেশ্বর স্বপ্রকাশের স্বরূপ, তাঁহার প্রকাশ, অপ্রকাশ, অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ত স্বীকার করা সঙ্গত নহে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বরের ব্যাক্তাব্যক্ত প্রদীপের ন্যায় জ্বলন্ত ও নির্ব্বাণ অবস্থা নহে। তিনি জ্ঞান, ও আনন্দময়, নিত্য পদার্থ; তবে অগ্নি ও দীপের সহিত কখন কখন উপমা দেওয়া হয় বটে; সে কেবল লোককে বুঝাইবার জন্য, নতুবা তাঁহার দৃষ্টান্ত, অন্য কোন বস্তুতে নাই কেবল তাঁহাতেই আছে। তাঁহার প্রকাশ ও অপ্রকাশ তুল্য; তবে সৃষ্টিকালে ব্যক্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক মনুষ্যেরা তপস্যা করিয়া নির্ম্মল মনদ্বারা তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন; সুতরাং ব্যক্ত। প্রলয় কালে মনুষ্যাদি কোন পদার্থ না থাকায়, জানিবার অসম্ভব হেতু অব্যক্ত বলা যায়। আর যদ্যপি তিনি, সৃষ্টিকালে ব্যক্ত হয়েন, তাহাতে তাঁহার স্বরূপের রূপান্তর হয় না। যখন তিনি, নিজ শক্তি দ্বারা, সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকৃতি, তাঁহা হইতে প্রকাশিতা হয়েন; এবং তিনি ঐ প্রকৃতিতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন। তদনন্তর যখন প্রলয় করিতে

---

* সত্বং রজ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভা।

প্রবৃত্ত হয়েন, তখন স্ব শক্তি-ক্রমে সমুদায় পদার্থ প্রকৃতিতে লয় করিয়া ঐ প্রকৃতিকে আত্মশক্তিতে লয় করেন। এইরূপ, চিরকাল সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতে থাকেন; ইহা তাঁহার নিত্য সিদ্ধ কার্য্য, তাহার বিরাম নাই। তাহা অনবরতই হইতেছে ও হইবেক। এক্ষণে কি প্রকারে পরমেশ্বরের শক্তি হইতে প্রকৃতি পুরুষ প্রকাশ হইয়া তাহাতে লয় হয়েন, ঐ কারণ স্বরূপাশক্তি ও তাহার কার্য্য নির্ণয় করা যাইতেছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

সৃষ্টি আদির কারণ স্বরূপাশক্তি নির্ণয়।

পরমেশ্বর সকল কারণের কারণ ও নিত্য, নির্ব্বিকার, বিশুদ্ধ, পরমাত্মা, চৈতন্য নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাতে অনন্ত প্রকার শক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, কালশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, বস্তুর উৎপাদিকাশক্তি, প্রভৃতি নানা প্রকার বিচিত্র শক্তি সকল অভিন্ন ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। এই শক্তি, অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা তাঁহাকে জানা যাইতে পারে না; এবং অনির্ব্বচনীয়া অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা সৎ কি অসৎ নির্ণয় করা যায় না। শক্তি পদার্থ এক বটে, কিন্তু তাহার অনন্ত কার্য্য দর্শনে অনন্ত প্রকার বোধ হয়। যেমন একজন মনুষ্যকে অনন্ত কার্য্য সাধন করিতে দেখা যায়; কিন্তু তাহার শক্তি নিরূপণ করা যাইতে পারে না; কেবল তাহার কার্য্য দর্শন করিলে শক্তির অনুভব হয়। ফলতঃ ঐ ব্যক্তির কোন স্থানে কি শক্তি আছে তাহা নির্ণয় করিতে না পারায় তাহার নানা শক্তি কল্পনা করিয়া থাকে। ফলিতার্থে ব্যক্তি ও তাহার শক্তি পদার্থ একই বটে; তবে পরমেশ্বরকে যে অনন্ত বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, যাঁহার অন্ত নাই অর্থাৎ দেশ, অথবা কালদ্বারা যাঁহার শেষ কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে অনন্ত বলা যায়। যদিও তিনি সৃষ্টি কার্য্যে অনন্তরূপধারী হইয়াছেন, তথাপি বস্তু এক, অর্থাৎ নিত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ; যেরূপ একজন ব্যক্তিকে সম্বন্ধানু-

সারে কেহ পিতা, কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ বন্ধু বলিয়া থাকে ও কেহ গুরু, কেহ শিষ্য, ও কেহ স্বামী, কেহ রাজা, কেহ প্রজা বলিয়া বিশ্বাস করে; এবং তিনি নানা সময়ে নানা প্রকার পরিচ্ছদের দ্বারা নানা প্রকার মূর্ত্তি ও উপাধি ধারণ করেন; তাহাতেও তিনি ব্যক্তি একই ভিন্ন দুই হয়েন না। তদ্রূপ এক শক্তিমান্ চৈতন্য পদার্থ এক হইয়াও আত্ম শক্তিতে অনন্ত প্রকার নাম ও উপাধি দ্বারা অনন্ত প্রকার কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাকে অনন্ত বলা যায়। বস্তুতঃ তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ;' তাহা জ্ঞা ধাতু হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ জানাতি এই অর্থে জ্ঞ, পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে সকলে জানেন যিনি, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। সকল জানেন অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ। এই সর্ব্বজ্ঞ শক্তি ব্যতীত হইতে পারে না; কেননা চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান, কেবল জানা মাত্র। কিন্তু সৃষ্টি কি? স্থিতি কি? প্রলয় কি? এবং তাহা কোন্ সময়ে কি প্রকারে হইবেক? ও হইতে পারে? তাহা শক্তি ব্যতীত আর কিছুতেই জানা যায় না। অতএব তিনি জ্ঞান শক্তি দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন। এবং তিনি ঐ জ্ঞান শক্তি দ্বারা সৃষ্টিকালকে লক্ষ্য করিয়া কালশক্তি ক্রমে সৃষ্টি কাল নির্ণয় করেন। অর্থাৎ প্রলয় কাল অবসান হইয়াছে, এক্ষণে সৃষ্টি করিতে হইবেক, ইহা জ্ঞান ও কালশক্তি দ্বারা নির্ণয় করিয়া ইচ্ছাশক্তি যাহাকে যোগবাশিষ্ঠ মননী শক্তি বলিয়াছেন। ঐ ইচ্ছাশক্তি ক্রমে সৃষ্টি বিষয়িণী ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বেদান্তে বলেন, "আমি প্রজা রূপে বহু হইব" এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্প মাত্রেই ক্রিয়া শক্তি ক্রমে, অতিশয় সূক্ষ্ম-রূপা সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্তা হইলেন। তাহাতে পৃথক্ ভাব প্রতীয়মান হয়, যেরূপ জল হইতে, জলবিম্ব উদিত হইয়া, পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ ভাব হইয়াছিল। ঐ ত্রিগুণাত্মিকাকে সাঙ্খ্য দর্শনে, প্রকৃতি বলেন; বেদান্ত দর্শনে মায়া বলেন; এবং তৎকালের শক্তিমচ্চৈতন্যকে সাঙ্খ্য দর্শনে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন যে, মায়া প্রকাশ হইয়া তাহা দর্পণ স্বরূপ, চৈতন্য পদার্থকে আবৃত করায় চৈতন্যের আভাস প্রকাশ হইতে থাকে। ঐ আভাসকে পুরুষ বলা যায়; বাস্তবিক ঐ পুরুষ ত্রিগুণা প্রকৃতির সহিত যোগ

হওয়াতে, ঐ পুরুষ সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর নামে খ্যাত হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। সঙ্খ্যা দর্শনকার বলেন যে, এই প্রকৃতি পুরুষের যোগ হইয়া, প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য্য করিতে থাকে; এতদ্বিষয়ের বাদানুবাদ, পূর্ব্বে মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ প্রকৃতি পুরুষ যোগ হইলে, ইহাকে সকল শাস্ত্রেই সগুণ ঈশ্বর যে, বলিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বরের অবস্থা ভেদ মাত্র; তদ্বিষয় নির্ণয় করা যাইতেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সগুণ ব্রহ্ম নির্ণয়।

পরমেশ্বরের অবস্থা দুইটি আছে, অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ *। এই দুই অবস্থা বেদ বেদান্ত ও পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত বটে। তন্ত্র শাস্ত্রে বলেন যে, যেপ্রকার ঘৃত একই বস্তু, তাহার কাঠিন্য ও দ্রব দুই প্রকার অবস্থা হয়, কিন্তু কাঠিন্যই হউক, বা দ্রবই হউক তাতা ঘৃত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্ম। ত্রিগুণার সহিত চৈতন্যের যোগকে সগুণ ব্রহ্ম বলা যায়। যখন ব্রহ্মশক্তি হইতে ত্রিগুণার আবির্ভাব হয়, তখন ঐ প্রকৃতি হইতে তাহার বুদ্ধি স্বরূপ মহত্তত্ত্ব, এবং তাহা হইতে মনঃ স্বরূপ অহঙ্কারতত্ত্ব উদিত হয়; তৎপরে চৈতন্যের সহিত যোগ বস্তুর উৎপাদিকা শক্তি হইতে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ-তন্মাত্রার উৎপত্তি হইয়া, সগুণ ঈশ্বরের শরীর রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। যদ্যপি ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সহিত চৈতন্যের যোগ হয় বলা হইয়াছে; কিন্তু ঐ যোগ মিশ্রযোগ নহে; অর্থাৎ ত্রিগুণার সহিত অভিন্নভাব হয় না। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ যে চৈতন্য পদার্থ, তাহার ধ্বংস হয় না; অথচ যোগ হয়; যেমন আকাশে বায়ু মিলিত, অথচ পৃথক ভাবে থাকে; তদ্রূপ প্রকৃতি মিলিত অথচ পৃথক্ ভাবে থাকে। কিন্তু কার্য্যতঃ পৃথক্ করা যায় না।

* সগুণ ব্যক্ত, নির্গুণ অব্যক্ত।

যদিচ যন্ত্র দ্বারা বায়ুকে আবদ্ধ করিয়া পৃথক্ ভাবে লক্ষ্য করা যায় বটে; কিন্তু ঐ যন্ত্র স্থিত বায়ুর মধ্যে যে আকাশ থাকে, তাহাকে পৃথক করা যায় না; যেমন মন আত্মাতে লয় ব্যতীত পৃথক করা যায় না; তদ্রূপ ত্রিগুণা মায়া চৈতন্যে লয় প্রাপ্তা হওয়া ব্যতীত অন্য কোন রকমে পৃথক্ করা যায় না; কিন্তু বস্তু পৃথক্ বটে। তবে স্থূল সূক্ষ্ম দেহের সহিত আত্মা পৃথক্ ভাবে থাকা সিদ্ধান্ত হয় বটে; কিন্তু কারণ শরীরের অভ্যন্তরে যে, আত্মা আছেন, তাহাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ভাবে লক্ষিত করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সকল বিষয় সাধনার কার্য্য, ইহা লিখিয়া নির্ণয় করা অসাধ্য। এই প্রকৃতি পুরুষের যোগে পরমাত্মার যে অবস্থা হয়, তাহাকে নানা শাস্ত্রে নানা নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। ইহাকে বেদ বেদান্তে সগুণ ঈশ্বর, তন্ত্র শাস্ত্রে মহাকালী, সাঙ্খ্য দর্শনে প্রকৃতি পুরুষ, কালীপুরাণে কালী, মহা-ভাগবতে দুর্গা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কৃষ্ণ, বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণু, মনুতে স্বয়ম্ভু ভগবান্, এই রূপ নানাপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি গায়ত্রী প্রতিপাদ্য ভর্গ, এবং নিরাকার ও সাকার দুই বটেন; কেন না তাঁহার বাস্তবিক আকার না থাকায় নিরাকার, এবং আত্ম মায়া ক্রমে যখন হস্ত পদাদি রূপ বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করেন; এবং যখন বস্তু রূপে, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে জগৎ রূপে প্রকাশ হয়েন, তখন সাকার বলা যায়। কিন্তু সাকার তাহার স্বরূপ নহে। তিনি আকার বিশিষ্ট হয়েন বলিয়া তাঁহাকে সাকার বলা যায়। যেমন মনুষ্য দেহ বিশিষ্ট আত্মাকে দেহী, অথবা সাকার বলা হয়, তদ্রূপ আকারের সহিত বর্ত্তমান নিরাকার আত্মাকেই সাকার বলে। ইনি স্বয়ং প্রকাশ হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু সকল উৎপত্তি ও ধ্বংস করত, প্রকৃতিকে আত্ম শরীরে লয় করিয়া নির্গুণব্রহ্ম রূপে* অবস্থান করত পুনরায় জ্ঞান ও কাল শক্তি ক্রমে, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এবং বস্তুর উৎপাদিকা শক্তি দ্বারা, পুনরায় সগুণ রূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে থাকেন। ইহা তাঁহার নিত্য সিদ্ধ কার্য্য, এই কার্য্যের বিরাম নাই। যদি বলা যায় যে, পরমেশ্বরে যে সকল শক্তি আছে, তাহা এক সময়ে প্রকাশ হয়? তবে পর্য্যায় ক্রমে

* ব্যক্ত শক্তি-যুক্ত ও অব্যক্ত শক্তি যুক্ত উভয় নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্যক্ত শক্তি, ত্রিগুণের সম্যোবস্থা, এবং কারণ স্বরূপা, তাহা হইতে ত্রিগুণা প্রকাশ হয়।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য কি প্রকারে ঘটনা হইতে পারে? কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কেননা সৃষ্টি ও প্রলয় ইচ্ছা এক কালে হইতে পারে না। দেখুন একটি ইচ্ছা প্রকাশ হওয়ার পরে আর একটি ইচ্ছা হইতে পারে। কারণ সৃষ্টি ইচ্ছা হইয়া তাহা না হইলে কি বস্তু লয় হইবেক? তাহা কল্পনা করা উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত জ্ঞানের কার্য্য নহে। এজন্য সৃষ্টি বিষয়িণী ইচ্ছা হইয়া, সৃষ্টি কার্য্য সমাধানান্তে পশ্চাৎ কালশক্তি বশতঃ লয় করিতে ইচ্ছা জন্মে। ইহা সঙ্গীত ও কার্য্য কারণ দর্শনে, অনুভব হয়। যদি তাহাতেও বাদানুবাদ করা যায় যে, এক কালে সৃষ্টি ও প্রলয় শক্তি প্রকাশ হওয়া অনুমান করা যাউক? তাহাতে বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বর অনন্ত, তাঁহার অন্ত নাই। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের একটি সীমা থাকা, শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা জানাইতেছে। যেমন এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড, তাঁহার একাংশে বর্ত্তমান আছে।* তদ্রূপ অন্যাংশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার নাম শাস্ত্রে অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর বলিয়াছেন। ফলতঃ অনন্ত বস্তুর একাংশে একটি ও অন্যাংশে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড থাকিলেও, যুক্তি অনুসারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ হয় না। অতএব পরমেশ্বরে যে শক্তি আছে, তাহা যদি এককালে প্রকাশ হওয়ার তর্ক করা যায়, তাহাও এইরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, এক দিকে একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইার সময়, অন্য দিকে আর একটি ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হইতেছে; এরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইবার প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। বরং পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মহিমা দ্বারা সকল প্রকার কার্য্য ঘটনা হইতে পারে। তাঁহার কার্য্যের অন্ত কেহ জানিতে পারে না। যদি বল যে, পরমেশ্বরের অন্ত যদি না জানা যায়, তবে তাঁহার তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য? কিন্তু ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, উপাসনা ও ভক্তি এবং শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা, পরমেশ্বরকে জানা যাইতে পারে; ইহা কদাচ মিথ্যা নহে; ও এরূপ মিথ্যা কথা বলারও কোন কারণ তাঁহাদিগের ছিল না ও নাই। অতএব উপাসনা, ভক্তি, ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য। তবে অনন্ত পরমেশ্বরের

* একাংশেন স্থিতো জগৎ। ভগবদ্গীতার ১০ অধ্যায়।

সমুদায় অন্ত জানা যায় না বটে, তাহার একদেশ জানিলেই, সমুদায় জানা হয়। যেমন জলময় বৃহৎ পদার্থকে সমুদ্র বলে, ঐ সমুদ্রের এক দেশ দর্শন ব্যতীত সমুদায় ভাগ কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তাহার এক দেশ দর্শন হইলেই সমুদ্র দর্শন করা হইল তাহার সন্দেহ নাই। তদ্রূপ পরমেশ্বরের এক দেশ নিশ্চয় হইলেই, সমুদায় নিশ্চয় হইতে পারে। এবং তাহাতে মুক্তি হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়, মুক্তি প্রকরণে, মীমাংসা করা যাইবেক; এক্ষণে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকৃতির স্বরূপ কি? তাহা সিদ্ধান্ত করা হইতেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়।

মায়া প্রকৃতির স্বরূপ জানা যাইতে পারে না, কারণ কোন শাস্ত্রে তাহা দেখিতে পাই নাই, তবে এই পর্য্যন্ত মীমাংসা আছে যে, ঐ প্রকৃতি কার্য্যানুমেয়া, অর্থাৎ কার্য্য দর্শনে, প্রকৃতির অনুমান হয় মাত্র। ও শাস্ত্রকারেরা আরও বলিয়াছেন যে, অঘটন ঘটনা পটীয়সী মায়া; অর্থাৎ যাহা নহে তাহাই করিতে পারেন, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকৃতি। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহারা অপরা প্রকৃতি। এবং জীব পরা প্রকৃতি। ঐ গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব * এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ সমষ্টিকে শরীর অর্থাৎ ক্ষেত্র বলা যায়। এই শরীরকে যিনি জানেন, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বলে; ও প্রকৃতি হইতে গুণ এবং বিকার সকল উৎপন্ন হইয়া ঐ দেহ হইয়াছে; এই প্রকৃতি, এবং পুরুষ জীব, উভয় অনাদি, ও উভয়ই প্রকৃতি। তাহাতে শঙ্করাচার্য্য মীমাংসা করেন যে, এই উভয় ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, এই উভয়কে শক্তি

* ১১ অধ্যায়ে আছে।

ও প্রকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং এই উভয় অনাদি বটে; কিন্তু প্রবাহ-রূপে অনাদি। কারণ দিবা অন্তে রাত্রি, ও রাত্রি অন্তে দিবার ন্যায়; সৃষ্টি অন্তে প্রলয়, ও প্রলয়ান্তে সৃষ্টি, চিরকাল হইতে থাকায়; জগৎ প্রবাহের আদি নাই, তাহা অনাদি। এবং তাহার মূল কারণ প্রকৃতি পুরুষ, সৃষ্টি কালে প্রকাশ, ও প্রলয় কালে লয় হওয়াতে, সুতরাং তাহারও প্রবাহরূপে অনাদি। এবং প্রকৃতি পুরুষ উভয়কে প্রকৃতি বলার কারণ এই যে, ইহা পরমেশ্বরের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অতএব প্রকৃতিব স্বরূপ ইহাকেই বলা যায়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সৎ ও অসৎ, দুই বটেন; কারণ প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে, নতুবা জগৎ কার্য্য কি প্রকারে হয়? এজন্য তাহাকে সৎ বলা যায়; আর তিনি জড়াংশ কোন স্থূলবস্তু না হওয়ায় তাঁহাকে অসৎ বলে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, সদসত্ত্যা মনির্ব্বচনীয়া মায়া, অর্থাৎ মায়া সৎ বা অসৎ অনির্ব্বচনীয়া। ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, সৎ, ও অসৎ উভয় বলিয়া নির্ণয় হয়। ঐ বিষয় পঞ্চদর্শী গ্রন্থকর্ত্তা মীমাংসা করেন যে, মায়ার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় বটে, কিন্তু তাহা জ্ঞান দৃষ্টিতে অসৎ; এবং সৃষ্টি আদি কার্য্যে সৎ। ইহাতে বিরোধ এই যে, যদি মায়া অসৎ হয়েন, তবে জগৎ কার্য্য মিথ্যা হইতে পারে; এবং তিনি সৎ হইলে, জগৎকার্য্য সত্য হইতে পারে; কেন না উপাদান কারণ সত্য হইলে, কার্য্য সত্য হয়; ও তাহা মিথ্যা হইলে কার্য্য মিথ্যা হয়; তাহাতে এক বস্তু মিথ্যা এবং সত্য এই উভয় প্রকার কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? তাহার মীমাংসা এই যে, মায়ার কার্য্য এই জগৎ অজ্ঞান দৃষ্টিতে সত্য, ও জ্ঞান দৃষ্টিতে মিথ্যা, কারণ ঐন্দ্রজালিক * কার্য্য যেমন প্রত্যক্ষ দেখা যায়, এবং যিনি ঐন্দ্রজালিক কার্য্য না জানেন তিনি সত্যই বলিয়া বিশ্বাস করেন; আর যিনি জানেন যে, ঐন্দ্রজালিক কার্য্য মিথ্যা; তাঁহার নিকট ঐ সকল কার্য্য মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়; তদ্রূপ এই মায়াময় জগৎকে ব্যবহার জন্য অজ্ঞানিরা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করেন। এবং তত্বজ্ঞানী মহাত্মারা ইহা মিথ্যা বলিয়া জানেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত

* ভোজবাজী।

হয় যে, যেরূপ ঐন্দ্রজালিক কার্য্যে, বস্তুরূপ উপাদান ব্যতীত কুহক দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া বস্তুরূপে প্রতীতি হয়, তদ্রূপ জগতের উপাদান কারণ মায়া কোন বস্তুর সূক্ষ্মাংশ না হইয়াও জগৎ রচনা করেন। যদিও সাঙ্খ্য দর্শনকার বলেন যে, এক এক দ্রব্য হইতে, যে যে দ্রব্যান্তর হয়, তাহাকে পরিণাম বলে। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি ও ঘৃত, এবং সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল, বলয়, ও হার প্রভৃতি; এবং মৃত্তিকার পরিণাম ঘটাদি; তদ্রূপ সূক্ষ্মা জড়া প্রকৃতির, পরিণাম এই দৃশ্যমান জগৎ হইতেছে। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে বলেন যে, পরমেশ্বরের আত্মশক্তি হইতে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকাশিতা হইয়া, তাঁহার বিবর্ত্ত পরিণামরূপে এই জগৎ পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। মায়া মিথ্যা, কুহক স্বরূপা। অতএব তাহার পরিণাম মিথ্যা, কেবল ভ্রম প্রযুক্ত জগৎ পদার্থ সকল দেখা যায়। যেমন মৃগতৃষ্ণা দর্শনে জলের ভ্রম হয়, এবং শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, ও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তন্ন্যায় পরমেশ্বরে এই জগৎ ভ্রম হয়। ফলিতার্থে, জগৎ কিছুই নহে, তাহা ব্রহ্মময় কেবল মায়া দ্বারা, জগৎরূপে আরোপ হইয়াছে মাত্র। এই উভয় গ্রন্থের মীমাংসা এই যে, সাঙ্খ্য দর্শনে যে পরিণাম বলিয়াছেন, ঐ পরিণাম দুগ্ধ হইতে দধির ন্যায় না হইয়া সুবর্ণ কুণ্ডলাদি ও মৃত্তিকার ঘটাদির ন্যায়, নির্ণয় করিলে বেদান্তের সহিত ঐক্য হইতে পারে। কারণ প্রকৃতি পুরুষের এক যোগ ব্যতীত কখন পরিণাম ঘটনা হয় না; তাহাতে যদি সুবর্ণ কুণ্ডলের ন্যায় পরিণাম স্বীকার করা যায়, তবে ব্রহ্ম বস্তুর কোন হানি দেখা যায় না। কেননা যেমন সুবর্ণের কুণ্ডল, সুবর্ণ ব্যতীত নহে, তদ্রূপ এই জগৎ শক্তিমান চৈতন্য ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তু হইতে পারে না*। সুতরাং জগৎ সংসার, সুবর্ণ কুণ্ডলের ন্যায়, শক্তিমান চৈতন্যের পরিণাম স্বীকার করিলে, অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হয় না। অতএব উভয় মতেই একরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে। তবে যদি দুগ্ধের পরিণাম দধি ঘৃতের ন্যায় স্বীকার কর, তাহাতে দোষ হয় বটে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেবল দৃশ্যতে ঐরূপ; কেননা কার্য্য কারণরূপে এই জগৎ সৃজন হইয়া, আবার কার্য্য কারণরূপে

* চতুর্থ ভাগের ২য় অধ্যায়ে সমানাধিকরণের মীমাংসা দৃষ্ট কর।

লয় প্রাপ্ত হয়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। ঐ কার্য্য কারণ সমালোচনা করিলে, ঐ রূপ পরিণাম স্থির হইতে পারে না ; কারণ শক্তিমচ্চৈতন্য হইতে প্রকৃতি, তাহা হইতে মহৎ, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্রা, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, তাহা হইতে তেজ, তাহা হইতে জল, ও জল হইতে মৃত্তিকা ; তদনন্তর বৈকারিক পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়। ইহার মূল কারণ শক্তিমচ্চৈতন্য, তাঁহা হইতে ত্রিগুণা প্রকৃতি মায়া, কার্য্য রূপে প্রকাশিতা হয়েন। পরে তিনি, কারণ স্বরূপা হইয়া মহত্তত্বকে কার্য্য রূপে প্রকাশ করেন, এবং ঐ মহৎ কারণ স্বরূপ হইয়া অহঙ্কারকে প্রকাশ করেন ; অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রাকে প্রকাশ করেন ; এইরূপ কার্য্য কারণ সম্বন্ধে জগৎ রচনা হয়। আবার প্রলয় কালে বৈকারিক পদার্থ সকল পৃথিবীতে, ও পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ তন্মাত্রাতে, ও তন্মাত্রা অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্বে, ও মহৎ প্রকৃতিতে, লয়প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতি পরমেশ্বরে লয় হয়েন। ইহাতে অনুমান হয় যে, যখন অন্যান্য পদার্থ লয় অন্তে, আকাশ তন্মাত্রায়, ও তন্মাত্রা অহঙ্কারে, লয় হয় ; তখন পরমাণু প্রভৃতি আর কিছুই থাকে না। অতএব ঈশ্বরের মায়া, কোন দৃশ্য বস্তুর সূক্ষ্মাবস্থা নহে ; কেবল ভাব পদার্থ মাত্র। তাহার পরিণামে কোন বস্তু স্থূলরূপে প্রকাশ হইতে পারে না। অথচ ঐন্দ্রজালিক কার্য্যের ন্যায়, বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে*। ইহা অজ্ঞান দৃষ্টিতে সত্য ; এবং তত্ত্ব বিচারে মিথ্যা থাকাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। ঐ প্রকৃতির স্বরূপ এই পর্য্যন্ত নির্ণয় হইল। এক্ষণে দুর্গা, কালী, প্রভৃতিকে যে, আদ্যা শক্তি প্রকৃতি, এবং শিব, বিষ্ণু, প্রভৃতিকে যে, আদি পুরুষ বলা হইয়া থাকে ; তাহাতে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহার মীমাংসা করা যাউক।

* দুগ্ধের পরিমাণ দধি ঘৃতের ন্যায়, বাস্তবিক প্রকৃতির পরিমাণ ঐরূপ হইলে যে ঘৃত ও দধি পুনরায় দুগ্ধরূপে অবস্থিতি হয় না, তদ্রূপ জগতেরও প্রলয় হওয়ার সম্ভব নহে।

ঊনবিংশতি অধ্যায়।

সাকার প্রকৃতি পুরুষ নির্ণয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নির্গুণ পরমেশ্বর সগুণরূপে প্রকাশ হয়েন। ঐ সগুণ সাকার এবং নিরাকার। সাকার দুই প্রকার, যথা বস্তুরূপ, এবং মূর্ত্তিরূপ, বস্তুরূপ অর্থাৎ পঞ্চভূত রূপ। এবং তাহার বিকার বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, প্রভৃতি রূপ। আর মূর্ত্তিরূপ দুর্গা, কালী, শিব, বিষ্ণু, এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি। যাহা প্রতি কল্পে, মায়া দ্বারা, প্রথম একটি মূর্ত্তি ধারণ করেন, তদনন্তর ঐ মূর্ত্তি বিভাগ হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, ও সূর্য্য প্রভৃতি পুরুষ। এবং দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী প্রভৃতি প্রকৃতি রূপা; অর্থাৎ স্ত্রী রূপা হইয়া, ঐ পুরুষ প্রকৃতি, একযোগে সৃষ্টি কার্য্য সাধন করিতে থাকেন*। এই সকল প্রকৃতি পুরুষের মূর্ত্তি ও কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ থাকা, শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহাঁরা পৃথক্ বস্তু নহেন, কেননা সগুণ ঈশ্বর বস্তু এক, এবং তাহাকে কারণ শরীর বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। কারণ শরীর প্রকৃতি, মহত্তত্ব, ও অহঙ্কার, এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্রা, তাহাতে সগুণ ব্রহ্মের যে মূর্ত্তি, তাহা মায়িক, অর্থাৎ মায়া দ্বারা ঐরূপ মূর্ত্তি ধারণ করা হইয়াছে। বাস্তবিক ঐ সকল মূর্ত্তিকে, অমূর্ত্তি অর্থাৎ নিরাকারও বলা যাইতে পারে। কেননা শুক্র-শোণিত দ্বারা যে দেহ হয়, তাহাকে বৈকারিক স্থূল দেহ বলা যায়। নতুবা শুদ্ধ মায়া দ্বারা যে দেহ ধারণ হয়, তাহাকে দেহ না বলিলেও চলে। কেন না নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম, জীব মাত্রের শরীরে আছেন; সুতরাং সে নিরাকার বটে। অতএব তিনি সৃষ্টি কার্য্য সাধনের নিমিত্তে, উপাদান, এবং নিমিত্ত ও সহকারি কারণ হইয়াছেন। উপাদান পঞ্চভূতাদি; ও নিমিত্ত কারণ প্রকৃতি পুরুষ রূপধারি হইয়া, শক্তি সহকারে, দেব, মনুষ্য, পশু,

---

* "গণেশ জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রীচ সৃষ্টি বিধৌ প্রকৃতেঃ পঞ্চধা স্মৃতা।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে।

পক্ষী, ও কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি মূর্ত্তি সকল, প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ প্রকৃতি পুরুষ পরস্পর ভিন্ন বস্তু নহে। যেমন সুবর্ণ এক বস্তু, তাহার নানা প্রকার অলঙ্কারকে, হার, কেয়ুর, প্রভৃতি নানা উপাধি দেওয়া হইয়াছে; এবং ঐ অলঙ্কার সকল নানা স্থানে নানা প্রকার শোভার কার্য্য করিতেছে; তদ্রূপ এক সগুণ ঈশ্বর নানারূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি বিষয়ক, নানা কার্য্য সাধন করিতেছেন; ইহা ঈশ্বরের নিত্য লীলা কার্য্য মাত্র। তবে দুর্গা, কালী প্রভৃতিকে যে আদ্যাশক্তি বলা হইয়াছে; তাহা পৃথক্ শক্তি নহে, কেবল আদ্যা স্ত্রীরূপা বলিয়া, আদ্যা শক্তি বলা হইয়াছে; কারণ শক্তি শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গ বাচী বিধায়, স্ত্রীরূপাকে শক্তি বলা হইয়াছে। আর শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি, আদি পুরুষরূপধারি বিধায়, তাঁহারা আদি পুরুষ কথিত হইয়াছেন। তাঁহারা পৃথক্ চৈতন্য নহেন; উভয়ই শক্তিমচ্চৈতন্য, এবং সগুণ আত্মা স্বরূপ এক বস্তু। যদ্রূপ মনুষ্যাদির স্ত্রী, পুরুষের আত্মা একই বটে, কেবল মূর্ত্তি পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হয়; তদ্রূপ সগুণ ঈশ্বর আত্মার স্বরূপ, তাঁহার মূর্ত্তি পৃথক্ ভিন্ন, বস্তুর পার্থক্য হইতে পারে না। কেবল অজ্ঞানিরা সাকার ঈশ্বরের ভেদ জ্ঞান করে; নতুবা জ্ঞানিরা, কখনই ভেদ জ্ঞান করেন না। এবং উপরি উক্ত শাস্ত্র যুক্তি দ্বারায়ও ভেদ জ্ঞান হইতে পারে না। তবে সৃষ্টির এবং উপাসকদিগের, কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত, নিরাকার পরমেশ্বর সাকাররূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহাতে উপাসনার পথ নানা প্রকার হইলেও, উপাসকেরা সকলেই সেই এক পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন। এবং বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতির যে উপাসনা করা হইয়া থাকে, তাহাও সেই পরম করুণাময় পরমেশ্বরের উপাসনা। যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকল বস্তুতেই আছেন, তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে, যাহাতে উপাসনা করা যায়, তাহাতেই সিদ্ধি লাভ হয়। যদি বল যে, তবে মনুষ্যের উপাসনা মনুষ্যেরা কি জন্য না করে? তাহার কারণ সজাতীয় বস্তুর উপাসনা, করিতে সচরাচর লোকের প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া, তাহার নিয়ম নাই; কিন্তু গুরুর উপাসনা হইয়া থাকে। যদি বল যে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তাহার সম্ভব কি? তজ্জন্য তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

বিংতি অধ্যায়।

পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব নির্ণয়।

শক্তিমচ্চৈতন্য পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী*। তিনি চারি অবস্থায় জগদ্ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। (অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য, ও বিরাট চৈতন্য। ইহা বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে বলা হইয়াছে; তাহা উদাহরণ দ্বারা দেখান যাইতেছে)†। যথা, ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত, ও রঞ্জিত; এই চারি প্রকার অবস্থায়, একটি চিত্র পট নির্ম্মাণ হয়। অর্থাৎ বস্ত্র ধৌত করিলে, নির্ম্মল হয় তাহাকে ধৌত বলে। এবং ঐ ধৌতবস্ত্রে মণ্ড লেপন করার নাম ঘট্টিত। ও তাহাতে পুত্তলিকা আঁকাইলে, তাহাকে লাঞ্ছিত। ও রঙ্গ পূরণ অর্থাৎ নানা প্রকার রঙ্গ দিয়া চিত্র করিলে তাহাকে রঞ্জিত বলা যায়। তদ্রূপ তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য নির্গুণ ও অনাবৃত, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। এবং ঈশ্বর-চৈতন্য, মায়া সহযোগে কারণ শরীর বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। এই কারণ শরীরে ত্রিগুণা মায়ার সহিত চৈতন্যের যোগ হওয়ায়, ঐ পদার্থকে সগুণ ঈশ্বর চৈতন্য বলা যায়। তাঁহার বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব, ও মন, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং শরীর পঞ্চতন্মাত্রা। আর হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য, যিনি সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত, আভাস চৈতন্য। লিঙ্গশরীর যথা, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, ও প্রাণ পাঁচ, এবং মন, ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়ব; ও অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত বিশিষ্ট শরীরকে লিঙ্গশরীর বলা যায়। আর বিরাট্‌চৈতন্য, যিনি পঞ্চীকৃত স্থূল পঞ্চভূত শরীরে অধিষ্ঠিত আভাস চৈতন্য তাহাকে বিরাট বলা যায়। ইহার এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব নির্ণয় হইতেছে। যেমন পূর্ব্বোক্ত চিত্রপটের সর্ব্বত্র ধৌতবস্ত্র আছে, কোন স্থানে অভাব নাই; তদ্রূপ তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য জগতের সকল বস্তুতে আছেন। তাহার উপর ক্রমে প্রকৃতি প্রভৃতির আবরণ

* ভগবদ্গীতার ৯ ম অধ্যায়ের ১০ ম শ্লোকে শাঙ্কর ভাষ্যধৃতবেদ মন্ত্র।

† পঞ্চদশীতে এই উদাহরণ আছে।

হওয়াতে, এই কয়েক প্রকার অবস্থা হইয়াছে। তবে স্থূলবস্তু সকলের মধ্যে কোন কোন বস্তুতে প্রকাশ হয়, ও কোন বস্তুতে হয় না। যদ্রূপ চিত্রপটের স্থানে স্থানে, অধিক রঙ্গপূরণ হওয়াতে স্থানে স্থানে ধৌত ভাগ দেখা যায় না। তদ্রূপ অতিশয় স্থূল পদার্থে চৈতন্যের অংশ প্রকাশ হয় না। আর যেমন অঙ্গারের অগ্নি বায়ু ও বর্ত্তিকা * সহযোগে জ্বলিয়া উঠে, ঐ জ্বলন্ত সলিতাকে ক্রমে দুইটি কাঁচের পাত্র বেষ্টন করিলে, ন্যূনাধিক ক্রমে আলোক বাহির হইতে থাকে, তেমনি অঙ্গারের অগ্নির ন্যায়, নির্গুণ ব্রহ্ম, প্রকৃতির সহযোগে সগুণ হইলে, তাহার আভাস কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীরে লাগিতে থাকে। অর্থাৎ প্রথম আভাস জ্বলন্ত শিখাকে বলা যায়। ঐটি কারণ শরীর সহযোগে উজ্জ্বল হয়। দ্বিতীয় আভাস লিঙ্গশরীরে লাগে; তৃতীয় আভাস স্থূল শরীরে লাগে। তাহাতে স্থূল দেহের স্বচ্ছতা না থাকায়, ও তাহা অতিশয় জড় প্রযুক্ত, চৈতন্য ভাগ প্রকাশ পাওয়া যায় না। ঐ স্থূল শরীর অপেক্ষা লিঙ্গ শরীর অধিক স্বচ্ছ বিধায়, তাহাতে চৈতন্য ভাগ প্রকাশ হয়। তদপেক্ষা কারণ শরীর, বর্ত্তিকার ন্যায় হওয়ায়, তাহাতে জ্বলন্ত ভাগের ন্যায় অধিক চৈতন্যাংশ প্রকাশ হয়। এই যে চারি প্রকার অবস্থা বর্ণিত হইল, ইহা সমষ্টি অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন রূপে, প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হয়; ইহা ব্যষ্টি অর্থাৎ অংশরূপে নানা পদার্থ হওয়াতেও, বস্তু একই থাকে। কেননা এক বস্তুর বিভাগে নানা পদার্থ হইলেও, বস্তুগত ভেদ হয় না। কেবল কার্য্য ও শক্তিগত ভেদ হয় মাত্র। যদ্রূপ মৃত্তিকার সমষ্টির নাম পৃথিবী, তাহার ব্যষ্টি ঘট, কুম্ভ, শরাব, প্রভৃতি, কিন্তু বস্তু সকল মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন, অপরিচ্ছিন্ন আকাশের নাম মহা আকাশ, এবং ঘট স্থিত আকাশের নাম ঘটাকাশ, জল স্থিত আকাশের নাম জলাকাশ, মেঘ স্থিত আকাশের নাম মেঘাকাশ, তন্ন্যায় নির্গুণ চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী, মহাকাশের ন্যায় বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার ব্যষ্টি দেহ স্থিত আত্মার নাম কূটস্থ চৈতন্য। তদ্রূপ সগুণ ঈশ্বর, চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী সমষ্টি, তাহার ব্যষ্টি দেহ স্থিত জীব, যাহাকে অন্তরাত্মা বলা যায়। যেমন দীপ

* বর্ত্তিকা সলিতা।

হইতে দীপান্তর প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ, এবং ঐ রূপ, হিরণ্যগর্ভ রূপ আভাস, চৈতন্য সমষ্টি, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী, তাহার ব্যষ্টি দেহ স্থিত তৈজস সুখ দুঃখের ভোক্তা জীব নামে কথিত। এবং বিরাট রূপ আভাস চৈতন্য সমষ্টি, অর্থাৎ মূল পঞ্চভূত সমষ্টি; তাহার ব্যষ্টি দেবতা গন্ধর্ব্বাদি, ও মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, ও বৃক্ষ, গুল্ম, পর্ব্বত, লতা প্রভৃতি জগতের সমুদায় পদার্থের দেহ স্থিত, দ্বিতীয় আভাস রূপ চৈতন্যকে বিশ্ব বলা যায়। ইহার তাৎপর্য্য দেহ স্থিত চৈতন্যের বিষয় মীমাংসা করিলেই সমুদায় জগদ্ব্যাপী চৈতন্যের মীমাংসা হইতে পারে। কেননা একটি সাদৃশ্য পদার্থের দৃষ্টান্ত দ্বারা, অন্য সাদৃশ্য পদার্থের নির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন ঘট স্থিত আকাশ যে বস্তু, ও মহাকাশ সেই বস্তু, তদ্রূপ দেহ স্থিত চৈতন্য যে প্রকার ও সর্ব্বত্রব্যাপী, চৈতন্যও সেই প্রকার হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। তবে দেহ স্থিত চৈতন্য দুই প্রকার, তাহার এক প্রকার নির্গুণ কূটস্থ চৈতন্য, যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপী নিষ্ক্রিয়। ইঁহাকেই পরমাত্মা বলা যায়। আর এক প্রকার সগুণ চৈতন্যাংশ, ও তাহার আভাসকে জীব বলা যায়। তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বার্থ ও কার্য্য কি তাহা বিবেচনা করা যাউক্। দেহ স্থিত নির্গুণ চৈতন্যকে পরমাত্মা, এবং কূটস্থ চৈতন্য বলা হইয়াছে। ইনি নিষ্ক্রিয়, কোন কার্য্য করেন না। এবং সগুণ জীব, যিনি দীপ কলিকাকার দেহ স্থিত, কারণ শরীর ব্যাপ্ত তাঁহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়; ইনি অন্তরাত্মা, এবং জীবাত্মা নামে কথিত হয়েন; ইনিই দেহের কর্ত্তা; ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং কর্ম্ম ফল দাতা; ইঁহার আভাস যে সূক্ষ্ম শরীরে লাগে, তিনি কর্ম্মকর্ত্তা, ও সুখ দুঃখের ভোক্তা, তৈজস জীব নামে কথিত হয়েন *। এবং স্থূল শরীরে যে আভাস লাগে, তাহাকে বিশ্ব বলা যায়। ইনি স্থূল দেহ ধারণাদি করেন। এক্ষণে প্রাজ্ঞ চৈতন্য ও তাহার আভাস চৈতন্যকে যে জীব বলা হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। বাস্তবিক আত্মা এক পদার্থ, কেবল নানা প্রকৃতির সন্নিধানে, তাঁহার নানা প্রকার অবস্থা কল্পনা মাত্র। ফলিতার্থে আত্মার সন্নিধান বশতঃ দ্রব্য সকলের, স্বচ্ছতার তারতম্য থাকায়, নানা প্রকার কার্য্য করিতে

---

* ঐ দেহে ইন্দ্রিয় থাকাতে তিনি কর্ম্মকর্ত্তা ও ভোক্তা হয়েন।

থাকে বলিয়া, আভাস কল্পনা করা হইয়াছে। নতুবা জ্ঞান পদার্থের, বাস্তবিক কোন আভাস প্রদীপের আভার ন্যায়, বাহির হয় না। তবে বেদান্ত দর্শনে সগুণ ব্রহ্ম চৈতন্যকে আভাস বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিগুণা মায়ার সন্নিধান বশতঃ জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অল্পতা প্রকাশ হওয়ায়, ঐ রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক এ বিষয় এত কঠিন যে, সাধনা ব্যতীত পুস্তকে লিখিয়া, ইহার কোন ক্রমে মীমাংসা করা যায় না। তথাপি জীবের স্বরূপ মীমাংসা কালিন পুনরায় আরও বিস্তারিত রূপে এই বিষয় লেখা যাইবেক। বাস্তবিক শক্তিমচ্চৈতন্য পরমেশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা সাধকেরা অনায়াসে জানিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই। এই পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রথম ভাগ সমাপ্ত করা গেল। এই প্রথম ভাগ অধিকাংশ যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্র অনুসারে লেখা হইল। এক্ষণে অন্যান্য শাস্ত্র সকল বিস্তারিত রূপে আলোচনা করত, সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও আর আর বিষয় সকল, মীমাংসা করা যাউক।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টির প্রণালীর সংক্ষেপ বিবরণ।

যদিচ ঈশ্বরের কৃত সৃষ্টির পদার্থ সকল, একেবারেই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা অসম্ভব্য নহে, কিন্তু জগতের বহুতর কার্য্য, ও বস্তু সকল, কার্য্য কারণ সম্বন্ধে, উৎপন্ন হওয়া দৃষ্ট হইতেছে। তন্নিমিত্ত মূল জগৎ, কার্য্য কারণ সম্বন্ধে, উৎপন্ন হওয়াই অনুভব হয়। কার্য্য কারণ, অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ও ঐ কার্য্য আবার কারণ স্বরূপ হইয়া, তাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐরূপ শাস্ত্রেও মীমাংসিত হইয়াছে; অতএব কার্য্য কারণ সম্বন্ধানুসারে সৃষ্টির প্রক্রিয়া, মনু ও অন্যান্য শাস্ত্রের মত ঐক্য করিয়া লেখা যাইবেক। কিন্তু সংস্কৃত সকল, শ্লোক, ও সকল গ্রন্থের নাম, এবং যে গ্রন্থ হইতে যাহা গ্রহণ করা যাইবেক, তৎসমুদায় লিখিতে হইলে গ্রন্থ নিতান্ত বাহুল্য হয় বলিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল; তবে আবশ্যক মতে কোন কোন স্থানে শ্লোক, অথবা অধ্যায়েব অঙ্ক, লিখিত হইবেক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পরমেশ্বরের নিত্য সিদ্ধ কার্য্য; তাহাতে এই সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা লয় হইলে, কেবল শক্তিমান্—চৈতন্য পরমেশ্বর এক মাত্র ছিলেন। তিনি নিজ শক্তি দ্বারা পুনরায় সৃষ্টি করণ জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক, তাঁহার একাংশ হইতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকৃতিকে প্রকাশ করিলেন। এই মায়া হইতে, দশাংশ ন্যূন, বুদ্ধির সূক্ষ্মাবস্থা মহৎ তত্ত্বকে প্রকাশ করিলেন। তৎপরে তাহার দশাংশ ন্যূন, মনের ও তন্মাত্রার কারণ অহঙ্কার তত্ত্বকে প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ মায়ার প্রকাশ হইলে, পরমেশ্বর তাহাতে অধিষ্ঠান; ও সগুণ তেজোময় ব্রহ্ম রূপে প্রকাশ হইয়া, তাঁহার বুদ্ধি স্বরূপ মহৎ তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অহঙ্কার—তত্ত্ব; অহং অর্থাৎ আমি প্রজা রূপে বহু হইব, এই সঙ্কল্প করতঃ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ

তন্মাত্রার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবীর পরমাণু সকল অতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। ক্রমে সজাতীয় পরমাণু সকল, সজাতীয় পরমাণুর সহিত যোগ হইয়া, সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের সৃষ্ট হইল। এই ভূত সকল, ও প্রকৃতি, এবং মহৎ ও অহঙ্কার ইহারা ক্রমশঃ উপর্য্যুপরি বেষ্টন করত একটী গোলাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম মৃত্তিকা ভাগ, ও সুবর্ণ বর্ণ সহস্র সূর্য্যের তেজ তুল্য তেজোময় একটী ডিম্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ডিম্বকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। ইহা গোলাকার পদার্থ ইহাতে স্বয়ং ব্রহ্মা হিরণ্য-গর্ত্ত রূপে জন্ম গ্রহণ করেন; ঐ হিরণ্য গর্ত্ত ঐ ডিম্ব মধ্যে দেব পরিমাণের এক বৎসর থাকিয়া, ঐ অণ্ড দ্বিধা করিয়া প্রকাশ হয়েন। তৎপরে ঐ ডিম্ব অভ্যন্তরে, স্থূল, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। তদনন্তর দিক্ সকল, ও স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি স্থান সকল, সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মা আপন শরীর দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগে পুরুষ, ও এক ভাগে স্ত্রী রূপ ধারণ করত, বিরাট পুরুষের সৃষ্টি করেন। বিরাট মনুকে, মনু প্রজাপতিগণকে, প্রজাপতিরা সমুদায় স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সৃষ্টি করেন। এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সংক্ষেপ সৃষ্টির প্রণালী। এক্ষণে ইহার বিস্তারিত রূপ মীমাংসা করা যাইতেছে। তদ্বিষয় ভগবান মনুর মতের সহিত পুরাণাদি ও দর্শনশাস্ত্র, এবং তন্ত্রশাস্ত্রের মত ঐক্য করা যাইবেক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টি বিষয়ক বিস্তারিত মীমাংসা।

প্রথমতঃ নির্গুণ সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রকাশ হইলে, একটী মূর্ত্তি তেঁজোময়, অর্থাৎ মায়িক শরীর ধারণ হয়। ঐ শরীরের বুদ্ধি, মহৎ তত্ত্ব, ও মন, অহঙ্কার, দেহ, মায়াময়; অর্থাৎ হস্ত পাদাদি সকল মায়াময়। ইনি সগুণ ব্রহ্মচৈতন্য, ইহাঁকে; নানা শাস্ত্রে, নানা নাম, রূপ, ও স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহা পূর্ব্বে বলা

হইয়াছে।* এই সগুণ ব্রহ্ম, প্রজারূপে বহু হইবার সংকল্প করতঃ, কারণ শরীরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মায়া মহৎ অহঙ্কারের বহির্বেষ্টন স্বরূপ, ভৌতিক কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্রা যুক্ত শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। এই আটটী প্রকৃতিতে শক্তিময়চৈতন্যের আবির্ভাব হওয়াতে, ঐ চৈতন্যের দেহস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই কারণ শরীর সমষ্টি অভিমানী চৈতন্তের নাম ঈশ্বর। এই মূর্ত্তির বিভাগ দ্বারা, শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, প্রভৃতি তাঁহার মূর্ত্তি বিশেষ হইয়াছেন। ইঁহারা ইচ্ছাকৃত দেহধারী; অর্থাৎ হস্ত পদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তিধারী হইয়া লীলা করেন। এবং হস্ত পদাদি রহিত নিরাকার রূপে, জগতের অন্তরাত্মা স্বরূপ বিরাজমান থাকেন। এই কারণ শরীর হইতে, বিকার স্বরূপ, সূক্ষ্ম ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ শব্দতন্মত্রা হইতে পরমাণু রূপ আকাশ সকল উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ঐ সকল পরমাণু যোগে, সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হয়। ঐ আকাশ এবং স্পর্শ তন্মাত্রার যোগে, বায়ুর পরমাণু; ও তাহার যোগে সূক্ষ্ম বায়ু উৎপন্ন হয়।† ঐরূপ বায়ু ওরূপ তন্মত্রা হইতে, তেজের পরমাণু, ও তাহা যোগ হইয়া সূক্ষ্ম তেজ উৎপন্ন হয়।‡ তদ্রূপ তেজ ও রস তন্মত্রা হইতে জলের পরমাণু; ও তাহার যোগে জলের উৎপত্তি হইয়াছিল।§ এই জলকে কারণ বারি বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। অর্থাৎ কারণ শরীর হইতে এই জলের উদ্ভব হওয়াতে, ইহাকে কারণ বারি বলা যায়। মনুর ১ম অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকে আছে যে, ঈশ্বর অভিধ্যান পূর্ব্বক প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য, আপনার স্বীয় শরীর হইতে. জল হউক বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য কারণানুসারে, সূক্ষ্ম জলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ জল ঈশ্বরের শরীর হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, নর নামে খ্যাত; এবং ঐ জল অবান্তর প্রলয়কালে ‘ঈশ্বরের বিশ্রাম স্থান হইয়া থাকে বলিয়া, ঈশ্বর নারায়ণ নামে খ্যাত হয়েন।‖ কোন কোন শ্রুতিতে বলেন যে, ঈশ্বর হইতে প্রথমতঃ আকাশ, কেহ কেহ বলেন

* এই গ্রন্থের ১ম ভাগে ১৪ অধ্যায় দৃষ্ট কর।
† অধিক শব্দ হইলে বায়ুর উৎপত্তি হইতে পারে।
‡ বায়ুর ঘর্ষণে তেজ হয়।
§ অধিক তেজ অর্থাৎ অধিক উষ্ণতা হইলে যেমন ঘর্ম্ম হয়
‖ মনু প্রথম অধ্যায় ১০ম শ্লোক।

বায়ু, ও কেহ বলেন তেজ, ও কেহ বলেন জল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অনৈক্যের কারণ নহে। কেননা ঈশ্বর হইতে, সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। তবে অধিক প্রত্যক্ষ বিবেচনায় যিনি যাহা বলুন সকলই সম্ভব। অর্থাৎ আকাশ শব্দ মাত্র, তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ থাকাতে, অগ্রে উৎপন্ন বলা হইয়াছে; তাহা হইতে বায়ুর অধিক প্রকাশ থাকাতে, অগ্রে বায়ুর উৎপন্ন বলিয়াছেন। তদ্রূপ বায়ুর অপেক্ষা তেজের রূপ দর্শন হয় বলিয়া, অগ্রে তেজ; ও তদপেক্ষা জল আধার স্বরূপ বলিয়া, অগ্রে জল উৎপন্ন হওয়া বলিয়াছেন। ইহাতে অনৈক্য দোষ নাই। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য কারণ রূপে সৃষ্টি হওয়ার কথাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত জলে, পরমেশ্বর জগদ্বীজ অর্থাৎ জগদুৎপন্নের শক্তিরূপ বীজ নিক্ষেপ করাতে, ঐ বীজ একটী অণ্ড হইয়াছিল।* ঐ অণ্ড সুবর্ণ বর্ণ, এবং সূর্য্যদেবের তেজঃ সম প্রভাযুক্ত। তাহার মধ্যে স্বয়ং ব্রহ্মা, অর্থাৎ কারণ শরীর বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করেন। তাঁহার নাম সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা।† তাঁহাকে বেদান্ত দর্শনে হিরণ্যগর্ভ বলে। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের, দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৯ হইতে ৫৪ শ্লোকে আছে যে, ঐ জলে বুদ্বুদের ন্যায় অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ জল হইতে গন্ধতন্মাত্রার যোগে মৃত্তিকার পরমাণু উৎপন্ন হইয়া, ঐ পরমাণু যোগে সূক্ষ্ম মৃত্তিকা অণ্ডাকৃতি হয়।‡ এই ডিম্বের ত্বক্; অর্থাৎ বেষ্টন ভাগকে অণ্ডকটাহ বলা যায়; যেমন দুইখানি কড়াই উপর্য্যুপরি যোগ করিলে একটী গোলাকার ডিম্বসদৃশ হয়, তদ্রূপ হইয়াছিল। এবং এই অণ্ডকটাহকে সুমেরুও বলে। পৃথিবীর মধ্য স্থানে যে একটী পর্ব্বত আছে, তাহাকেও সুমেরু বলে। ঐ মধ্য সুমেরুর বাহিরে গর্ত্ত জরায়ু বেষ্টন আর কতকগুলি পর্ব্বত আছে, তাহা পরে বলা যাইবেক। ঐ অণ্ড-কটাহ সুমেরুর বাহিরে, যে সূক্ষ্ম জলের কথা বলা হইয়াছে; ঐ জল, অণ্ডকটাহ হইতে, দশগুণ অধিক পরিমাণ; ও তাহা ঐ অণ্ডের চারিদিকে বেষ্টিত আছে। যেরূপ জলের মধ্যে একটী

* মনু প্রথম অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

†. মনু প্রথম অধ্যায় ৯ম শ্লোক।

‡ জল জমিয়া শীল হওয়ার ন্যায় মৃত্তিকা হয়।

কলসীর মুখ বন্ধ করিয়া, ডুবাইয়া রাখা যায়; তদ্রূপ ঐ ডিম্বাকার ব্রহ্মাণ্ড, ঐ জলের মধ্যে আছে। ঐ জলের চারি দিগে, দশগুণ অধিক সূক্ষ্ম তেজ, গোলাকারের ন্যায় বেষ্টিত রাহিয়াছে। ঐরূপ সূক্ষ্ম বায়ু, ও আকাশ, এবং অহঙ্কার ও মহৎ, এবং প্রকৃতি, ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রত্যেক পদার্থ হইতে, পর পর প্রত্যেকে দশগুণ অধিক ও গোলাকার রূপে বেষ্টিত আছে। ইহার বাহিরে ও অন্তরে, এবং ঐ ঐ পদার্থের অভ্যন্তরে, শক্তিমচ্চৈতন্য আছেন। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ সপ্ত পদার্থ; যাহা সগুণ ব্রহ্মের কারণ শরীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড থাকাতে, ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর, ও ঈশ্বরীকে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী বলে; অর্থাৎ ভাণ্ডস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড, যাঁহার উদরে আছে, তাঁহাকেই বলা যায় ঐ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ ঐ সূক্ষ্ম আকাশের সত্ব গুণ হইতে, শ্রবণ, ও বায়ুর সত্ব গুণ হইতে ত্বক্, ও তেজের সত্ব গুণ হইতে চক্ষু, জলের সত্ব গুণ হইতে রসনা ও পৃথিবীর সত্ব গুণ হইতে ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। ইহারা প্রত্যেকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিষয়ের এক এক বিষয় গ্রহণ করে। পূর্ব্বোক্ত আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্য, বায়ুর রজোগুণ হইতে চরণ, জলের রজোগুণ হইতে পায়ু অর্থাৎ গুহ্য, পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থ, এই পঞ্চ সূক্ষ্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়া, প্রত্যেকের দ্বারা প্রত্যেক কার্য্য, অর্থাৎ বাক্য কথন, দ্রব্য গ্রহণ, ও গমন, এবং বিষ্ঠা মূত্র ও শুক্র ত্যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদন হয়। আর পঞ্চতন্মাত্রার সার অংশ সত্বগুণের যোগে মহৎ তত্ব হইতে বুদ্ধি, ও অহঙ্কার তত্ব হইতে মনের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বুদ্ধির নিশ্চায়াত্মক, ও মনের সংশয়াত্মক বৃত্তি। মন পূর্ব্বোক্ত দশেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা; ইনি ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত করেন। এই মন বাসনাময়; তাহাকে চিত্ত, ও অন্তঃকরণ, এবং হৃদয়, নানা নাম ও রূপে ব্যবহার করা যায়। মন কেবল বুদ্ধির বিবেক দ্বারা বশীভূত হয়েন; নতুবা সর্ব্বদাই চঞ্চলভাবে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম অপ-ঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের রজোগুণ সমষ্টি হইতে, মনের সহযোগে বায়ুরূপী প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার; প্রাণ, অপান, সমান উদান, ব্যান; প্রাণবায়ু হৃদয়ে থাকিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস রূপে নাসিকাদ্বার

দিয়া নির্গত ও উপগত হয়। অপান বায়ু অধোভাগে অর্থাৎ গুহ্য ও উপস্থ-দেশে থাকিয়া, বিষ্ঠা মূত্র, ও রেতঃ নিঃসরণ করে। সমান বায়ু নাভিদেশে থাকিয়া উদরস্থ দ্রব্য পাক করে। ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই প্রাণ মনের অধীন, কেননা সমাধি কালে মনের গতিরোধ হইলে, প্রাণের গতি রোধ হয়।* পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতের দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল হইয়াছিল। কারণ শরীরী ব্রহ্মা, ঐ ডিম্ব মধ্যে থাকিয়া একরূপে স্বীয় সূক্ষ্ম শরীরের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আবির্ভাব হওত হিরণ্যগর্ভ নামে প্রখ্যাত হয়েন। পরে স্বীয় শরীর হইতে, ব্যষ্টি রূপে সূক্ষ্ম পদার্থ সকল সৃষ্টি করেন; অর্থাৎ ব্রহ্মার নানা অঙ্গ হইতে জগতের নানা পদার্থের সূক্ষ্ম শরীর সকল সৃষ্টি হয়; ঐ প্রজাপতি, বেদ শব্দ দৃষ্টে যাহার যে নাম, ও রূপ ও কর্ম্ম সকল সৃষ্টি করেন; অর্থাৎ কর্ম্মাত্মা দেবতা, সাধ্যগণ, ও যজ্ঞ সকল, এবং তদুপযোগী ঋক্-যজুঃ-সামলক্ষণাক্রান্ত মন্ত্র সকল, অগ্নি, বায়ু, রবি, হইতে প্রকাশ করেন। এবং কাল ও কালের বিভাগ, দিক্ সকল, ও দিবা রাত্রি, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্র, নদী সাগর, ও পর্ব্বত, সমান ও অসমান স্থান, তপস্যা, রতি, কাম ক্রোধাদি, ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মের নিয়ম; যাহা আচরণে প্রজারা সুখী দুঃখী হয়, তাহা, এবং মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের, পাদ হইতে শূদ্রের, সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণ করেন। তিনি, সিংহ ব্যাঘ্রাদির হিংসা, হরিণা-দির মৃদুতা, ব্রাহ্মণাদির দয়া, ক্ষত্রিয়াদির যুদ্ধ, ইত্যাদি, যে জাতির যে কর্ম্ম ও ভাব নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহারা স্থূল দেহ ধারণ করিয়া তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেমন ঋতু কাল উপস্থিত হইলে, শীত, গ্রীষ্মাদি হইতে থাকে, তদ্রূপ সৃষ্ট বস্তু সকল স্ব স্ব কর্ম্মানুবর্ত্তী হইতে লাগিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা, যেমন সূক্ষ্ম শরীর সকল সৃষ্টি করিলেন; তদ্রূপ পঞ্চী-করণ দ্বারা স্থূল ভূত নির্ম্মাণ করেন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে, অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া, প্রথমতঃ পঞ্চভূতকে বিভাগ করতঃ, তাহার একার্দ্ধ ভাগ মূল ভূত,

* এতদ্ভিন্ন বহির্বায়ু পঞ্চ আছে অর্থাৎ নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়. কেহ বলেন যে এই পঞ্চ বায়, প্রাণের অন্তর্গত স্থূল দেহের কার্য্য করে, অর্থাৎ নাগ উদ্গীরণকারী, কূর্ম্ম চক্ষু উন্মীলন আদিকারী, কৃকর ক্ষুধা জনক, দেবদত্ত হাপিকাজনক, ধনঞ্জয় পুষ্টিকারক।

ও অপরার্দ্ধ ভাগ, চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আর চারি ভূতের সহিত মিশ্রিত করিয়াছিলেন। যথা আকাশকে দ্বিভাগ করিয়া, তাহার এক ভাগ মূল আকাশ, ও অপরার্দ্ধ চারি ভাগ করত, তাহার এক ভাগ বায়ু ও তেজ এবং জল, ও পৃথিবীর সহিত মিশ্রিত করেন; তদ্রূপ বায়ুকে দ্বি-ভাগ করিয়া এক ভাগ মূল ও অপর ভাগকে চারি ভাগ করতঃ এক ভাগ আকাশে, ও এক ভাগ তেজে, ও এক ভাগ জলে, এক ভাগ পৃথিবীতে, মিশ্রিত করেন। তদ্রূপ তেজ, জল, ও পৃথিবীকে, ঐ রূপ বিভাগ করিয়া মিশ্রিত করাতে, পঞ্চ-ভূতে, পঞ্চভূত পরস্পর মিলিত হইয়া, স্থূল পঞ্চ-ভূত-রূপে, প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আকাশে, অন্য চারি ভূতের অংশ থাকা লক্ষিত হয় না বলিয়া, স্থূল দৃষ্টিতে কিছু যুক্তি বিরুদ্ধ হয় বটে; ফলতঃ আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীরা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আকাশে অন্য ভূতের অংশ আছে; এবং তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, বিশ্বাস করা যাইতে পারে। পরন্তু যে স্থানে বায়ুর গতি নাই, অর্থাৎ, ঊর্দ্ধঃভাগে স্থির-বায়ু আছে, তথায় আকাশের সহিত বায়ু মিলিত ভাবে থাকায়, আকাশে যে, অন্য ভূতের অংশ আছে, তাহাও অনুমান হয়। তবে, আকাশ বায়ু তেজ ও জলে পার্থিব, এবং আকাশ বায়ু ও তেজে পার্থিব ও জলীয় অংশ, এবং আকাশ ও বায়ুতে, পার্থিব ও জলীয় এবং তেজ, ও আকাশে, অন্য কোন ভূতের অংশ সচরাচর। লক্ষিত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ভূতের কথা, যে বলা হইয়াছে, তাহাতে আকাশ শব্দ ময় *। আকাশের দশাংশের একাংশ বায়ুর পরিমাণ। ঐ আকাশের শব্দ গুণ ও স্পর্শ তন্মাত্রার যোগে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে বায়ুতে শব্দ স্পর্শ দুইটী গুণ থাকায়, আকাশ অপেক্ষা বায়ুর অধিক প্রকাশ স্বভাব হইয়াছে। ফলতঃ আকাশের পরিমাণ অধিক থাকায়, অন্য ভূতের অত্যল্প অংশ স্থূল আকাশে যোগ হওয়ায়, তাহা লক্ষিত হয় না; বরং আকাশের অষ্টমাংশের একাংশ, বায়ুতে যোগ হওরায়, বায়ুর পরিমাণ অপেক্ষা, আকাশের পরিমাণ অধিক থাকায়, বায়ুতে আকাশ উপলব্ধি হয়। তদ্রূপ সূক্ষ্ম তেজ বায়ুর দশাংশের একাংশ।

* চারি রূপ শব্দ দ্বারা আকাশ হয়, অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্র ও শব্দের পরমাণু ও সূক্ষ্ম শব্দ রূপ আকাশ, ও পরে বায়ু প্রভৃতি ভূতের যোগে স্পষ্ট শব্দ প্রকাশ হয়।

তাহা শব্দ স্পর্শ ও রূপতন্মাত্রার যোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া, তেজে শব্দ স্পর্শ ও রূপ লক্ষিত হয়। বায়ুতে অন্যান্য ভূতের অষ্টমাংশ অর্থাৎ অতি অল্প মাত্র যোগ হওয়ায়, তাহা লক্ষিত হয় না। বরং তেজেতে বায়ুর অষ্টমাংশ, যাহা তেজের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক; তাহার যোগ হওয়ায় বায়ুর শব্দ স্পর্শ গুণ তেজে লক্ষিত হয়। ঐ রূপ তেজের দশাংশের একাংশ জল, ও জলের দশাংশের একাংশ পৃথিবী, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ অধিকাংশ থাকায়, তাহা অধিক প্রকাশ হয়; এবং পর পর ভূতের পরিমাণ ন্যূন বিধায়, তাহার অষ্টমাংশের একাংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতে মিশ্রিত হওয়ায় তাহা সচরাচর লক্ষিত হয় না। কিন্তু রাসায়নিক বিদ্যা দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহা লক্ষিত হইতে পারে। ফলিতার্থে পঞ্চভূতেই, পঞ্চভূত পরস্পর মিলিত আছে তাহার সন্দেহ নাই। তবে বিজ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা ব্যতীত নিশ্চয় করা কঠিন। এই পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ভূত, ও সূক্ষ্ম দেহ, এবং স্থূল পঞ্চভূতের মীমাংসা করা হইল। এক্ষণে স্থূল দেহ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত করা যাউক্।

তৃতীয় অধ্যায়।

কিরূপে স্থূল দেহের উৎপত্তি হইয়াছে তদ্বিবরণ।

ব্রহ্মা স্থূল ভূতের সৃষ্টি করিয়া, স্থূল দেহের সৃষ্টি করণ মানসে আপনার শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, তাহার একভাগ নারী, এক ভাগ পুরুষ রূপ ধারণ করেন। ঐ স্ত্রী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু বিরাট রূপে উৎপন্ন, ও তাঁহার ললাট হইতে শিব, রুদ্র রূপে প্রকাশ হয়েন। কিন্তু মনুষ্যাদির জন্মের ন্যায় জন্ম নহে; কেবল অংশের আবির্ভাব মাত্র। ঐ বিরাটের মূর্ত্তি জগন্ময়।* বিরাট স্থূল দেহে আবির্ভাব চৈতন্য; ইতি সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে জগদ্ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ইনি তপস্যা অর্থাৎ সংকল্প দ্বারা, স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু কি রূপে হইল তাহা মনুসংহি-

*। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্দে ১ম অধ্যায় দৃষ্ট কর।

তায় নাই; অন্য পুরাণে আছে যে, বিরাট পত্নী হইতে মনু হয়েন; কেহ বলেন তিনি অযোনিজ। ঐ মনু হইতে মানব সৃষ্টি হইয়াছে। মনু তপস্যা দ্বারা, স্বীয় পত্নীতে মরীচি, অত্রি, আঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, এই দশ। প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।* যদি বলা যায়, যে অন্যান্য শাস্ত্রে, প্রজাপতিরা ব্রহ্মার মানস পুত্র নামে কথিত হইয়াছে। অথচ মনুর গ্রন্থে বলা হইল যে, ইহাঁরা স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র, ইহাতে বিরোধ হইতেছে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রথম সৃষ্টি সময়ে, ব্রহ্মা মানস করিয়াছিলেন যে, প্রজাপতিরা জন্ম গ্রহণ করিয়া, সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিবেন। তজ্জন্য তাঁহার মন হইতে, ইহাঁদিগের সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন করিয়াছিলেন; তদনুসারে ইহাঁরা মনু হইতে, স্থূল দেহ ধারণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, ইহাঁরা ব্রহ্মার মানস হইতে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করেন বলিয়া, ব্রহ্মার মানসপুত্র ও মনু হইতে স্থূল দেহ ধারণ করেন বলিয়া মনুর পুত্র নামে খ্যাতি হয়েন। ব্রহ্মা পূর্ব্বে সনকাদি ঋষিদিগকে, অযোনিজ রূপে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা নিবৃত্তি পথ অনুসরণ করাতে, তাঁহাদিগের দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য সাধন না হওয়ায়, প্রবৃত্তি-পথাবলম্বী প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তবে পুরাণ শাস্ত্রে, নানাপ্রকার সৃষ্টির প্রণালী, যে লেখা আছে, সে ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়াবসানে, যে সকল সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই লেখা হইয়াছে। কিন্তু আদি সৃষ্টিবিষয়ের প্রণালী এই রূপ। ইহাতে অন্য প্রলয়াবসানে সৃষ্টির প্রণালীর সহিত অনৈক্য হওয়ায় অনৈক্য দোষ হইতে পারে না। ইহা প্রলয় মীমাংসা কালে নির্ণয় করা যাইবেক। এই প্রজাপতিদিগের বংশে, অন্য ত্রয়োদশ জন মনু জন্ম গ্রহণ করেন। এবং তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্র সকল, প্রজাপতি রূপে প্রজা সৃষ্টি করেন; এবং কেহ পিতৃলোক নামে খ্যাত হয়েন; তদ্বিষয়ে ক্রমশঃ স্থল বিশেষে প্রকাশ করা যাইবেক। মন্বন্তর প্রলয়ান্তে ব্রহ্মার আর একটী পুত্র, দক্ষ প্রজাপতি নামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ৬০ ষাইটটী কন্যা জন্মে, তাহার ১৩টী কন্যা, মরীচের

*। মনু, পত্নীতে যে প্রজাপতিরা জন্ম গ্রহণ করেন তাহা মনুসংহিতায় নাই, পুরাণে আছে, এবং তাৎপর্য্য অনুসারে তাহাই বোধ হয়, কেননা ব্রহ্মা স্ত্রী পুরুষ হইয়াছিলেন পরে ঐরূপ হইয়াছে।

পুত্র কশ্যপ প্রজাপতিকে বিবাহ দেন, এবং ২৭টী চন্দ্রকে, এবং অন্যান্য কন্যা অন্যকে বিবাহ দেন। এই সকল বৃত্তান্ত পুরাণে জানিতে পারা যায়; তদ্বিস্তারিত লিখিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হইয়া পড়ে বলিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল। ফলতঃ অবান্তর প্রলয়ান্তে, কশ্যপ হইতে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনেক প্রাণী উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষণে প্রথম সৃষ্টি কালে প্রজাপতিরা, যে, চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি করিলেন; তাহা লেখা যাইতেছে। প্রজাপতিরা, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি প্রাণী ও বৃক্ষাদি সৃষ্টি করেন। মনুষ্য, পশু এবং উভয় দন্ত বিশিষ্ট প্রাণী, ও রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি জরায়ুজ;* ও পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি স্থলজ ও জলজ; অনেক জন্তু অণ্ডজ অর্থাৎ ডিম্ব হইতে জন্মায়। আর দংশ, মশক, মক্ষিকা, জলৌকা, চিনাজোঁক, মৎকুন, উকুন ইহারা ক্লেদজ ও পিপীলিকা, এবং পুত্তিকাদি উষ্ণজা† ও বীজ, এবং ভূমি ভেদ করিয়া উঠে তাহারা উদ্ভিজ্জ বৃক্ষ। এই বৃক্ষ, শাখা রোপিত হইয়াও হয়। যাহাদিগের পুষ্প ও ফল হইয়া বিনাশ হয়, তাহারা ওষধি। যাহাদিগের পুষ্প না হইয়া ফল হয় তাহারা বনস্পতি। ও যাহাদিগের পুষ্প হইতে ফল হয় তাহারাও বৃক্ষ নামে খ্যাত। এবং গুচ্ছ, গুল্ম, বল্লী প্রভৃতি বীজ ও কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নানারূপ হইতেছে। এইরূপ নিয়ম, প্রজাপতিরা অবধারণ করিয়া, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগৎ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দেব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সর, অসুর, নাগ, সর্প, পক্ষী, পিতৃলোক, বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, ইন্দ্রধনু, রোহিত, উল্কা, নির্ঘাৎ, ধূমকেতু, ধ্রুব, অগস্ত্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পর্ব্বত, বৃক্ষাদি, নদ, নদী, সমুদ্র, প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থ; ও ভূর্লোকাদি সপ্ত স্বর্গ, ও সপ্ত পাতাল, এই চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে প্রজাপতিদিগের নিয়মানুসারে জগৎ কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা, অধিকাংশ মনুর ১ম অধ্যায় হইতে করা গেল, ও কোন কোন স্থানে অন্য শাস্ত্র অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা বেদান্তের সহিত ঐক্য থাকা দেখান যাইতেছে। এবং

* গর্ভে জরায়ু নামে একটী চর্ম্মাবরণ হয় তাহাতে সন্তান থাকে।

† ক্লেদজ ও উষ্ণজকে স্বেদজ বলা যায়।

ইহার সহিত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণাক্রান্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির মীমাংসা সকল ঐক্য রূপে সিদ্ধান্ত করা যাইবেক।

চতুর্থ অধ্যায়।

সৃষ্টি বিষয়ক নানা শাস্ত্র এবং সাকার নিরাকার মীমাংসা।

বেদান্ত দর্শনে, আছে যে কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীরে অভিমানী চৈতন্যের নাম ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, ও বিরাট, এবং তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য, অশরীরী ও অনাবৃত। ইহাঁর সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে এই জগৎ সংসার হইয়াছে। এই কথা এই গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়দ্বয়ে মীমাংসা করা হইরাছে। কেন না শক্তিমচ্চৈতন্য, ও কারণ শরীরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এবং সূক্ষ্ম শরীরী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা; ও স্থূল শরীরী বিষ্ণুর অংশ বিরাট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে; অতএব মনুর সহিত বেদান্তের প্রভেদ নাই। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে, অনেক শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মা রজোগুণ, ইনি সৃষ্টি করেন; বিষ্ণু সত্ত্বগুণ ইনি পালন করেন; শিব তমোগুণ ইনি সংহার করেক। কিন্তু তাহা নহে; ইহাঁরা বাস্তবিক প্রত্যেকেই ত্রিগুণাত্মক; এক এক গুণাবলম্বী নহেন। কারণ গুণত্রয়কে, স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া, স্বতন্ত্র বস্তু রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কেন না ঐ ত্রিগুণ কোন দৃশ্য বস্তু, অথবা গ্রহণ যোগ্য বস্তু নহে, যে তাহা বিভাগ হইতে পারে। অতএব ঐ দেবত্রয়, প্রত্যেকেই ত্রিগুণাত্মক কারণ শরীর বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম, নিরাকার ও সাকার রূপধারী। এবং ইহাঁরাই কারণ শরীর ব্যষ্টি, অর্থাৎ বিভাগরূপে সমুদায় জগতের নিরাকার কারণ শরীর হইয়াছেন। ইহাঁরা এক বস্তু হইতে তিনটী রূপ মাত্র ধারণ করত, জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। যে সময়, কারণ শরীর বিভাগ হয়, তখন যে অংশ ব্রহ্মার কারণ শরীর হইয়াছিল; ঐ অংশ সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করত, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা রূপে খ্যাত হয়েন। ঐ সূক্ষ্ম শরীর ব্যষ্টি অর্থাৎ বিভাগ হইয়া, এক এক অংশ, এক এক সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট জীব নামে খ্যাত হইয়াছিল। ঐ জীব সকল নানাপ্রকার স্থূল

দেহে প্রবেশ করত, সুখ দুঃখ-ভাগী হইয়াছে। তৎপরে স্থূল দেহের বিনাশ হইলে, ঐ সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট জীব পরলোক গমন করণান্তে, পুনরায় জন্ম গ্রহণ অর্থাৎ স্থূল দেহ ধারণ ও ত্যাগ করে। এই স্থূল দেহ ধারণ ও পালন, বিরাট রূপী বিষ্ণুর কার্য্য। এবং স্থূল দেহের বিনাশ, রুদ্র-রূপী শিবের কার্য্য। কিন্তু বস্তু এক সগুণ ব্রহ্ম পদার্থ। ইনি যে মূর্ত্তিতে যখন যে গুণের কার্য্য করেন, তখন তাঁহাকে সেই গুণাবলম্বী বলা যায়। যথা ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভরূপে সৃজন করেন, তাহা রজোগুণের কার্য্য বলিয়া, তাঁহাকে রজোগুণাবলম্বী বলা যায়। এবং কারণ শরীরী বিষ্ণুর অংশ বিরাটরূপধারী হইয়া, এই বিশ্ব সংসার ধারণ ও পালন করেন, তাহা সত্ত্ব গুণের কার্য্য বলিয়া, তাঁহাকে সত্ত্বগুণাবলম্বী বলা যায়। এবং শিবের অংশ রুদ্র রূপ ধারণ করিয়া সংহার করেন, তাহা তমোগুণের কার্য্য বলিয়া, তাঁহাকে তমোগুণাবলম্বী বলা যায়। ইহাতে নির্ণয় হয় যে, যাঁহার অংশ হইতে যে কার্য্য সমাধা হয়, তাঁহাকেই তন্ময় ও কর্ত্তা বলা যায়। অতএব বিষ্ণু ও শিবের অংশকে, বিষ্ণু ও শিব বলা যায়। ইহাতে তাঁহাদিগের রূপান্তর ধারণ, ও অধিক পরিমাণে ঐ ঐ গুণের মধ্যে, একটী একটী গুণ অবলম্বন করাতে, ঐ ঐ গুণাবলম্বী বলা হইয়াছে। নতুবা কারণ শরীর বিশিষ্ট একে তিন, ও তিনে এক, এবং প্রত্যেকেই ত্রিগুণাত্মক দেহধারী তাহার আর সন্দেহ নাই। এবং অগ্রে শিবরূপ, মধ্যে বিষ্ণুরূপ, পরে ব্রহ্মারূপ ধারণ করেন। ইহা সন্ধ্যা বিধিতে আছে; অর্থাৎ শিব বৃদ্ধ; এবং বিষ্ণু যুবা; ও ব্রহ্মা কুমার, ইহাঁদিগের পত্নীরাও ঐ রূপ, অর্থাৎ শিবানী বৃদ্ধা; বৈষ্ণবী যুবতী; এবং ব্রহ্মাণী কুমারী। এই রূপ ধ্যানেতে গায়ত্রীর উপাসনা হইয়া থাকে। ইহাঁরা সকলেই এক বস্তু; কেবল পৃথক্ পৃথক্ রূপ মাত্র। এবং কার্য্য পৃথক্ বটে, তাহাতেই পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করা যায়; নতুবা বস্তু পৃথক্ নহে। তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামে যে অগ্র পশ্চাৎ অর্থাৎ অগ্রে ব্রহ্মা, এবং পরে বিষ্ণু, শেষে শিব, বলা হইয়াছে; ইহার কারণ এই যে, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করণ সময়ে, অগ্রে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ রূপ ধারণ করেন বলিয়া, অগ্রে ব্রহ্মা; পরে বিষ্ণু বিরাট রূপ ধারণ করেন বলিয়া পরে বিষ্ণু; তদনন্তর শিব রুদ্র রূপ ধারণ করেন বলিয়া, শেষে শিব নাম শাস্ত্রকারেরা বলিয়া-

ছেন। ফলিতার্থে অগ্রে সৃষ্টি, পরে স্থিতি, তদনন্তর লয় হয় বলিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ও পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, এবং সংহারকর্ত্তা শিব, এতন্নিবন্ধনই নামের অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে *। ইহাঁদিগের কারণ শরীর মায়াময় মাত্র। ঐ মায়া দুই প্রকার, বিদ্যা ও অবিদ্যা। তাহাতে অধিক সত্ত্ব, এবং অত্যল্প মাত্র রজঃ তমঃ ভাগ যুক্ত দেহকে বিদ্যা বলা যায়। কিন্তু রজঃ তমঃ গুণের কিছুই প্রকাশ না থাকায়, কেবল শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা বিদ্যা বলিয়া অভিহিতা, হইয়াছে। ফলিতার্থে রজঃ তমঃ তাহাতে লেশ মাত্র আছে। ঐ বিদ্যাতে আবির্ভাব চৈতন্যই, শিব, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা, এবং দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, প্রভৃতি। আর অধিক রজঃ তমঃ; ও অল্প মাত্র সত্ত্ব গুণাত্মিকা অবিদ্যা। এই অবিদ্যাকে শিব বিষ্ণু প্রভৃতিরা বশীভূতা করিয়াছেন। ইহাও তাহাদিগের শরীরের অংশ বলিতে হইবেক। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যদিচ মায়ার সহিত যোগযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি মায়ার বশীভূত নহেন। ঐ ঈশ্বরের ব্যষ্টি, অর্থাৎ অংশ স্বরূপ জীব অবিদ্যা মায়ার বশীভূত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি কার্য্য করেন, তখন অবিদ্যাকে আশ্রয়, ও তাহাকে বশীভূতা করিয়া কার্য্য সমাধা করেন। আর যখন লয় করেন; তখন বিদ্যাকে আশ্রয় ও বশীভূতা করিয়া কার্য্য সমাধা করেন। বস্তুতঃ এক মায়ার দুই অবস্থা জ্ঞান ও অজ্ঞান। জ্ঞানকে বিদ্যা, ও অজ্ঞানকে অবিদ্যা বলা যায় †। জীবের বন্ধন ও মুক্তির হেতু ঐ মায়া; অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা সংসার বন্ধন হয়; এবং বিদ্যা দ্বারা মুক্তি হয়। আরও বিবেচনা হয় যে, অধিক রজস্তমো ভাগে অত্যল্প চৈতন্য পদার্থ আবৃত হওয়াতেই, জীব অজ্ঞান দশায় পতিত হইয়া, সংসারে ভ্রমণ করে; পুনরায় কার্য্য দ্বারা রজঃ তমকে পরাভূত, করিয়া সত্ত্ব গুণের অধিক ভাগ প্রকাশ হইলে, জীব মুক্তি পথে গতি করে। পুরাণাদিতে আছে যে, ব্রহ্মা, শিব ও ও বিষ্ণুর স্তব করেন; এবং হরি হর অভিন্ন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা প্রথমতঃ কারণ শরীরী হইয়া, তদনন্তর অগ্রে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতঃ সৃষ্টি

* শিব রুদ্র-রূপধারী হইয়া জীবের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। পশ্চাৎ প্রলয় সময়ে কালাগ্নি রুদ্র রূপে সৃষ্টি বিনাশ করিবেন।

† এই জ্ঞান ব্রহ্ম নহে, ইহা নির্ম্মল বুদ্ধি, ইহা দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান হয়।

কার্য্য সাধন করেন। শিব ও বিষ্ণু কারণ শরীব বিশিষ্ট থাকেন। কারণ শরীর একই প্রকার বস্তু বিধায়, হরি হর অভিন্ন রূপ বলা যায়। ব্রহ্মা শরীবান্তর ধারণ করায় কিঞ্চিৎ ন্যূন ভাবাপন্ন হওয়া বিবেচনা করতঃ, শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা করেন। তবে সময় সময় শিব, বিষ্ণুর উপাসনা, ও বিষ্ণু শিবের উপাসনা যে করেন,সে কেবল মহিমা প্রকাশ মাত্র; ফলিতার্থে কোন প্রভেদ থাকা সিদ্ধান্ত হয় না। পূর্ব্বে যে, সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; তাহা সকল শাস্ত্রেব সহিত ঐক্য আছে। কেননা শক্তিমচ্চৈতন্যই পরমেশ্বর; তিনি সৃষ্টি কার্য্যের জন্য, প্রকৃতি-পুরুষ-রূপ-ধারি হইয়া, যে, অণ্ড অর্থাৎ ডিম্বের সৃষ্টি করেন; ঐ ডিম্ব মধ্যে যে ব্রহ্মা আবির্ভাব হইয়া, সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করেন; ইহা বেদ, ও মনু, ও জ্যোতিষ, ও বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ ইত্যাদি সকল পুরাণে ও তন্ত্রে আছে; তবে প্রকৃতি পুরুষের নাম শব্দান্তব করিয়া যিনি যাহা বলুন না কেন, তাহার তাৎপর্য্য একই আছে। তৎসমুদায় ভাবার্থ একত্রে মীমাংসা করিতে হইলে, গ্রন্থ নিতান্ত বাহুল্য হয় বিবেচনায়, ক্ষান্ত থাকা গেল। এক্ষণে পৃথিবী কিসের উপর স্থিতি, ও গ্রহ নক্ষত্রাদিব গতি, ও স্থিতি, এবং অয়ন, বৎসর সকল, কিরূপ তাহা বিবেচনা করা যাউক।

পঞ্চম অধ্যায়।

পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের স্থিতি কি প্রকারে আছে তাহা নির্ণয়।

পূর্ব্বে যে সুবর্ণ বর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হইয়াছে; ঐ অণ্ডের বাহিরে সূক্ষ্ম জল, ও তেজ, বায়ু, ও আকাশ, মহত্তত্ত্ব, ও অহঙ্কাব, এবং প্রকৃতি, এই সাতটী আবরণ গোলাকৃতি রূপে বেষ্টন আছে। ঐ গোলাকৃতি পদার্থ সকল শক্তিমচ্চৈতন্যের বেষ্টন আছে; অর্থাৎ তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা চতুর্দ্দিগ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; এবং তিনি ঐ সকল পদার্থেব মধ্যে ও অভ্যন্তরেও

আছেন *। উপরি উক্ত ডিম্ব গোলাকার, তাহার ত্বক্ সুবর্ণ বর্ণ মেরু। তাহার মধ্যে স্থূল জল আছে, ঐ জলের উপর আকাশ মার্গে পৃথিবী গোলাকার রূপে মৃৎপিণ্ডাকার প্রথমে সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চী-করণ দ্বারা ঐ মৃত্তিকা হইয়াছে। তদনন্তর পৃথিবীর গুরুত্ব প্রযুক্ত ঐ স্থূল জলে তাহা নিমগ্ন হইয়াছিল। পুরাণে আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞ-বারাহ, অর্থাৎ বরাহ রূপ ধারণ করিয়া ঐ জল হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তদনন্তর পুনরায় ঐ রূপ নিমগ্ন না হয়, এই নিমিত্ত ঈশ্বর স্বয়ং কূর্ম্মরূপ অর্থাৎ অণ্ড মধ্যস্থ জলের উপর কচ্ছপ রূপ ধারণ করিয়া ভাসমান হইলেন। ঐ কচ্ছপের পৃষ্ঠে স্বয়ং সর্পরূপী তামসী মূর্ত্তি অনন্তরূপ ধারণ করতঃ দণ্ডাকারের ন্যায় উন্নত ভাবে, সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং ঈশ্বর ঐ কূর্ম্মের পৃষ্ঠে অষ্ট দিগে আটটী দিগ্গজ রূপ ধারণ করিয়া, শুণ্ড উত্তোলন করতঃ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিলেন। ঈশ্বর, লীলা বিস্তার করণ জন্য, এই সকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পৃথিবীকে অচলা রূপে রক্ষা করিয়াছেন। কূর্ম্ম পৃষ্ঠের উপর গোলাকার পর্ব্বত বেষ্টন আছে। ইহা যেমন গোলার বেড়, ঐ রূপ প্রাচীরের ন্যায় ঘেরা আছে। ইহার নাম লোকালোক পর্ব্বত। এই লোকালোক পর্ব্বতের দক্ষিণ বৃত্তকে কুমেরু বলে; এবং উত্তর বৃত্তকে সুমেরু বলে; ও পূর্ব্ব বৃত্তকে উদয়াচল, এবং পশ্চিম বৃত্তকে অস্তাচল বলে। ইহার বাহিরে অন্ধকারময়, তাহার পরে ব্রহ্মাণ্ডের ত্বকে বেষ্টন আছে। অএতব পৃথিবীর নীচে অনন্ত; তাহার নীচে কূর্ম্ম; তাহার নীচে স্থূল জল, তাহার নীচে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন ত্বক ভাগ রহিয়াছে। পৃথিবীর নিম্নের পদার্থ সকল ধারণাত্মিকা-শক্তি ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশেষ। পৃথিবীর মধ্য স্থানে দণ্ডাকারের ন্যায় সুমেরু পর্ব্বত রহিয়াছেন। ঐ পর্ব্বতের মূল অনন্তদেবের মস্তকে আছে; এবং তথা হইতে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর উপরে অধিক পরিমাণ উত্থিত হইয়াছে। ইহার চারি দিকে হিমালয় প্রভৃতি কতকগুলিন পর্ব্বত আছে।

* পঞ্চদশী গ্রন্থকার বলেন যে, শূন্য কোন পদার্থ নাই, ইহা অতি সঙ্গত, কেননা শূন্য পদার্থ থাকিলে, ব্রহ্মাণ্ড তাহাকে থাকিতে পারে না। অতএব নিরাকার ঈশ্বর স্বীয় শক্তিতেই ধারণ করা সঙ্গত।

শাস্ত্রে তিনটী পর্ব্বতকে সুমেরু নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ মধ্য পর্ব্বতের নাম সুমেরু, এবং লোকালোক পর্ব্বতের উত্তর বৃত্তের পর্ব্বতের নাম সুমেরু, এবং ব্রহ্মাণ্ডের ত্বক্ পর্ব্বতের নাম সুমেরু। তাহাতে মধ্য সুমেরুর চারি দিকে পৃথিবীর যে ভাগ, লবণ সমুদ্রে বেষ্টিত রহিয়াছে ইহাকে জম্বুদ্বীপ বলে। ইহার পূর্ব্ব দিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ, দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষ, ও পশ্চিম দিকে কেতুমালবর্ষ, ও উত্তর দিকে কুরুবর্ষ, ইহা সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে বলে। বিষ্ণুপুরাণে আরও অনেক বর্ষের নাম আছে *। ফলিতার্থে সেই সকল বর্ষ, এই চারি বর্ষের অন্তর্ভূত এক এক মহাপুরীকে, এক এক বর্ষ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে; ইহা অনৈক্যের কারণ নহে। এই লবণ সমুদ্রের অপর পারে, প্লক্ষদ্বীপ নামে একটী দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপ লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ প্লক্ষদ্বীপের চারি দিকে ইক্ষু সমুদ্র নামে সমুদ্র, গোলাকারে বেষ্টন রহিয়াছে। এইরূপ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ও পুষ্করদ্বীপ, ক্রমে সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জলান্তকা সমুদ্রে বেষ্টিত আছে। প্রত্যেক দ্বীপে ৯ নয়টী বর্ষ ও নদী এবং পর্ব্বত ও মনুষ্যাদি রহিয়াছে। জলান্তকা সমুদ্রের অপর পারে সুবর্ণ বালুকাময় ভূমি আছে; তাহার পরে আকাশ, তৎপরে লোকালোক পর্ব্বত। পুরাণে দ্বীপ ও উপদ্বীপ এবং বর্ষের নাম ভিন্ন ভিন্ন আছে †। কিন্তু সংখ্যার অনৈক্য নাই, তবে নামান্তর হওয়ায়, অনৈক্যের কারণ নহে; কেননা দেশ বিভাগ ও দেশের নাম, সময় সময় যে, পরিবর্ত্তন হয় তাহাতে নামান্তর হইবার সম্ভব। যেমন পূর্ব্বকার দেশের নাম, বর্ত্তমানাবস্থায় নামান্তর হওয়া দেখা যায়, তদ্রূপ পুরাণের সংবাদকর্ত্তারা যে দেশের যে নাম, ও বর্ষ বিভাগ ক্রমে বর্ণন করিয়াছেন, বেদব্যাস ঋষি অবিকল তাহাই পুরাণ রূপে প্রস্তুত করেন। ইহাতে মূল শাস্ত্রের অনৈক্য হইতে পারে না। এবং মূল বক্তারা, যে সময়ে যে দেশের যে নাম থাকা জানিতেন তাহাই বলিয়াছেন। ইহা দোষের কারণ নহে। উপরে সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে চারিটী বর্ষ বলা হইয়াছে; ইহা সত্য যুগের অল্প

---

* ভারত, কিংপুরুষ, হরি, ভদ্রাশ্ব, কেতুমান, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, এই নয় বর্ষ।

† জম্বুদ্বীপে উপদ্বীপ ৮টী, তৎ যথা স্বর্ণপ্রস্থ; চন্দ্রশঙ্ক, সিংহল, আবর্ত্তন, পঞ্চজন্য, মন্দহরিণ, রমণক, লঙ্কা।

অবশেষ থাকেন সময়ে বলা হইয়াছে। কারণ ঐ গ্রন্থে লেখা আছে যে, ময় নামে দৈত্য, সত্য যুগের অল্প অবশেষ থাকিতে, সূর্য্যদেবের উপাসনা করাতে, সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া, বর দেন; তখন ময়, পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্রের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করে; তাহাতে সূর্য্যাংশ পুরুষ, ময় দৈত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত বলেন।* পুরাণ সকল দ্বাপর যুগের শেষে প্রস্তুত হওয়ায়, তৎকালীন দেশ বিভাগ ও নামান্তর হওয়াতে, বক্তারা কেহ দর্শন কালীনের, ও কেহ তৎ-কালের, বর্ত্তমান নাম উল্লেখে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব বিবেচনা করিলে কোন অনৈক্য না থাকা সিদ্ধান্ত হইতে পারে। উপরে যে গোলাকার পৃথিবীর কথা বলা হইল, তাহার সকলের উপরি ভাগকে ভূপৃষ্ঠ বলা যায়। এই ভূপৃষ্ঠে সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত দ্বীপ, এবং বর্ষ সকল থাকা বলা হইয়াছে। ইহার নিম্নে ক্রমাধীন সাতটী বিবর আছে তাহাতে সপ্ত পাতাল রহিয়াছে। যেমন পদ্মপত্র সকল একত্র করিয়া, তাহার মধ্য স্থানে একটী শলাকা বিন্ধিয়া দিলে যেরূপ হয়; সেরূপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে সুমেরু পর্ব্বত রহিয়াছে; ঐ পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া পদ্মপত্রের ন্যায় এক একটী পাতাল রহিয়াছে। যেমন উপরে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে একটী পদ্ম পত্রের ন্যায় সুমেরুর চারিদিকে পার্থিব অংশ আছে; তাহার উপর সপ্ত সাগর, ও সপ্ত দ্বীপ, এবং অন্যান্য পর্ব্বত ও নদ নদী প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং ইহাতে মনুষ্যাদিরা বাস করিতেছে; তদ্রূপ ইহার নীচে অতল পুরী আছে। তাহাও একটী পদ্মপত্রের ন্যায় সুমেরুর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে; তাহার নীচে নিতল, ও তাহার নীচে রসাতল, ও তাহার নীচে পাতাল; এইরূপ ক্রমাধীন তবকে তবকে পর পর সপ্ত পাতাল বিদ্যমান আছে। ইহা সমুদায় একত্রে একটী গোল পদার্থ। যেমন একটী কদম্ব কুসুম অথবা গোল লাটীম্ মধ্যে শলাকা, তদ্রূপ। এই পাতালে, দানব নাগ ও যক্ষ এবং রাক্ষসগণ বাস করে। বিষ্ণু পুরাণে আছে যে, যে প্রকার পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, একটী গোলাকার হয়, তাহার চারি দিকে দল নীচে উপর থাকে, মধ্য স্থানে কর্ণিকার থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীর মধ্য স্থানে ভূগর্ত্ত হইতে সুমেরু পর্ব্বত

* এই জন্য গ্রন্থের নাম সূর্য্যসিদ্ধান্ত অর্থাৎ সূর্য্য দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়॥

কর্ণিকার স্বরূপ উত্থিত হইয়াছে। তাহার গায়ে নীচে উপর সপ্ত পাতাল ও ভূপৃষ্ঠ আছে। ইহাতে পর পর সাতটী বিবর অর্থাৎ ফাঁক আছে।* ঐ দলের অর্থাৎ পাতালাদি সপ্ত পুরীর মধ্যে, এক এক পুরীর অগ্রভাগে যাহারা বাস করে, তাহারা চন্দ্র সূর্য্য কিরণ দেখিতে পায়†; আর যাহারা বিবরের মধ্যে সুমেরুর নিকটে বাস করে, তাহারা দেখিতে পায় না। সে স্থানে দিব্য ওষধি ও মণি প্রভৃতি উজ্জল পদার্থের আলোক বিদ্যমান থাকাতে, তত্রত্য লোকের কার্য্যসিদ্ধ হয়‡। সুমেরু পর্ব্বতের মূল দেশ কিছু সরু ও ক্রমাধীন যত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে ততই মোটা হইয়াছে। যেমন পদ্মকর্ণিকার মূল সরু উপর মোটা§। অথবা ধুস্তূর পুষ্পের ন্যায়, নিম্ন প্রদেশ সরু ও ঊর্দ্ধ দেশ মোটা তন্ন্যায় সুমেরু পর্ব্বত। ইহা প্রায় সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে অধোভাগ পাতাল পর্য্যন্ত স্থানকে ভূলোক বলা যায়; এবংপৃথিবীর উপর হইতে সুমেরু পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ সীমার নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত ভুবলোক বলা যায়; এই সুমেরু পর্ব্বতের উপরে দেবতারা বাস করেন, তাহার আধার সুমেরু বটে, তদবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত স্থানকে স্বর্লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক বলা যায়। এই স্বর্লোকের অন্তর্ভূত কয়েকটী লোক আছে। ইহার মধ্যে স্বর্গলোক কেবল সুমেরু পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে, ইন্দ্রপুরী নামে, ও দক্ষিণ ভাগে যমপুরী অর্থাৎ যমালয় নামে ও পিতৃলোক্ নামে আর একটী লোক বিখ্যাত রহিয়াছে। তাহার উপর মহর্লোক ও জনলোক, তপলোক, ও সত্যলোকসকল স্থির বায়ুর উপর আছে‖। ঐ সকল স্থান ক্রমে উপরি উপরি আছে। তাহাতে মহর্ষি ও সিদ্ধ যোগীগণ বাস করেন। ইহার সকলের উপর সত্যলোক, তাহাতে নানা পুরী আছে। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, ও গোলোক, এবং ব্রহ্মলোক, ও কালীলোক, ও দুর্গালোক, এবং শিবলোক প্রভৃতি সগুণ ও মূর্ত্তিধারী ঈশ্বরের

* বিবর শব্দ বলাতে বোধ হয় স্থানে স্থানে নীচে উপর মৃত্তিকায় বদ্ধ আছে, যেমন সালগ্রামশিলার চক্রকুহর, তন্ন্যায় সপ্ত পাতাল।

† বিষ্ণুপুরাণ।

‡ সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

§ কোঁপল বা পদ্মচাকা।

‖ তথায় জ্যোতির্ম্ময় অন্য পদার্থের দ্বারা আলোক হয়, চন্দ্র সূর্য্য দ্বারা নহে।

বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বর্গের উপর মহল্লোকের নিম্নে সূর্য্যলোক, ও চন্দ্রলোক, এবং নক্ষত্রলোক, ও ধ্রুবলোক, এবং গ্রহদিগের বসতি লোক সকল উপর্য্যুপরি বিদ্যমান আছে। এবং হিমালয় পর্ব্বতের উপর সুমেরুর শৃঙ্গসকল, এবং কৈলাস সর্ব্বত প্রভৃতি স্থান দেবতাদিগের ক্রীড়াস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; তাহাতেও কখন কখন দেবতারা বাস করেন। এই সকল বিষয় অনেক শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা গেল; তাহার সকল নাম উল্লেখ করায় গ্রন্থ বাহুল্য হইয়া পড়ে। এক্ষণে রাশিচক্রের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাশিচক্রের বিবরণ নির্ণয়।

সুমেরু পর্ব্বতের উপরে আকাশে, তেজ ও বায়ু দ্বারা নির্ম্মিত একটী চক্র আছে, ঐ চক্রকে রাশিচক্র অথবা নক্ষত্রচক্র বলা যায়। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, এই ২৭ সাতাইসটী নক্ষত্রকে, বার ভাগ করত প্রত্যেক ২।০ সওয়াদুই নক্ষত্রে এক একটী রাশি নির্ণয় হইয়াছে। অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এ বারটী রাশি, বিভক্তরূপে ঐ চক্রে আছে। ঐ চক্রে গ্রহদিগের পথ আছে। গ্রহসকল নীচে উপর ভাবে গতি করেন। চক্রে, সকলের নীচে চন্দ্রের পথ; তাহার উপর বুধ, তাহার উপর শুক্র, তাহার উপর সূর্য্য, ও উপরে উপরে পর পর মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনির পথ আছে; ও রাহু কেতু কখন নীচে কখন উপরে গতি করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, লোকালোক পর্ব্বতের উত্তর বৃত্তকে সুমেরু বলে, এবং দক্ষিণ বৃত্তকে কুমেরু বলে। এই দুই পর্ব্বতের অধিক উচ্চ স্থানে আকাশে দুইটী ধ্রুব তারা দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা নাবিকেরা রাত্রিকালে মহা-

সমুদ্রে দিগ নির্ণয় করে। ঐ দুইটী তারার মধ্যে উত্তরধ্রুব তারা এই দেশ হইতে দেখা যায়। ঐ দুই তারার মধ্য স্থানে নিম্নে গোলাকার পৃথিবী আছে। ইহার উপরে আকাশে ঐ রাশিচক্র বিদ্যমান আছে। উক্ত রাশি-চক্রে ৩৬০টী রেখা আছে। তাহার প্রতি রেখায় একটী দিন পরিমাণ হয়, ইহাকে সাবন দিন বলে। ইহার ত্রিশ দিনে একটী সাবন মাস হয়। বার মাসে এক বৎসর হয়। পৃথিবীর মধ্য স্থলের উপর সমসূত্র পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বমান একটী রেখা আছে, ঐ রেখাকে বিষুব রেখা বলে। আর একটী রেখা উত্তর দক্ষিণ লম্বমান আছে, তাহাকে ক্রান্তীপাত কহে। ঐ বিষুব রেখা, মধ্যসুমেরুর উপরিভাগে আছে। মেষ ও তুলা সংক্রমণে সূর্য্যদেব ঐ রেখা স্থানে উদয় হওয়াতে দিন রাত্রি সমান হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে, পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ মধ্যসুমেরুর সমসূত্র পূর্ব্ব পশ্চিম একটী রেখা টানিলে অর্দ্ধচন্দ্রাকার দক্ষিণে অসুরভূমি, ও উত্তর দিগে অর্দ্ধচন্দ্রাকার দেব-ভূমি* বলা যায়। ইহার উপরে রাশিচক্র প্রবহবায়ুতে ঘুরিতে থাকে। ঐ রাশিচক্র যখন উত্তর দিগে সরিয়া যায়, তখন উত্তরায়ণ বলে। এবং যখন দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়, তখন দক্ষিণায়ণ বলে। উত্তরায়ণে সূর্য্যদেব উত্তর দিগে ভ্রমণ, এবং দক্ষিণায়ণে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ হয়। কিন্তু বিষুব রেখা ও লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম করেন না। এবং চক্রটী প্রত্যহ একবার গতি করেন অর্থাৎ ভ্রমণ করেন। ইহাতে প্রত্যহ দ্বাদশ রাশি ঘোরে। বিষ্ণুপুরাণে বলেন যে, সূর্য্যদেবকে যখন প্রথম যে স্থানে দেখা যায়, তখন সেই স্থানে তাঁহার উদয় কল্পনা হয়; এবং যে স্থানে অদর্শন হয়, সেই স্থানে অস্ত কল্পনা হয়।† বাস্তবিক সূর্য্য সমভাবে রাশিচক্রের সহিত চলিতেছেন, তাঁহার উদয় ও অস্ত নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যহ রাশিচক্র যেমন ভ্রমণ করেন, তেমনি এক এক রেখা সরিতে থাকে, তাহাতে এক দিন হয়। যখন উত্তর দিগে সরে, তখন ঐ চক্র দক্ষিণ দিকে কিছু উচ্চ, ও উত্তর দিগে কিঞ্চিৎ নীচ ভাবে চলে। ও যখন দক্ষিণ দিকে সরে,

* এই দেবভূমি নাম মাত্র, ফলতঃ দেবতার বসতি স্থান নহে।

† কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্ব দিগে প্রথম দেখা যায় বলিয়া উদয়গিরিতে উদয় হওয়া বলে এবং পশ্চিম দিগে অস্ত হয় বলিয়া অস্তাচলে অস্ত বলা যায়।

তখন উত্তর দিগ উচ্চ, এবং দক্ষিণ দিগ নীচ ভাবে চলে। ইহাতে পাতাল সপ্তের অগ্রভাগ স্থানে আলোক হয়। পূর্ব্বে যে তিন শত ষাইট দিনে সাবন বৎসর বলা হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যদেবের শীঘ্র মান্দ্য গতি ক্রমে, যে রাশিতে যত দিন ভোগ করেন, তাহাকে সৌর দিন কহে। ঐ সৌরমানের ৩৬৫টী দিনে বৎসর হয়। এই কারণে সৌর বৎসরের সহিত সাবন বৎসরের বিভিন্ন হয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মতে, নক্ষত্রচক্র পূর্ব্ব দিগে ২৭ অংশ ও পশ্চিম দিগে ২৭ অংশ দোদুল্যমান হওয়াতে, মেষ রাশির প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত অর্থাৎ বিষুব রেখা হয়। ঐ রেখায় সূর্য্যদেব বৎসরে দুই দিন থাকেন। ঐ দুই দিন, দিনরাত্রি সমান হয়; ঐ রেখা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে, এক এক অংশ সরে, তাহাতে অয়নের দিনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ১৩৫৫ বৎসর পূর্ব্বে মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তির দিনে দিবা রাত্রি সমান ছিল। এক্ষণে ১০ই চৈত্র ও ১০ই আশ্বিন ঐরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে পৌষী সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ, ও আষাঢ়ী সংক্রান্তিতে দক্ষিণায়ণ হইত। এক্ষণে ১১ই পৌষ উত্তরায়ণ, ও ১১ই আষাঢ় দক্ষিণায়ণ হইতেছে। আমারদিগের এই প্রদেশে,উত্তরায়ণে দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং রাত্রির পরিমাণ অল্প হইতে থাকে; এবং দক্ষিণায়ণে দিনের পরিমাণ অল্প, ও রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ইহার কারণ, সূর্য্যদেবের মান্দ্য গতিতে দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, ও শীঘ্র গতিতে দিনের পরিমাণ অল্প হইতে থাকে। রাশিচক্র, যখন উপরে গতি করে, তখন আমারদিগের এ দেশে দিবস হয়, এবং নিম্নভাগে গতি করিলে, সূর্য্যদেব দূরবর্ত্তী অদর্শন হইয়া রাত্রি হইতে থাকে। রাশিচক্র ভ্রমণ করতঃ সূর্য্য যখন বিষুব রেখা স্থানে উপস্থিত হয়েন, তখন দিন রাত্রি সমান হয়। ঐ চক্র দক্ষিণাবর্ত্ত ও বামাবর্ত্তরূপে ঘোরে, তাহাতে শীঘ্র ও মান্দ্যগতি হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে, মেষাদি ছয় মাস দেবভাগে সূর্য্য দর্শন হয়, এবং তুলাদি ছয় মাসে হয় না; এইজন্য দেবভাগে ছয় মাস দিন, ও ছয় মাস রাত্রি।* এবং অসুরভাগে তুলাদি ছয় মাস সূর্য্য দর্শন

* ৬৬ বৎসর ৮ মাস অন্তর দিনের পরিবর্ত্তন হওয়াতে, পূর্ব্বে কর্কটের প্রথম দিন হইতে উত্তর দিগে সূর্য্য দর্শন হইত, ইহার পরিবর্ত্তনে কখন তুলাদি ষট্‌ক অদর্শন হয়।

হয় ; এবং মেষাদি ছয় মাস হয় না। ইহার কারণ রাশি চক্র উত্তরদিগে সরিয়া গেলে, দক্ষিণদিগে অনেকে দূরবর্ত্তী সূর্য্য হওয়াতে, তাহারা সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায় না ; সুতরাং ছয় মাস রাত্রি থাকে। তদ্রূপ রাশি চক্র দক্ষিণে সরিয়া গেলে ও উত্তরদিগে দূরবর্ত্তী স্থানে সূর্য্যের গতি হওয়াতেও ঐরূপ ঘটে * সূর্য্যদেবের দূর গমন, ও নিকট গমন প্রযুক্ত ভদ্রাশ্ব বর্ষে অস্ত হইলে, ভারতবর্ষে উদয় হয় ; সেই সময় কেতুমাল বর্ষে অর্দ্ধরাত্রি হয়, ও কুরুবর্ষে অস্তময় হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র ন্যূনাধিকরূপে চলে। সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোক প্রভৃতি যে সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে,তাহা জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অংশ স্বরূপ দেবতা ; অর্থাৎ কশ্যপের পুত্র সূর্য্য, ও অত্রির পুত্র চন্দ্র, ইহাঁরা যে স্থলে বাস করেন, তাহাকে সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোক বলে। পুরাণে আছে যে, সূর্য্যলোকের উপরে ঐ চন্দ্রলোক। কিন্তু রাশিচক্রের নীচে ; অর্থাৎ সূর্য্যের নীচে চন্দ্রের পথ, ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিরূপণ হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র, জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের নিম্নপথে গতি করেন।† ইহাতে শাস্ত্রের কোন অনৈক্য নাই। যেরূপ রাশিচক্র ভ্রমণ করে, তাহার সহিত স্ব স্ব পথে গ্রহগণও ভ্রমণ করেন। তাহারা শীঘ্র ও মান্দ্য, এবং বক্রগতিতে দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করেন। আপন গতিক্রমে ভ্রমণ করিতেছেন যে সূর্য্য, তাহার অধঃস্থল হইতে চন্দ্র নিঃসৃত হইয়া, প্রত্যহ, অর্থাৎ যতক্ষণে ১২ অংশ অন্তর গমন করেন, ততক্ষণ বা ততদণ্ড পলে, এক এক তিথি হয়। ইহাতে ১৮০ অংশ পর্য্যন্ত গমনে, শুক্লপক্ষীয় ১৫র তিথি হয়। এবং পূর্ণিমা স্থান হইতে ক্রমে ১২র অংশ আগমন করিতে করিতে, চন্দ্র সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন ; তখন কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি হয়। যখন সমসূত্রপাতের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের অধোভাগে গমন করেন, তখন অমাবস্যা হয়। শুক্লপক্ষে এক এক তিথিতে চন্দ্রের এক এক কলা অতি-

* উত্তরে ল্যাপলাণ্ড, এবং তাহার সমসূত্র দক্ষিণ দূর স্থানে ঐরূপ ঘটে তাহার নাম জানা যায় না। সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রত্যহ সূর্য্য দর্শন হয়, কেন না প্রত্যহ একবার ঐ স্থান দিয়া সূর্য্যের গতি হয়।

† তাৎপর্য্য এই চন্দ্র দেবতা ও জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র, এবং সূর্য্য দেবতা ও জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য ইহা প্রত্যেকেই দুই দুই প্রকার। এইরূপ সমুদায় গ্রহগণ।

রিক্তরূপে প্রকাশ হওয়ায় বর্দ্ধিত হয়। তদ্রূপ কৃষ্ণপক্ষে এক এক কলা অদর্শন হওয়াতে হ্রাস হইতে থাকে। কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লা সপ্তমী পর্য্যন্ত পিতৃলোকদিগের বাসস্থানে প্রত্যহ সূর্য্যদর্শন হয়; তৎপরে অদর্শন হয়। অমাবস্যার দিবস মধ্যাহ্ন সময় গত হয়।* এজন্য পিতৃলোকের একদিনে মনুষ্যের ১৫ দিন, ও একরাত্রিতে ১৫ রাত্রি হয়। কিন্তু শাস্ত্রে বলে যে, পিতৃলোকের কৃষ্ণপক্ষ দিন, ও শুক্লপক্ষ রাত্রি, ইহা ক্রমশ অয়নের গতি ক্রমে ন্যূনাতিরেক হইতে পারে।† রাহুর গতি ক্রমে, যে সময় চন্দ্র অথবা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার ছায়াতে গ্রহণ হয়। যে পরিমাণ ছায়াতে যত অংশ অদর্শন হয়, তত অংশ গ্রাস বলা যায়। এই গ্রাসকে ভক্ষণ বলা যায় না, কারণ শাস্ত্রে তাহা বলেন নাই। যেরূপ মেঘের ছায়াতে চন্দ্র সূর্য্য অদর্শন হয়, তদ্রূপ হইয়া থাকে এই সমুদায় বিষয় সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে লেখা গেল। ইহা গ্রন্থে লিখিয়া সম্যক বুঝা-ইয়া দেওয়া সুকঠিন; তবে যন্ত্র প্রস্তুত করিলে, বিলক্ষণ বুঝান যায়। ঐ যন্ত্রের বিষয় সূর্য্যসিদ্ধান্তে গ্রন্থে লিখিত আছে। যদি কেহ তদ্দৃষ্টে যন্ত্র প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সম্যক জ্ঞাত হইতে পারেন। ভগবদ্গীতা ও অধিকরণ-মালা দৃষ্টে জানা যায় যে, দেবলোক সুমেরুপর্ব্বতের উপরে আছে। সূর্য্যদেব প্রত্যহ তাহার উপরে ভ্রমণ করাতে, প্রত্যহ সর্ব্বদা সূর্য্যের আলোক তথায় হয়। কিন্তু দক্ষিণায়নে ঐ স্থানে ধূমাভিমানিনী দেবতা হইতে, একটী ধূম উত্থিত হয়, তাহাতে সূর্য্য ছয় মাস দর্শন হয় না; এবং উত্তরায়নে ঐ ধূম থাকে না। তাহাতে তখন দিবস বলিয়া জানা যায়; ইহা অনৈক্য নহে; কারণ বিষুব রেখা সুমেরুর উপরে থাকে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে; সূর্য্যদেব ঐ রেখা অতিক্রম করেন না। তাহাতে রাশিচক্র দক্ষিণে সরুক, বা উত্তরে সরুক তথায় সূর্য্য দর্শনের কোন প্রতিবন্ধক নাই; তবে ধূম প্রতিবন্ধক হইতে পারে।‡ অতঃপর বিরুদ্ধ মত সকল আলোচনা

* এইজন্য অমাবস্যায় শ্রাদ্ধবিধি হইয়াছে।

† চন্দ্রগমনকালে সমুদ্রের নিকটস্থ হইলে তাহার আকর্ষণে জোয়ার হয় ও দূরস্থ হইলে ভাটা হয় তিথিবিশেষে চন্দ্র হ্রাস বৃদ্ধি হেতুক জোয়ার ভাটার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

‡ এই গ্রন্থে পৃথিবী, ও দ্বীপ, এবং সমুদ্র, পর্ব্বত, এবং গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিচক্রের পরিমাণ

করা যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন সূর্য্যদেবের গতি নাই পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইহা সঙ্গত কিনা তাহা বিবেচনা করা যাউক।

সপ্তম অধ্যায়।

পৃথিবী ভ্রমণ করে কি না অর্থাৎ ঘোরে কি না তদ্বিষয়ক বিচার।

কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবীর শূন্যের উপর উলুতপ্লুত অর্থাৎ উল্‌টা পাল্‌টা নীচে উপর ভাবে ঘুরিতেছে*। সূর্য্যদেবের গতি নাই, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা বড় পদার্থ। এই কথা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ বিধায় বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কারণ শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা, পৃথিবীর যে প্রকার স্থিতি ও অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবী ঘোরার কোন কারণ নাই। বরং পৃথিবী সমুদায় বস্তু ধারণ করিয়া থাকায় তাহা উলুতপ্লুত অর্থাৎ উলটা পাল্‌টা নীচে উপর ভাবে ঘোরা অসম্ভব। সে যাহা হউক পৃথিবী ঘোরার কারণ কি? যদি বলা যায় ঈশ্বরের কার্য্য তিনি সকলই পারেন। কিন্তু ঈশ্বর পারেন বলিয়া, পৃথিবী ঘুরাইবার কারণ অনুমান হয় না। যদি বল যে, ঈশ্বরের কার্য্যের কারণ অনুমাণ করার প্রয়োজন নাই। তবে পৃথিবী ঘোরে না উহা কূর্ম্ম ও অনন্তের উপর আছে, ইহা অনুমান কি জন্যে না হইবে? বরং শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থূল জল, তাহার উপর ভাসমান কূর্ম্ম, ও তাহার উপর অনন্তদেব দণ্ড পূরণ করত মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। ইহা সম্ভব ও সঙ্গত বটে, কেন না ঈশ্বরের কার্য্য সকল যাহা দেখা যায়, তাহা কার্য্য কারণ অনুযায়ী সম্ভবমত নিয়মাধীন

সকল নিশ্চয় করিয়া শাস্ত্র সকল এক বাক্য করা অনেক বাহুল্য ব্যাপার জন্য লেখা হইল না, বিশেষতঃ মাস পক্ষ অয়ন ঋতু সর্বদা পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া নিশ্চয় হয় না। এবং শীত গ্রীষ্মের প্রকৃতি কারণ নিশ্চয় করিয়া লেখা অনেক বাহুল্য বলিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল।

* এই মত, আর্য্যভট্ট নামক্ আধুনিক গ্রন্থকার ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া কেহ গ্রহণ করেন নাই। ঐ মতটী বিদেশীয় পণ্ডিতেরা শিক্ষা করিয়া তাহা প্রবল বিবেচনা করিয়াছেন; পরে স্বমত বলিয়া বিস্তার করিয়াছেন।

চলিতেছে। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তি অবিশ্বাস করিয়া, যে বৃহৎ পার্থিব পদার্থ শূন্যের উপর অকারণে ঘুরিতেছে, এই অসঙ্গত কথা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য*। তবে যদি বলা যায় যে, পৃথিবী গোলাকার বস্তু তাহা স্বভাব বশতঃ ঘোরে; ইহা সঙ্গত নহে। কারণ পৃথিবীর উপর পর্ব্বত সংলগ্ন থাকায় তাহা সুগোল নহে, এবং স্বভাববাদীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান মান্য করেন না; ও পৃথিবী ঘোরার বিষয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু নাই, তবে অনুমান করিতে হইলেও, তাহার হেতু ও দৃষ্টান্ত কিছুই দেখা যায় না; বরং বিপরীত অনুমান হয়। কারণ বস্তুর যে স্বভাব, তাহা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বস্তুতে থাকা সম্ভব; যেমন অগ্নিরাশির স্বভাব দহন করে; তাহার ক্ষুদ্র অংশেও দাহিকাশক্তি আছে, তাহাতেও দহন করে। তদ্রূপ পৃথিবীর ঘোরা স্বভাব থাকিলে, তাহার ক্ষুদ্র অংশেও তাহা থাকিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষুদ্র অংশ মৃত্তিকারাশিকে গোলাকার করিয়া রাখিলে; অথবা লোষ্ট্র অর্থাৎ ঢেলা একটুও ঘোরে না। ইহাতে পৃথিবীর ঐরূপ স্বভাব অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। পরন্তু যদি বল যে, সমুদায় মৃত্তিকা একত্র হইলে ঘোরে, কিয়দংশ স্থানান্তরিত হইলে তাহা ঘোরে না। কিন্তু কিয়দংশ স্থানান্তরিত হইলে অবশিষ্টাংশও সমুদায় হইল না ইহাতে নির্জীব পদার্থের অবশিষ্টাংশও ঘুরিতে পারে না। ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত সজীব পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির সহিত হইতে পারে না। যদি বল যে, পৃথিবী আকর্ষণী শক্তিতে ঘুরিতে থাকে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, আকর্ষণী শক্তিতে ঘোরা সম্ভব নহে; এবং বায়ু ভিন্ন পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ সচলা শক্তিও নাই যে, তাহা স্বয়ং ঘুরিতে পারে। বরং বায়ুর সচলা শক্তিও তাহাতে আকর্ষণী শক্তি থাকা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। এবং তেজে অধিক বায়ু মিশ্রিত থাকায়, ঐ পদার্থ লঘু প্রযুক্ত সচল হইতেছে। তবে জল ও পৃথিবীতে বায়ু মিশ্রিত আছে, তাহাতে বায়ুর অল্পাংশ থাকাতে এবং ঐ দুই পদার্থ অধিক গুরু বিধায়, তাহা অচল; বরং জল অপেক্ষা পৃথিবীর অধিক গুরুত্ব থাকায়, তাহা নিতান্ত অচলরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।† এবং জল নিম্নগ, নিম্নের দিগে চলে বলিয়া জলের স্রোত দেখা যায়।

---

* সসাগরা সপর্ব্বতা মৃত্তিকাভাগকে পৃথিবী বলা যায়। অমরকোষে ভূমি বলিয়াছেন।

† অমরকোষ অভিধানে পৃথিবীকে অচলা বলিয়াছেন। তদ্রূপ অন্য শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে।

এবং বায়ু দ্বারা তাহার তরঙ্গাদি হইতে থাকে। ইহাতে বায়ুর নানা প্রকার গুণ থাকা উপলব্ধি হয়; এবং শাস্ত্রে বায়ুর নাম সদাগতি, গন্ধবহ, ও আশুগ বলা হইয়াছে। ও কার্য্যতও তাহাই দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, বায়ু কোন বস্তুর আঘাত ব্যতীত চলে না; তাহা সঙ্গত নহে। কারণ বায়ু যে, সর্ব্বদা মান্দ্য ও প্রবল গতিক্রমে চলিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; তবে কখন কখন পাখাদ্বারা আঘাত করিলে, বায়ু অধিক চালিত হয় বটে, ইহা যে স্থানে বায়ুর মন্দগতি থাকে, সেই স্থানেই হয়। কিন্তু যেখানে প্রবল ঝটিকা বহিতে থাকে, তথায পাখাদ্বারা আঘাত করিলেও বিপরীত দিকে চালিত হয় না। অতএব স্বতঃসিদ্ধ সচল শক্তি কেবল বায়ুর আছে, তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থের নাই। তবে যদি বলা যায় যে, বায়ু সকল পদার্থেই মিশ্রিত আছে; যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র এবং পৃথিবী প্রভৃতি সকল পদার্থে বায়ু থাকাতে এবং ঐ সকল বস্তু পরস্পর আকর্ষণ গুণে শূন্যের উপর থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভব হইলেও পৃথিবী স্বয়ং ঘোরা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ আরও কএকটী কারণে অনুভব হয় যে, পৃথিবী ঘোরে না। কেন না সূর্য্যদেব যে দিকে আছেন, সেই দিক্‌কে উর্দ্ধ বলা যায়। ঐ উর্দ্ধদিকে একটী উত্তর ধ্রুব তারা দেখা যায়, ঐ তারাটীর সন্ধ্যার সময় হইতে প্রত্যূষকাল পর্য্যন্ত একস্থানে সমভাবে থাকাও দেখা যায়। এবং সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হইলেও দিবাভাগে ঐ স্থানে ঐ তারাটীর অচলভাবে থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি পৃথিবী উলুটিয়া ঘোরে, তবে রাত্রিকালে যেরূপ দূরস্থিত সূর্য্যদেব আমাদিগের অদর্শন হয়েন; তদ্রূপ ধ্রুব তারাও অদর্শন হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হয় না। আরও একটী বেলুনযন্ত্র* এখান হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আবার এই স্থানে পতিত হয়; যদি পৃথিবী ঘোরে, তবে ঐ যন্ত্র যতক্ষণ উত্থিত ও পতিত হয়, ততক্ষণে পৃথিবী সরিয়া যাওয়ায়, ঐ যন্ত্র অভিমত স্থানে না পড়িয়া, অন্য স্থানে পতিত হইবার সম্ভব। যদি বল যে, পৃথিবী যেরূপ ঘুরিতেছে, তাহার সঙ্গে বায়ু ঘুরিতেছে, ইহাতে যন্ত্র, বায়ুর সহিত ঘুরিতে থাকায় স্বস্থানে

* বেলুনযন্ত্র নূতন নহে, মহাভারতের অন্তর্গত হরিবংশে আছে যে, শৈল্য রাজা ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া যবনরাজার নিকটে গমন করিয়াছিলেন।

পতিত হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবী পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে থাকায়, বায়ু পূর্ব্বাভিমুখে অথবা পশ্চিমাভিমুখে চলিতে পারে; এবং এই বৃহৎ পদার্থের সহিত বায়ু চলিতে থাকায়, প্রবল ঝড়রূপে বায়ু বহিবার সম্ভব। তাহা হইলে ঐ যন্ত্র দক্ষিণ অথবা উত্তরদিকে যাইতে পারে না; সর্ব্বদা পূর্ব্বাভিমুখে যাইবার সম্ভব থাকায়, বেলুন-যন্ত্র অভিমত স্থানে যাতায়াত করিতে পারিত না। এবং গোলা, ও গুলল, এবং তীর প্রভৃতি ঐ রূপ ঊর্দ্ধে উঠিলেও তাহা ঐ রূপ হইতে পারে; এবং মেঘ দুই তিন দিন এক স্থানে সমভাবে থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ পৃথিবী উলুটিয়া ঘুরিলে, পৃথিবীর উপর যে সকল নির্জীব পদার্থ কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রস্তর, যাহা পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন নাই, তাহা অবশ্যই নিম্নের শূন্যভাগে পড়িতে পারে। যদি বল যে, একটী কোলা অথবা জালাতে একটী পিপীলিকা থাকিলে ঐ জালাটী ঘুরাইলে পিপীলিকা পড়ে না? তদ্রূপ পৃথিবী বৃহৎ পদার্থ ঘুরিলেও তাহার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র পদার্থ পড়ে না, তাহা পৃথিবীর আকর্ষণে থাকে। কিন্তু জালার উপর পিপীলিকা সজীব পদার্থ, তাহার নিজের আকর্ষণে থাকে বলিয়া পড়ে না; উহা জালার আকর্ষণ নহে। কেন না ঐ জালার উপর একটী ক্ষুদ্র ঢেলা, অথবা ক্ষুদ্র প্রস্তর কণিকা রাখিলে, জালা ঘোরার সময় তাহা থাকে না; তদ্রূপ সূর্য্যের বিপরীত দিকে গমন সময়ে, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে অসংলগ্ন কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি থাকিতে পারে না; নিম্নের শূন্যভাগে পড়িয়া অদর্শন হইতে থাকে। পরন্তু পৃথিবী ঘোরার সময় বায়ু প্রবলরূপে বহিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তৎকালীন স্বাভাবিক বায়ুতে ঝড় হইতেও পারে; তাহাতে ঐ সকল পদার্থ যে স্থানান্তরে পড়িতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন না পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা, বায়ুর আকর্ষণ বলবত্। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যখন প্রবল ঝড় হইতে থাকে, তখন পৃথিবীর সংলগ্ন বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া স্থানান্তরিত করে; তখন পৃথিবীর আকর্ষণে, ঐ বৃক্ষ স্বস্থানে থাকে না। অতএব তৎকালীন অসংলগ্ন পদার্থ যে স্থানান্তরে যাইতে পারে না, তাহা যুক্তি অনুসারে বিশ্বাস্য নহে; বরং স্থানান্তরে যাওয়ারই নিতান্ত সম্ভব। বিশেষতঃ দক্ষিণাভিমুখী-নদী ও সমুদ্রের জল প্রত্যহ তীরে উত্থিত হইয়া, জলপ্লাবন হওয়ারও সম্ভব; কেন না একদিক উচ্চ হইলে, জল নিম্নদিকে

যাইতে পারে। আরও কথিত আছে যে, পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য বৃহৎ পদার্থ, তাহা হইলে তাহার আকর্ষণে পৃথিবীর ঊর্দ্ধভাগে উঠিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর নিজের মাধ্যাকর্ষণে, ও গুরুত্ব গুণে, ও অন্যান্য গ্রহগণের আকর্ষণ প্রযুক্ত, সূর্য্যমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হয় না। এইরূপ পরস্পর আকর্ষণে স্বস্থানে থাকিয়া আহ্নিক ও বার্ষিক গতিক্রমে ঘুরিতে থাকে; ইহাও অসঙ্গত।* কেননা পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য বড় হইলে পৃথিবী সর্ব্বদা সূর্য্যমণ্ডলের নীচে থাকা সম্ভব; সূর্য্যমণ্ডলকে অতিক্রম করিয়া দূরে যাওয়ার সম্ভব নহে; তাহাতে আহ্নিক গতিতে দিবা রাত্রি হওয়ার সম্ভব আছে বটে, কারণ যখন উলুটিয়া উপরের ভাগ নিম্ন দিকে যায়, তখন সূর্য্য অদর্শন হইয়া পড়ে। কিন্তু কোন প্রদেশে ছয়মাস সূর্য্য অদর্শন হওয়ার সম্ভব থাকে না; কারণ বৃহৎ পদার্থের নিম্নে যে পদার্থ থাকে, তাহাতে বৃহৎ পদার্থ সর্ব্বদা সমভাগে দৃষ্ট হইতে পারে; তাহার নিকট বা দূর হইতে পারে না; অর্থাৎ সকল কেন্দ্র হইতেই বৃহৎ সূর্য্য পদার্থের আলোক প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল যখন উলুটিয়া পড়ে, তখন বিপরীত দিকে দর্শন হয় না, এজন্য রাত্রি হয়। যদি বলা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলের কেবল নিম্নস্থানে পৃথিবী ঘোরে না, তাহা সূর্য্যমণ্ডলের দূরবর্ত্তী স্থান দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে চলে; তাহাও অসম্ভব, এবং ইহাতেও বক্তব্য যে, দূরবর্ত্তী স্থান দিয়া চলিলেও, একটী গোলাকার কাল্পনিক রেখার উপর দিয়া চতুর্দ্দিক সম্বৎসরকালের মধ্যে ঘুরিয়া আইসে, ইহাতেও ছয় মাস নিকট অথবা ছয় মাস দূর হইবার সম্ভব নহে; তবে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন কিরূপে হয়? অতএব এই কারণে সূর্য্য, পৃথিবী বৃহৎ থাকাও স্বীকার করা যায় না; এবং সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী শূন্যের উপর থাকাও সঙ্গত হয় না। কেন না পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য বৃহৎ না হইলে তাহার আকর্ষণে পৃথিবী স্ব স্থানে থাকিতে পারে না; বরং পৃথিবীর গুরুত্ব থাকায় ক্রমশ অধিক দূরে নিম্নে গতি হইয়া সূর্য্য অদর্শন হয়। অথবা মাধ্যাকর্ষণে সূর্য্যকে পৃথিবী সংলগ্ন করে; এজন্য কোন ক্রমেই পৃথিবী শূন্যের উপর আকর্ষণ গুণে থাকিয়া ঘোরা সম্ভব হইতেছে না। যদি কেহ

* পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য বড় হইলে সূর্য্যের উপর যে সকল গ্রহ আছে তাহাও দর্শন হয় না, এবং তাহাদিগের আকর্ষণ পৃথিবীতে লাগে না।

এই সকল কথা কুতর্কের দ্বারা খণ্ডন করণের চেষ্টা করেন, তবে তাহার সেই কুতর্ককে আমি খণ্ডন করিতে অপরাগ নহি, কেন না অহেতুক অনুমান যে মত করিতে পারে তাহাই হইতে পারে। তবে যদি বল যে পৃথিবী স্থির থাকার বিষয়, শাস্ত্রযুক্তি অনুসারেই সম্ভব কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, পৃথিবী অনন্ত দেবের মস্তকে থাকায়, সুতরাং তাহার আধার আছে। ঐ অনন্তের আধার কূর্ম্ম, তাহার আধার জল, তাহার আধার ডিম্ব, তাহার আধার ঈশ্বর; এমতাবস্থায় সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইলেও কোন আকর্ষণের প্রয়োজন নাই। গুরু পদার্থ পৃথিবী, তাহা অচলা থাকাই সম্ভব; বরং তেজ পদার্থ রাশি চক্র ও গ্রহ নক্ষত্র সকল লঘু বিধায়, প্রবহ বায়ুতে ঘোরাই সম্ভব। এবং চক্র মণ্ডল ক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে, এক এক অংশ সরিয়া, উত্তর দিকে বিষুব রেখা পর্য্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া ছয় মাস উত্তরার্দ্ধে, ও ছয় মাস দক্ষিণার্দ্ধে, ঘুরিতে থাকে। তাহাতে যে ছয় মাস উত্তরার্দ্ধে সূর্য্য ঘোরেন, সেই ছয় মাস দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রের নিকটস্থ প্রদেশের লোকের দূরবর্ত্তী স্থানে সূর্য্য থাকাতে তাহাদিগের অদর্শন হয়। ও যে ছয় মাস দক্ষিণার্দ্ধে ঘুরিতে থাকেন, তখন উত্তর কেন্দ্রবাসীগণের দূরবর্ত্তী স্থানে সূর্য্য থাকাতে তাহাদিগেব অদর্শন হয়। ইহাতে কোন অসম্ভব অথবা অসংলগ্নের বিষয় নাই*। অতএব এই সকল কারণে আমাদিগের ত্রিকালজ্ঞ দেবতা ও ঋষিগণকর্ত্তৃক যে শাস্ত্র প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আমরা সমধিক মান্য ও বিশ্বাস করি। এবং প্রত্যহ পূজার সময়, আধারশক্তি, ও কূর্ম্ম এবং অনন্ত ও পৃথিবীর পূজা করিয়া থাকি বলিয়া বিরুদ্ধমত অবলম্বন করিতে পারি না। তবে কেহ বলেন যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবী ঘোরে, কিন্তু তাহা নহে; কেন না সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে ঐ রূপ কথা নাই। তাহাতে যে বচন আছে, তাহা অবিকল নিম্নে লেখা যাইতেছে; এবং পূর্ব্বে যে সকল মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ঐ মতানুসারে লেখা হইয়াছে। তবে সকলের ভ্রম দূরীকরণার্থে অবিকল বচন লেখা গেল।

* যদি শূন্যের উপরে পৃথিবী ঘুরিতে পারে, তবে শূন্যের উপর ব্রহ্মাণ্ডও থাকিতে পারে তাহা অসম্ভব নহে।

মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাং।

ভূগোল অধ্যায়, ৩২ শ্লোক।

গূঢ়ার্থ টীকা। অণ্ডস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্তাৎ সর্ব্ব প্রদেশান্মধ্যে মধ্য স্থানে কেন্দ্র রূপ আকাশে ভূগোলস্তিষ্ঠতি। নমু আকাশে নিরাধার বস্তুনো অবস্থানাসম্ভবাৎ কথমবস্থিতো ভূমি গোল ইত্যতো ভূগোল বিশেষণ মাহ। বিভ্রাণ ইতি ব্রহ্মণঃ পরমাং শক্তিং ধারণাত্মিকাং বিভ্রাণো ধারয়ন্ তথাচ নক্ষতিঃ।

ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, মধ্য স্থানে পরমেশ্বরের ধারণাত্মিকা শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আকাশমার্গে ভূগোলরূপ এই পৃথিবী অবস্থিতি করিয়া আছেন। এই ধারণাত্মিকা শক্তি শব্দে আধার শক্তি, অর্থাৎ অনন্ত ও কূর্ম্ম এবং জল প্রভৃতি বুঝাইবেক। কেন না অন্যান্য শাস্ত্রে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাহার সহিত এক বাক্য করা যাইতে পারে। ইহাতে পৃথিবী ঘোরার কোন ছন্দাংশও নাই। বরং তিষ্ঠতি শব্দ থাকাতে, যে পৃথিবী ঘোরে না ইহা সর্ব্বতোভাবে বোধ হয়। তবে বিভ্রাণঃ শব্দ থাকাতেই অনেকেই তাহার অর্থ করেন যে, ভ্রমণ হইতে পারে; কিন্তু তাহা ভ্রম। কেন না ঐ শব্দে কখন ভ্রমণ বুঝায় না; বরং ধারয়ন্ অবলম্বন করা বুঝায়। বিশেষতঃ তিষ্ঠতি শব্দে পরিষ্কার অর্থ হয় যে, স্থিতি আছে। তবে আকাশে আছে এই শব্দের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ধারণাত্মিকা শক্তি যে অনন্ত আছেন, তাহার যে আকার সে মায়িক; অর্থাৎ ভগবান ঈশ্বর স্বয়ং ঐ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধারণাত্মিকা শক্তি হইয়াছেন। তাঁহার মস্তকে আকাশমার্গে, অর্থাৎ জল ভিন্ন স্থানে পৃথিবী আছে, কেবল আকাশে নহে। কেন না যদি অনন্তকে লক্ষ্য করিয়া কেবল আকাশে থাকা বলিতেন, তাহা হইলে ধারণাত্মিকা শক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকার কথা বলিতেন না*। অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণে পৃথিবী ঘোরা বিশ্বাস হয় না। যদি কোন দেশের প্রাচীন প্রচলিত

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে এই পৃথিবী যখন উৎপত্তি হয়, তখন শূন্যের উপর ছিল; কিন্তু ক্রমে জলে মগ্ন হওয়ায়, ধারণাত্মিকা শক্তি অনন্ত দেবকে অবলম্বন করিয়া শূন্যেতে আছে।

ধর্ম্ম শাস্ত্রে পৃথিবী ঘোরার বিষয় লেখা থাকে, তবে তাঁহারা ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন; তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। কেন না ধর্ম্মশাস্ত্র অতি পবিত্র; তাহা যে দেশের হউক না কেন, তাহাতে ঈশ্বরের কার্য্য সকল বর্ণিত আছে। এবং ঈশ্বরের কার্য্য কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি পৃথিবীও ঘুরাইতে পারেন; এবং তাহাকে স্থির রাখিয়া রাশিচক্র ঘুরাইতে পারেন, এবং তিনি দুই প্রকার ভক্তকে এক কালে ঐ দুই প্রকার কার্য্য দেখাইতে পারেন; তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে, সরলভাবে যিন যে শাস্ত্র মান্য করেন; ও তদনুসারে ঈশ্বরের নিয়ম, অথবা কার্য্য বলিয়া যাহা বিশ্বাস করেন; তৎপ্রতি দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপরীত স্ব কপোল কল্পিত কথা অকর্ম্মণ্য; কেন না কেবল বুদ্ধির দ্বারা, যিনি যাহা বলুন না কেন, তাহা কথনই অভ্রান্ত হইতে পারে না। উপরি উক্ত তর্কের সারাংশ আলোচনা করিলে, জানা যায় যে, মাস, পক্ষ, অয়ন ও দিবা রাত্রির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে উভয় মত ঐক্য আছে। কেবল পৃথিবী শূন্যের উপর ঘুরিতেছে কি তাহা স্থির আছে। কেবল রাশিচক্র ও চন্দ্র সূর্য্যাদি ঘুরিতেছে এই মাত্র প্রভেদ। তাহাতে বিরুদ্ধ মতে কথিত আছে যে, দ্বাদশ রাশি পৃথিবীতে সংলগ্ন ও তাহা পৃথিবীর সহিত ঘুরিতেছে। আমাদিগের মতে রাশি চক্র স্বতন্ত্ররূপে ঘুরিতেছে। যদি ঐ রাশি ঘোরাকে পথিবী ঘোরা, ও বিরুদ্ধবাদীরা ভূমি ভাগ ত্যাগ করিয়া রাশি চক্র ঘোরাকে, পৃথিবী ঘোরা স্বীকার করি, ও করেন, তবে উভয় মত একই হইয়া পড়ে। এই বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ না করিয়া, উভয় মতজ্ঞ ব্যক্তি পক্ষপাত শূন্য হইয়া দেখিলে জানিবেন যে, রাশিচক্র তেজ পদার্থ ও লঘু; তাহাই সম্ভবত ঘোরে। ভূমি গুরু পদার্থ, একারণে কাহাঁরও কোন সাহায্য ব্যতীত ঘোরা সম্ভব নহে। ইহাতে আর অধিক বাদানুবাদ অপ্রয়োজন বিধায় ক্ষান্ত হওয়া গেল। এক্ষণে পৃথিবীর স্থিতি কাল নির্ণয় করা যাইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

পৃথিবীর স্থিতির কাল নির্ণয়।

আমাদিগের শাস্ত্রে দিন মাস বৎসর, নানা প্রকার বলা হইয়াছে; অর্থাৎ সাবন, ও সৌর, এবং মুখ্যচান্দ্র, ও গৌণচান্দ্র, প্রভৃতি দিন মাস বৎসর মান্য কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহার বাহুল্য ভাগ ত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। মনুর ১ম অধ্যায়ের ৬৮টী শ্লোক হইতে কএক শ্লোকের মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে। চক্ষুর যে নিমেষ পড়িতে থাকে, তাহার অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠাতে এক কলা. ত্রিশ কলাতে এক মুহূর্ত্ত হয়, এক মুহূর্ত্তে দুই দণ্ড হয়। ৬০ পলে দণ্ড হয়, ৬০ বিপলে এক পল হয়*। ত্রিশ মুহূর্ত্তে মনুষ্যের এক দিবা ও রাত্রি হয়। ইহার ত্রিশ দিন ও রাত্রিতে পিতৃলোকের এক দিন ও রাত্রি। মনুষ্যের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন ও রাত্রি হয়। এই দেব পরিমাণের চারি হাজার বৎসর সত্য যুগের পরিমাণ; এবং তাহার প্রথম সন্ধ্যা চারি শত বৎসর; ও শেষ সন্ধ্যাংশ চারি শত বৎসর। ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর, তাহার সন্ধ্যা, ও সন্ধ্যাংশ ছয় শত বৎসর। দ্বাপর-যুগের পরিমাণ দুই হাজার বৎসর, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ চারি শত বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ হাজার বৎসর, ও তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর। সাকুল্যে এই চারি যুগে ১২ বারো হাজার বৎসর হয়। ইহাতে দেবতাদিগের এক যুগ, ইহার ৭১ যুগের কিঞ্চিৎ অধিকে এক মন্বন্তর হয়। মনু চতুর্দ্দশ, যথা সায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তাম, তামস রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, সাবর্ণি, রৈব্য, ধর্ম্ম সাবর্ণি, ও ভৌত্য। বিষ্ণু-পুরাণে এই চতুর্দ্দশ মনুর নাম, ও কার্য্য, বিস্তারিত রূপে লেখা আছে।. এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে দেব পরিমাণের এক হাজার যুগ হয়। দেব পরিমাণে এক

---

* ত্রিশ মুহূর্ত্ত ও ৬০ পল একই হইতেছে, ইহা সাবন দিন গণ্য করা যায়, গণনা বিষয়ে সাবন দিন প্রামাণ্য।

হাজাব যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। এবং ঐ কাল পরিমাণ এক রাত্রি হয়। দিবসে সৃষ্টি করেন, রাত্রিকালে লয় করেন; এই তাঁহার নিত্য স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য। যদ্যপি নিরাকার পরমেশ্বরের দিবা রাত্রির সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাঁহার কার্য্যকাল, ও বিশ্রাম কালকে, শাস্ত্রকারেরা দিবা রাত্রিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং প্রলয় কাল তাঁহার নিদ্রাবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা বর্ণনা মাত্র; পরমেশ্বর স্ব প্রকাশ স্বরূপ, তিনি ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান কালত্রয়ে, সমভাবে বিরাজমান আছেন। উপরে যে দেব পরিমাণের বৎসর বলা হইয়াছে, তাহাতে কলিযুগের পরিমাণ ১ হাজার বৎসর, ও তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর বলা হইয়াছে। ইহাতে মনুষ্য পরিমাণের সাবনমতে চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর হয়। কেন না মনুষ্যের এক বৎসর অর্থাৎ ৩৬০ দিনে দেবতাদিগের ১ দিন হয়; সুতরাং দেবতাদিগের এক বৎসয় মনুষ্যের ৩৬০ বৎসর হইবেক। তাহা হাজারের সহিত গুণ করিলে তিন লক্ষ ষাইট হাজার বৎসর হয়। এবং তাহার সহিত সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ যোগ করিলে, তাহার এক বৎসরে ছত্রিশ হাজার বৎসর হয়। তাহার দুই শত বৎসরে বাহাত্ত হাজার হওয়াতে, উহা তিন লক্ষ্য ষাইট হাজারের সহিত যোগ কবিলে চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার হইবেক। এইরূপ দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮ লক্ষ চৌষট্টি হাজার ও ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার। ও সত্যযুগের পরিমাণ ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর হয়। ইহাতে স্থিতির কাল নিরূপণ করা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রলয় কত প্রকার ও তাহা কিরূপে হয় তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

নবম অধ্যায়।

প্রলয় নির্ণয়।

প্রলয় প্রধানতঃ চারি প্রকার; বিষ্ণুপুবাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা এই, মন্বন্তর প্রলয়, দৈনন্দিন প্রলয়, এবং প্রাকৃতিক প্রলয়, অর্থাৎ মহাপ্রলয়*

* দৈনন্দিন প্রলয়কে কল্প, ও মহাপ্রলয়কে মহাকল্প বলা যায়। কিন্তু উভয়কেই কল্প বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে ব্যাখ্যা আছে।

ও আত্যন্তিক প্রলয়, অর্থাৎ মুক্তিরূপ প্রলয়; ইহার মধ্যে আত্যন্তিক প্রলয়, জীব বিশেষের হয়। ইহা সাধারণ জগতের সহিত কোন সংস্পৃষ্ট নাই। জগৎ সংসার বর্ত্তমান থাকিতেই সর্ব্বদা জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং সে জীব, প্রলয় যাতনা ভোগ করে না। অর্থাৎ তাহার আর জন্ম হয় না। তবে যুগ প্রলয়, যুগান্তে যুগ হয়; তৎসমুদায় লেখা বাহুল্য*। এক্ষণে তিন প্রকার প্রলয় বিস্তারিত রূপে লেখা যাইতেছে। দেব পরিমাণের ৭১ যুগের কিঞ্চিৎ অধিক, পাঁচ হাজার ১ একশত বেয়াল্লিষ দেব পরিমাণ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কালে এক মনু গত হইয়া, প্রলয় হয়।† ৭১ যুগের অধিককাল যাহা উপরে বলা হইল, ঐ কাল মন্বন্তরের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ; এইজন্য কোন শাস্ত্রে ৭১র যুগান্তে মন্বন্তর বলিয়াছেন; সন্ধি কাল বলেন নাই। বিষ্ণুপুরাণে অধিক কালের কথা বলিয়াছেন; ইহা অনৈক্য নহে। ফলিতার্থে অধিক কাল না বলিলে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ১ হাজার যুগ হয় না। অতএব সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেত ৭১র যুগের কিঞ্চিৎ অধিক কালই সিদ্ধান্ত হইতেছে। এই প্রলয় ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত অন্তে হয় বলিয়া, ইহাকে মৌহূর্ত্তিক প্রলয় বলে; ইহা চতুর্দশবার হইলে ১৫র মুহূর্ত্ত গত হয়, সুতরাং ব্রহ্মার এক দিবস গতে প্রলয় আরম্ভ হয়। এই মন্বন্তর প্রলয়ে কেবল জল-প্লাবন হইয়া সমুদায় ডুবিয়া যায়, কেবল পর্ব্বত সকল থাকে। এই প্রলয় নানা প্রকারে হয়। কখন ভগবান ঈশ্বর, মীনরূপ ধারণ করেন; মনু তাহার শৃঙ্গে অর্ণব পোত বদ্ধ করিয়া তাহাতে জীবজন্তু ও বীজ সকল রাখিয়া ভাসমান হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন। পশ্চাৎ জল শুষ্ক হইলে সৃষ্টি করিতে থাকেন। এবং কোন মন্বন্তরে সূর্য্যদেবের তাপে, পর্ব্বত ব্যতীত পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ দগ্ধ হইয়া, পরে মেঘদ্বারা কতক দিন স্থূল প্রমাণ অর্থাৎ মুষলের ধারে বৃষ্টি হইয়া জলপ্লাবনে পৃথিবী ডুবিয়া যায়; পরে জল শুষ্ক হইলে, দেবতা দ্বারা সৃষ্টি হয়। এইরূপ নানা কল্পে নানা রূপ ঘটনা হইয়া থাকে, ইহার নাম মন্বন্তর প্রলয়। এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর

* ইহা অনেকবার হইতে থাকে, তাহাতে বারম্বার নানা প্রকার অবস্থা হয়, ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও কল্কী এবং ভবিষ্যৎ পুরাণাদি দৃষ্টে জানা যাইতে পারে।

† ৭১ যুগ ৫১৪২ বৎসর এক মন্বন্তর।

হইলে ব্রহ্মার এক দিবস গত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। তখন একশত বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত প্রাণিমাত্রই স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার শরীরে তাহারা সূক্ষ্মশরীরমাত্র অবলম্বনে প্রবেশ করে। ওষধি ও বৃক্ষাদি সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়। পরে সূর্য্যদেব সপ্তরশ্মিযুক্ত হইয়া পৃথিবীর সমুদায় রস আকর্ষণ করেন। তাহাতে পৃথিবী জল ও রস শূন্যা হইয়া যায়। পরে রুদ্ররূপী ভগবান ঈশ্বর দ্বাদশ সূর্য্যরূপে উদয় হইয়া তাপ প্রদান করেন। ঐ তাপে তাপিত হইয়া, অনন্তদেবের নিশ্বাস হইতে কালাগ্নি রুদ্ররূপ অগ্নি নির্গত হইতে থাকে; এই দুই অগ্নি একত্রিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। ঐ অগ্নির সহিত প্রবল বায়ু বহিতে থাকায়, সমুদায় পদার্থ নিঃশেষিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। কারণ স্থূল পদার্থ মাত্রের বিনাশ হইলে, আর অগ্নি থাকে না। পরে আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত প্রভৃতি মেঘ সকল উদিত হইয়া বর্ষণ করিতে থাকে; তখন কেবল জলময় হইয়া পড়ে। তৎকালিন ভগবান ঈশ্বর এক দিকে বিষ্ণু রূপ ধারণ, ও অন্য দিকে অনন্ত নাগরূপ ধারণ করিয়া তাহার উপর শয়ন করেন। ব্রহ্মা সমুদায় পদার্থের সূক্ষ্মশরীর স্বীয় সূক্ষ্মশরীরে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করতঃ নিদ্রিত হয়েন। মহর্লোক জনলোক ও তপলোক প্রভৃতি স্থানবাসীরা সকলেই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন, কোন কোন প্রলয়ে ঐ সকল লোক নাশ হয়, কখন কখন থাকে। কিন্তু সত্যলোক এই প্রলয়ে নাশ হয় না; মহাপ্রলয়ে নাশ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণুর শরীরে নিদ্রিত থাকন সময়ে, ঐ বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ একটী পদ্ম উত্থিত হয়, ব্রহ্মার নিদ্রা ভগ্ন হইয়া দেখেন যে, ঐ পদ্ম মধ্যে তিনি অবস্থিতি করিয়া আছেন;* আর কোন পদার্থই নাই, কেবল জলময় হইয়াছে। কিছুকাল পরেই, বিষ্ণুর কর্ণমলা হইতে দুইটী অসুর উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, তৎকালিন বিষ্ণু যোগ নিদ্রায় অভিভূত থাকায় ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করেন, মহামায়া প্রসন্না হইয়া বিষ্ণুর যোগ নিদ্রাভঙ্গ করান, ও বিষ্ণু জাগরিত হইয়া, ঐ দুই অসুরকে বধ করেন।

---

* এইজন্য ব্রহ্মাকে পদ্মযোনি বলে।

তাহাদিগের মাংসেতে পুনরায় মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়; ঐ মৃত্তিকা বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী মেদিনী নাম ধারণ করেন। পরে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি ত্রয়োদশ ভুবন, ও বিরাট এবং মনু ও প্রজাপতি প্রভৃতি সকল আবির্ভাব হয়েন। তদনন্তর সূক্ষ্মশরীর বিশিষ্ট জীব সকল স্ব কর্ম্ম বশত অদৃষ্টাধীন স্থূলদেহ ধারণ করতঃ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ক্রমশ যুগাদি সৃষ্টি হয়; এই দৈনন্দিন প্রলয় ইহা অনেকবার হইয়া থাকে; কেননা ব্রহ্মার যেরূপ এক দিনে এইরূপ ঘটনা হয়, তদ্রূপ ৩৬০ দিনে বৎসর। ইহার একশত বৎসর এইরূপ ক্রমাগত হইতে থাকায়, কতবার যে, এই রূপ প্রলয় হয় তাহা গণনা করিলে জানা যাইতে পারে। এই প্রলয় সকলের মধ্যে, কোন কোন প্রলয়ে, ভগবান শেষ শয্যায়, ও কখন বটপত্রে, এবং কখন কূর্ম্ম পৃষ্ঠে থাকিয়া কখন অন্য প্রকারে ভাসমান হইয়া থাকেন। এবং তিনি, কখন বিষ্ণুরূপ, কখন শিবরূপ, ও কখন গণেশ, ও কখন সূর্য্য, ও কখন শক্তির নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া নানা উপায়ে সৃষ্টি করিতে থাকেন। ইহা সকলই তাঁহার লীলা মাত্র। তদনন্তর যখন ব্রহ্মার শত বৎসর গত হইয়া পরমায়ুঃ শেষ হয়; তখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। ইহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বলা যায়; কেননা এই প্রলয়ে প্রকৃতির প্রলয় হয়। এই প্রলয় প্রথমত দৈনন্দিন প্রলয়ের ন্যায় সমস্ত বস্তু ও সত্যলোক দগ্ধ হইয়া মেঘের দ্বারা জলে পরিপূর্ণ হয়। তদনন্তর ঐ জল পৃথিবীর গন্ধ গুণ পান করাতে, গন্ধ গুণের নাশ হয়, পরে তেজোময় পদার্থ প্রকাশ হইয়া, রস, গুণের সহিত সমুদায় জলপান করিয়া নিঃশেষ করেন, তদনন্তর প্রবল বায়ু প্রকাশ হইয়া, রূপের সহিত সমস্ত তেজ পান করেন। তৎপরে আকাশ স্পর্শ গুণের সহিত বায়ুকে পান করাতে আকাশ কেবল শব্দময় হইয়া থাকেন; তদনন্তর অহঙ্কার আকাশকে, ও মহত্তত্ব অহঙ্কারকে, এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি মহত্তত্বকে পান করিয়া নিঃশেষ করেন। ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তাবরণ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব কারণে লয় হইলে, প্রকৃতি শক্তিমচ্চৈতন্যে লয় হয়েন। তখন পরমেশ্বর সৃষ্টিকার্য্য রহিত করিয়া প্রলয় অর্থাৎ বিশ্রাম কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তৎকালীন শক্তি, অব্যক্তাবস্থায় থাকায় কেবল নির্গুণ অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান থাকেন। আর কিছুই থাকে না। পরমেশ্বর সুষুপ্তাবস্থার ন্যায়

অব্যক্ত রূপে বিরাজমান থাকেন। সুতরাং তৎকালীন জীবের উপাধি সকল নাশ হওয়ায়, মায়িক কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়; কেননা জীবের চৈতন্য ভাগ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয়। যেমন কলশীতে জল পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিলে, পুনরায় জলসমেত কলশী তোলা যায় বটে, কিন্তু কলশী বিনাশ করিয়া ঐ জলে জল ঢালিয়া দিলে, ঐ জল আর প্রভেদ করা যায় না; তদ্রূপ জীবের উপাধি সকল কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীরের ধ্বংশ হইলে, চৈতন্য ভাগ চৈতন্যে মিশ্রিত হইয়া যায়, আর প্রভেদ থাকে না। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশে প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু ঘট ভাঙ্গিলে আকাশের আর প্রভেদ থাকে না; তদ্রূপ জীব মুক্তি-লাভ করে। কেহ বলেন যে, এইরূপ প্রলয় হয় না; কারণ জীব সকল ক্রমে ক্রমে স্ব কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিলে, পরে প্রলয় হইবেক; তদনন্তর আর সৃষ্টি হইবেক না, ইহা সঙ্গত নহে। কারণ জীবের কর্ম্ম বন্ধন মিথ্যা; অর্থাৎ মায়িক; এই মায়িক কার্য্য যত দিন চলিতে থাকে, তত দিন জীবের বন্ধন ও কর্ম্ম, এবং জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সুখ দুঃখ ভোগ হয়। যখন মায়া, কার্য্য রহিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়েন,তখন জীবও থাকেনা, কার্য্যও থাকে না সুতরাং জীব মুক্তিলাভ করে। যদি বল যে,জীব আপনি যদি মুক্তিলাভ করে,তবে মুক্তির চেষ্টা করা বিফল? তাহার উত্তর এই যে, মহাপ্রলয় কত দিনে হইবে তাহার সংখ্যা উপরে লেখা গেল, তাহা দৃষ্টে বোধ হয় যে, এতাধিক কাল জীব কষ্ট ভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মুক্তির চেষ্টা করে। আর এইরূপ প্রলয়ান্তে যে সৃষ্টি হইবেক না বলেন, তাহা শাস্ত্র সিদ্ধ নহে; কেন না পরমেশ্বরের স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য করিতে কদাই ক্ষান্ত হয়েন না; যেরূপ দিবা অন্তে রাত্রি, ও রাত্রি অন্তে দিবা হয়, তদ্রূপ স্বাধীন পরমেশ্বর, তিনি জীবের কর্ম্মের অধীন হইয়া, সৃষ্টি করিতে বদ্ধ নহেন যে, জীবের কর্ম্ম না থাকিলে সৃষ্টি করিবেন না। তিনি সৃষ্টিঅন্তে লয়, ও লয় অন্তে সৃষ্টি করেন, ইহা তাঁহার নিত্য সিদ্ধ কার্য্য; ইহা পূর্ব্বে মীমাংসা হইয়াছে। তবে এইরূপ সৃষ্টি করাতে তাহার বৈষম্য দোষ আছে কি না, তাহাও এই ভাগের ১১ অধ্যায়ে মীমাংসা করা যাইবেক। তবে অদৃষ্ট দৃষ্টে যে বৈষম্য হয়, তাহা দৈনন্দিন প্রলয়ান্তে হইয়া থাকে। কেন না জীব তখন ব্রহ্মার শরীরে থাকে, সুতরাং জীবের

কর্ম্ম নাশ হয় না *। এই মহা প্রলয়ান্তে যে নূতন সৃষ্টি হয়, তাহাই শাস্ত্র সম্মত বলিয়া পূর্ব্বেও মীমাংসা হইয়াছে। অতএব নানা প্রকার প্রলয়ের কথা যে লেখা গেল; ইহা পরমেশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক নানা প্রকার ক্রীড়ার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন বলিয়া, শাস্ত্রে নানা প্রকার প্রলয়ের কথা লেখা হইয়াছে। তদনুসারে লেখা হইল। তবে সকলে নানা প্রকার কথা শুনিয়া বলেন যে, শাস্ত্রে গোলযোগ আছে; ফলিতার্থে প্রলয়ান্তে অনেক বার সৃষ্টি হওয়ায়, ও আমাদিগের শাস্ত্র সকল প্রশ্নানুসারে উত্তর প্রদান করার ন্যায় লিখিত থাকায়, যিনি যেরূপ প্রশ্ন করেন, তদনুসারে গুরু তাহার উত্তর প্রদান করাতে, লোকে তাহা পাঠ করতঃ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া গোলযোগ বোধ করেন; এই জন্য আমি পর্য্যায়ক্রমে শাস্ত্র সকলের সার সঙ্কলন করিলাম। ইহাতে জানিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে অনৈক্য নাই। এবং ঈশ্বরের কার্য্য ও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; তাঁহার অনন্ত কার্য্য সকল, অনন্ত শাস্ত্রের দ্বারাও মীমাংসা হইতে পারে না; অতএব এই বিষয় এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত করা গেল। এক্ষণে ঈশ্বরের নিয়মাধীন কার্য্য সকল কি তাহা নির্ণয় করা যাউক।

দশম অধ্যায়।

ঈশ্বরের নিয়মাধীন কার্য্যের প্রবলতা ও পদার্থ বিচার।

অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর স্বভাব সিদ্ধ কার্য্যের ন্যায়, ও নিত্য ক্রীড়া করণের ন্যায় জগতে অনন্ত পদার্থ, ও অনন্ত ভাব, ও অনন্ত দেশ, ও দেশ ভেদে ব্যবহার ভেদাদির নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎসমুদায় কেহ নিরূপণ করিতে অথবা জানিতে শক্ত নহে। তবে তাহার এক দেশ জানিবার নিমিত্তে শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে কতকগুলি পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে; তাহা বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করিলে জানা যায় যে, তৎসমুদায়

* যেমন কলসীর মুখ বন্ধ করিয়া জলে ডুবাইলে পুনরায় তোলা যায়।

ঈশ্বরের নিয়ম। কিন্তু পদার্থ সম্বন্ধে মূল ন্যায় দর্শনে ষোড়ষ পদার্থ; এবং সাংখ্য দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও বেদান্ত দর্শনে চৈতন্য এবং মায়া, ও বর্ত্তমান প্রচলিত ন্যায় শাস্ত্রে সপ্ত পদার্থ, ও বৈশেষিক দর্শনে ষট্ পদার্থ, এবং অন্যান্য শাস্ত্রে চৈতন্য জড় ও শক্তি গুণ ইত্যাদি নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার বিচার করিয়া জগৎপদার্থের মীমাংসা করা হইয়াছে। তৎসমুদায় নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় বিধায় সহজে বোধগম্য হয় না। এবং এই গ্রন্থে সৃষ্টি প্রকরণাদি নানা অধ্যায়ে নানা প্রকার পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতেও এক স্থানে সম্যক্ নির্ণয় না হওয়ায়, পদার্থ সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে লক্ষণার সহিত লিখিত হইতেছে।

মূল পদার্থ এক। অথাৎ শক্তিমচ্চৈতন্য। তাহা হইতে প্রকৃতি, জড়, গুণ, দ্রব্য, কর্ম্ম, বস্তুধর্ম্ম, অভাব; এই সাতটী পদার্থ কার্য্যকারণ রূপে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভূত জগতের সমুদায় পদার্থ।

শক্তিমচ্চৈতন্য বস্তু এক, কিন্তু অবস্থা ভেদে দুই প্রকার। অব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্য, এবং ব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্য। অব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্য অদ্বিতীয় নির্গুণ পরমেশ্বর। তাহাতে শক্তি অব্যক্ত থাকায় তাঁহাকে শুদ্ধ চৈতন্যময় স্বপ্রকাশ স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে।

যদ্যপি চৈতন্য এক বস্তু বটে, কিন্তু তিনি নানা পদার্থের সন্নিধানে থাকায় বেদান্ত দর্শনে তাঁহার নাম সমষ্টিও ব্যষ্টিরূপে অষ্ট প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা অনাবৃত, তুরীয়, ব্রহ্মচৈতন্য, এবং সগুণ ঈশ্বর চৈতন্য, সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ব্ভ-চৈতন্য, এবং বিরাট চৈতন্য; এই চারি প্রকার সমষ্টি। ইহার ব্যষ্টি কূটস্থ চৈতন্য, ও অন্তরাত্মা প্রাজ্ঞ জীব চৈতন্য, এবং তৈজস অর্থাৎ আভাস জীব চৈতন্য, ও বিশ্বচৈতন্য, এতদ্বিষয় পূর্ব্বে মীমাংসিত হইয়াছে*।

পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য সাধন করেন; তন্নিমিত্ত চৈতন্য বস্তুতে শক্তি থাকা অনুভব হয়। ফলতঃ শক্তি ব্যতীত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সাধন হইতে পারে না। শক্তি সাত প্রকার, সৎশক্তি, কাল-শক্তি, দিক্-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিজ্ঞান স্বরূপা, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়া-

* প্রথমভাগে বিংশতি অধ্যায়ে

শক্তি, বস্তুর উৎপাদিকা শক্তি। এই সকল শক্তির অন্তর্গত অনন্ত শক্তি। শক্তি থাকাতে পরমেশ্বর তিনটী ভাবাপন্ন আছেন; অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দ। সৎ, নিত্য বিদ্যমান ইহার জ্ঞাপক কাল ও দিক্ শক্তি। যাহার দ্বারা ঐ নিত্যত্বের অনুভব হয়। কারণ কাল দিক্ নিত্যত্বের আধার স্বরূপ। কেন না কাল ও দিক্ নিত্য ইহাদিগের ক্ষয় নাই। পরমেশ্বর সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র আছেন। ইহাতে মহাকাল ও মহাদিক আছে বলিতে হইবেক। বিশেষেতঃ শাস্ত্রে আছে যে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তারা কালতে লয় হয়েন; অতএব কাল ও দিক ঈশ্বরের অতিরিক্ত কোন বস্তু নহে। তবে কাল বিভাগক্রমে ক্ষণ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রহর দিবা রাত্রি পক্ষ মাস অয়ন বৎসর যুগাদি ভাব হইয়া থাকে; এবং দিগ্বিভাগ দ্বারা, পূর্ব্ব ঈশান, উত্তর, বায়ু, পশ্চিল, ও নৈঋত, এবং দক্ষিণ, অগ্নি, ঊর্দ্ধ, অধঃ হইয়া থাকে। ইহা সৃষ্টিকার্য্য সাধনের উপযোগী ভাব; সুতরাং ক্ষয়োদয় হওয়া বলা যায়। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত কারণে মহাদিক ও মহাকালের ক্ষয়োদয় নাই। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য জ্ঞান মাত্র, ইহা জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অনুভব হয়। কেন না জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞান শক্তির অনুভব হয় না, ও জ্ঞান শক্তি ব্যতীত ইচ্ছা হইতে পারে না, এবং ইচ্ছা ব্যতীত সৃষ্টি কার্য্য হয় না। আনন্দ অর্থাৎ সুখ স্বরূপ, ইহা ক্রিয়াশক্তি ও বস্তু শক্তি দ্বারা অনুভব হয়; কেন না ক্রিয়া ব্যতীত বস্তুর উৎপত্তি হয় না, ও বস্তু ব্যতীত জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। এবং বস্তুর সহিত ক্রিয়ার যোগ ব্যতীত আনন্দানুভব হয় না। এই সকল শক্তি থাকাতেও যে পরমেশ্বর অদ্বিতীয়, তাহা পূর্ব্বে মীমাংসিত হইয়াছে। ফলতঃ এই সকল শক্তি ব্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ জগদ্রূপে পরিণত হওয়াই অনুমান হয়; এবং শাস্ত্রকারেরা তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপরি উক্ত শক্তি সকল ব্যক্ত হইয়া প্রকৃতি নামে খ্যাতা হয়েন। প্রকৃতি তিন প্রকার, পরমা ও পরা এবং অপরা প্রকৃতি। পরমা প্রকৃতিকে মূলা প্রকৃতি ও মহামায়া এবং পরাৎপরা প্রকৃতি ও অজা বলা হইয়াছে। ইনি সত্ত্বরজস্তমো গুণের সাম্যাবস্থা, অর্থাৎ কারণ স্বরূপা, ইহা হইতে পরা প্রকৃতি, অর্থাৎ ত্রিগুণামায়া প্রকাশিতা হয়েন। ঐ ব্যক্ত শক্তি পরমা প্রকৃতি, স্বীয় কার্য্য স্বরূপা ত্রিগুণা মায়াঁর সহিত যোগ হওয়ায়; ঐ ব্যক্ত শক্তিমান চৈতন্যকে সগুণ ঈশ্বর বলা

হইয়াছে। শক্তি চৈতন্যের সহিত অভিন্ন, এবং ত্রিগুণের সহিত পৃথগ্‌ভাবে মিলিত হইয়া অবস্থান করাতে; ঐ যোগকে কেহ বলেন, তাদাত্ম্য অর্থাৎ মিশ্রিত; ও কেহ বলেন পৃথক্ ভাব, ও কেহ বলেন তাদাত্মাধ্যাস। অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ মাত্র। ফলতঃ সগুণ ঈশ্বর ত্রিগুণে আবৃত থাকায়, চৈতন্যাংশের সম্যক ভাব প্রকাশ না হইয়া, কিঞ্চিৎ ন্যূন ভাব প্রকাশ হওয়ায়, বেদান্ত দর্শনে তাঁহাকে আভাস কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে চৈতন্যাংশকে পুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ পরা প্রকৃতির সত্ত্ব গুণে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমানতা, ও তাহার জ্ঞাপক কাল ও দিক এবং জ্ঞান ও ইচ্ছা-শক্তি ব্যক্তরূপে পরিণত হইয়াছে। এবং রজোগুণে ক্রিয়া শক্তি, ও তমো-গুণে বস্তুর উৎপাদিকা শক্তি প্রকাশিতা হইয়াছেন। ঐ ত্রিগুণার কারণ স্বরূপা ব্যক্ত শক্তি, জড় কি চৈতন্য নহে; কেবল শক্তি মাত্র পদার্থ। কিন্তু ত্রিগুণা প্রকৃতিতে সত্ত্ব ও রজো ভাগটী জড় কি চৈতন্য তাহা অনির্ব্বচনীয়; কেবল তমোভাগটীকে অব্যক্ত জড়াংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কেন না অঘটন ঘটনা পটীয়সী মায়া ত্রিগুণা জগতের সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপা হইয়া এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। ঐ কারণ তিন প্রকার, নিমিত্ত কারণ, সহকারি কারণ, ও উপাদান কারণ; নিমিত্ত কারণ কর্ত্তা ও অপাদানকে বলা যায়; কর্ত্তা যিনি করেন তিনি, ও অপাদান যাহা হইতে হয় তিনি; সহকারি কারণ করণ, অর্থাৎ যদ্দ্বারা কর্ম্ম হয়; উপাদান কারণ অধিকরণ, অর্থাৎ যাহাতে হয়। নিমিত্ত কারণ সত্ত্ব গুণ স্থিত জ্ঞান, সহকারি কারণ রজো গুণ স্থিত শক্তি, উপাদান কারণ তমোগুণস্থিত অব্যক্ত জড়াংশ বস্তু। এই তিন গুণকে পৃথকভাবে লক্ষিত করা যাইতে না পারায়, কেহ কেহ ত্রিগুণা প্রকৃতি মায়াকে জড় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ফলতঃ ত্রিগুণের কার্য্য পৃথক থাকা অনুমান হইয়া থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, এক বস্তুতে চৈতন্য ও শক্তি এবং অব্যক্ত জড় পৃথক ভাবে মিলিত রহিয়াছে*। ঐ জড়াংশ উপাদানকে বেদান্ত দর্শনে বিবর্ত্ত উপাদান, অর্থাৎ মায়িক ও মিথ্যা বলা হইয়াছে। কেন না মূল

---

* যেমন দেহ অর্থাৎ স্থূল দেহে জড় চৈতন্য ও শক্তি তিন পৃথক পদার্থ আছে অথচ মিলিত ভাব তদ্রূপ।

কারণ পরমেশ্বরে জড়াংশ না থাকায় তাহা হইতে উৎপন্না ত্রিগুণাতেও জড়াংশ নাই। তবে অব্যক্ত জড় কেবল কল্পনা মাত্র; তাহা ব্যবহারে সত্য-বৎ প্রতীয়মান হয়; ইহা পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। জড় দুই প্রকার। অব্যক্ত ও ব্যক্ত জড়। অব্যক্ত জড় তমোগুণ ও মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব বুদ্ধির সূক্ষ্মাবস্থা। অহঙ্কার আমি, ইহা তিন প্রকার, অব্যক্ত সূক্ষ্ম ও ব্যক্ত। অব্যক্ত অহঙ্কার সগুণ ঈশ্বরের অহং ভাব, এবং সূক্ষ্ম অহঙ্কার জীবের অহংভাব, ও ব্যক্ত অহঙ্কার মনুষ্যাদির গর্ব্ব। এই অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে ব্যক্ত জড় অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির প্রকাশ হইয়াছে। পঞ্চ তন্মাত্রা ও মন বুদ্ধি সূক্ষ্ম অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রাণ পরমাণু সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও স্থূল পঞ্চ ভূতাদি ভৌতিক পদার্থ সকলকে অপরা বলা যায়*। ব্যক্ত জড় দুই প্রকার। গুণ ও দ্রব্য। গুণ তিন প্রকার, মুখ্য গুণ, ও সূক্ষ্ম গুণ, এবং পারিভাষিক গুণ। মুখ্য গুণ পঞ্চতন্মাত্রা, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। শব্দ ধ্বনি, ও আকারাদি বর্ণ ইত্যাদি। স্পর্শ, শীতল ও উষ্ণ। এবং অনুষ্মা শীতল। রূপ, শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ ও নীল পিঙ্গল প্রভৃতি যৌগিক বর্ণাদি। রস, তিক্ত অম্ল কষায় মধুর লবণ কটু ইত্যাদি। গন্ধ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ ইত্যাদি†। এই মুখ্য গুণ হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি হওয়াতে ইহাকে দ্রব্যোৎ-পাদক বলা যায়। সূক্ষ্ম গুণ মন বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ। মন ও বুদ্ধি একই প্রকার বস্তু, কিন্তু বৃত্তি ভেদে পৃথক। মনের বৃত্তি সংকল্প বিকল্প এবং সংশয়। মন বাসনাত্মক এবং ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তা। কেহ কেহ মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। মনের অনুভব স্মৃতি অর্থাৎ সংস্কার বশতঃ পূর্ব্ব কার্য্য স্মরণ করিতে পারেন। মন অশেষ গুণের আধার ও কর্ম্মের কর্ত্তা, তিনি কেবল বুদ্ধির বিবেক শক্তি দ্বারা বাধ্য হয়েন; নতুবা সর্ব্বদা চঞ্চল। বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়, ঐ নিশ্চয়কে বিজ্ঞান অথবা অনুভব বলা যায়। অনুভব

---

* ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ ৫ম শ্লোকদ্বারা অপরা প্রকৃতি ব্যক্ত জড় ও পরা প্রকৃতি জীব ভূত অর্থাৎ জীব স্থিতি ত্রিগুণা জীব শব্দে সগুণ ঈশ্বরের অংশ।

† রূপ, শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে পর্য্যন্ত পঞ্চীকরণ না হয় সে পর্য্যন্ত তাহা দেখা যায় না কারণ উহার পরমাণু অদর্শনীয় বস্তু তাহা স্বজাতীয় পরমাণুর সহিত যোগ যুক্ত হইলেও দেখা যায় না কেবল ভাব পদার্থ বলিয়া অনুমান হয় তবে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি পঞ্চীকরণ দ্বারা দর্শনীয় হইয়াছে।

প্রমাত্মক ও ভ্রমাত্মক। প্রমাত্মক সত্য নিশ্চয়, ও ভ্রমাত্মক মিথ্যা নিশ্চয়।* ঐ অনুভব জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা হয়; তাহা চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শব্দজ। বুদ্ধির বিবেক শক্তি দ্বারা উত্তমাধম অনুভব হইয়া থাকে; এবং মনকে বশীভূত করা যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহাদিগকে বুদ্ধীন্দ্রিয় বলে। ইহা পাঁচ প্রকার। শ্রবণ, ত্বক্, দর্শন, রসনা, ঘ্রাণ, ইহারা প্রত্যেকে এক একটী বিষয় গ্রহণ করে, বিষয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মের জনক—বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ। ইহারা বাক্য কথন, দ্রব্য গ্রহণ, ও ত্যাগ গমন রেচন ইত্যাদি কার্য্য করে।

প্রাণ এক, কিন্তু বৃত্তি ভেদে পাঁচ প্রকার, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, ইহারা শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি কর্ম্ম, ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তা করেন। এতদ্ভিন্ন ইহার অন্তর্ভূত শরীরস্থ বহির্বায়ু পঞ্চ অর্থাৎ নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, ইহারা পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম করেন।†

পারিভাষিক গুণ বস্তু ধর্ম্মের অন্তর্ভূত, তাহা পরে লেখা যাইবেক। দ্রব্য মুখ্য গুণময় পদার্থ, মুখ্যগুণ বিকৃত হইয়া মায়া দ্বারা ক্রমে স্থূল হওয়ায় দ্রব্য নামে অভিহিত হইয়াছে। দ্রব্য তিন প্রকার অব্যক্ত ব্যক্ত অতিব্যক্ত। অব্যক্ত দ্রব্য পরমাণু ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। এবং যৌগিক স্থূল আকাশ, ইহা কার্য্যানুমেয়। ব্যক্ত দ্রব্য বায়ু ও তেজ। বায়ু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়; ইহার কার্য্য স্পষ্ট দেখা যায়। বিশেষতঃ জগৎ পদার্থের মধ্যে বায়ু কেবল সচল পদার্থ, তদ্ভিন্ন সকলই অচল। বায়ুতে ঐশ্বরিক ক্রিয়া শক্তি অধিক থাকাতে বায়ু সচল হইয়াছেন। তেজে বায়ুর ভাগ অধিক থাকায় ও তেজ লঘু পদার্থ বিধায় তাহা সচল হইয়াছে। ফলতঃ প্রাণী মাত্রই প্রাণ-বায়ু সহকারে গমনাদি কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে। তেজ, দর্শনেন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। অতিব্যক্ত দ্রব্য। জল ও পৃথিবী ইহারা জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্থূল আকাশ বায়ু ও তেজ জল এবং পৃথিবী ইহারা পঞ্চীকরণ, অর্থাৎ পরস্পর মূল পঞ্চভূতে পঞ্চভূত যোগ হইয়া স্থূল ভূত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে আকাশ ব্যতীত অন্য চারিভূত হইতে

* যেমন মৃগ তৃষ্ণাতে ভ্রম প্রযুক্ত জল বলিয়া নিশ্চয় হয়।

† এই ভাগের ২ অধ্যায় দৃষ্ট কর।

অনেক বৈকারিক ও যৌগিকভূত, দ্রব্য পদার্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। ঝটিকা ও ঘূর্ণবায়ু প্রভৃতি বায়বিক। চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময়। সমুদ্র নদ নদী প্রভৃতি জলীয়, এবং পর্ব্বত বৃক্ষ গুল্ম লতা, ও মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীগণেব স্থূল দেহ, এবং স্বর্ণ বৌপ্য ইত্যাতি ধাতু পদার্থ, ও প্রাণীকৃত অন্যান্য অনেক পদার্থ পার্থিব; দ্রব্য পদার্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। দ্রব্য ব্যতীত কোন কর্ম্ম হয় না। ফলতঃ কর্ম্মের নিমিত্তে দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রে দিক্ কাল দেহী ও মনকে দ্রব্য বলিয়াছেন। তাহা সহজে বোধগম্য হয় না; কারণ দ্রব্য পদার্থ সকল ভৌতিক মধ্যে পরিগণিত; উক্ত চারি পদার্থে ভৌতিক অংশ নাই; বরং দিক কাল ঈশ্বব অনতিরিক্ত, এবং দেহী জীব সূক্ষ্ম গুণ স্থিত চৈতন্য পদার্থ; ও মন সূক্ষ্ম গুণ পদার্থ। তবে এই চাবি পদার্থ ভৌতিক পদার্থেব সহিত যোগ থাকা, এবং ঐ ঐ পদার্থের গুণ থাকা অনুমান করিয়া ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা উহাদিগকে দ্রব্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ইহা অনৈক্যের কাবণ নহে।

কর্ম্ম তিন প্রকার; ঐশ্বরিক, প্রাকৃতিক, ও প্রাণীকৃত, ঐশ্বরিক কর্ম্ম সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি। প্রাকৃতিক, প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম। আকাশের শব্দ: বায়ুব পরিচালন, ও মেঘ বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রদান প্রকৃতির কর্ম্ম। প্রাণীকৃত, প্রাণী কর্তৃক যে কর্ম্ম হয়। তাহা তিন প্রকার, মানসিক, আনু-ভাবিক ও ব্যবহারিক। মানসিক কর্ম্ম চিন্তা ও মনোরাজ্য এবং স্বপ্ন ইত্যাদি। আনুভাবিক যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। যথা পরীক্ষা ইত্যাদি। ব্যবহারিক কর্ম্ম; কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায়, অর্থাৎ বাক্য কথন, দ্রব্য গ্রহণ ও ত্যাগাদি, এবং গমন, রেচন, বমন, নিঃসরণ, প্রভৃতি কর্ম্ম; ইহার অন্তর্ভুত উৎক্ষেপণ, অর্থাৎ ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ, অধঃক্ষেপণ, আকুঞ্চন অর্থাৎ সংকোচ করণ; প্রসারণ অর্থাৎ বিস্তাব করণ; ভ্রমণ, ও যানারোহণে গমন, বক্রগমন, শয়ন, ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম সকল। কর্ম্মের সংখ্যা নাই; কিন্তু প্রাণীকৃত কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ সাংসা-রিক ও পারমার্থিক। সাংসারিক কর্ম্ম, সংসাবযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য যে কর্ম্ম করা যায় তাহা প্রায়ই সকলে জ্ঞাত আছেন। পারমার্থিক ঈশ্বরের উপাসনা

প্রভৃতি কর্ম্ম সকল চতুর্থভাগে নির্ণয় করা যাইবেক। জগতে অনন্ত বস্তু ধর্ম্ম, থাকাতে কর্ম্ম অনন্ত হইয়াছে।

বস্তু ধর্ম্ম অর্থাৎ বস্তুর স্বভাব, বস্তুর স্বকীয় ভাবকে স্বভাব বলা যায়। বস্তুর লক্ষণ ও কার্য্য দৃষ্টে স্বভাবের অনুভব হয়। যেমন জগৎ কার্য্য দৃষ্টে ঈশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কৃতিত্ব স্বভাবের অনুভব হয়, তদ্রূপ জাতি, ভেদ, সম্বন্ধ,* দ্বারা দ্রব্যাদির স্বভাব অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু স্বভাব স্বাধীন পদার্থ নহে, ঈশ্বরের নিয়মাধীন পদার্থ।

জাতি পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন বা আকৃতি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু রূপে যে অনুভব হয়, ঐ বস্তুকে জাতি বলা যায়। যথা মনুষ্যত্ব, গোত্ব, মৃগত্ব, হংসত্ব, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব, ইত্যাদি জাতি। এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণ কর্ম্ম দৃষ্টে, ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব, এবং শূদ্রত্বের অনুভব হওয়াতে, তাহাদিগকে পারিভাষিক জাতি বলা যায়; ও নাম উপাধি গোত্র কুল ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভূত। ভেদ, বীজ ও পরমাণুর স্বভাববশতঃ একজাতীয় পরমাণু এবং বীজ হইতে অন্য জাতীয় বস্তু উৎপন্ন না হইয়া, তাহাদিগের স্বজাতীয় বস্তু হয়; ঐ উৎপন্নের কারণকে ভেদ স্বভাব বলা যায়। যথা আম্রের বীজ হইতে পনস উৎপন্ন না হইয়া স্বভাব বশতঃ আম্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ। যে বস্তুতে যে প্রকার অবয়বের সম্বন্ধ থাকে, এবং যে দ্রব্যেতে যে গুণের সম্বন্ধ থাকে স্বভাব বশতঃ তাহাতে তাহা মিলিত হয়।† যেমন কপালাদিতে ঘটের সম্বন্ধ, হস্ত পদাদিতে মনুষ্যের সম্বন্ধ, শাখা পল্লবাদিতে বৃক্ষের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু দণ্ডধারী পুরুষের সহিত দণ্ডের সংযোগ থাকাতে তাহাকে সংযোগ বলা যায় মাত্র; তাহাতে তাহার সম্বন্ধ নাই। দ্রব্যেতে গুণ সংযোগ সম্বন্ধাধীন থাকে। এই গুণ, মুখ্য গুণ অথবা সূক্ষ্মগুণ বলা যায় না। কেননা মুখ্যগুণ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা; তাহারা আকাশাদি দ্রব্যের উৎপাদক উপাদান কারণ; এবং দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়া তন্ময়ভাবে আছে। সূক্ষ্মগুণ বৈকারিক স্থূলদেহরূপে দ্রব্যের আশ্রিতভাবে কার্য্য করে; কিন্তু ঐ

* ন্যায়শাস্ত্রে সামান্য বিশেষ সমবায়।

† সম্বন্ধ নানাপ্রকার অর্থাৎ সমবায়, মিশ্রিতসংযোগ, কনিক, স্বরূপ, স্বত্ব, স্বাশ্রিত্ব, জন্যজনকত্ব, অনুযোগিত্ব, প্রতিযোগিত্ব প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ঐ দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হয়। তবে পারিভাষিক গুণের দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ আছে।

পারিভাষিক গুণ। বস্তুর স্বভাব বশত; অথবা কর্ম্ম জন্য প্রকাশিত হয়। তাহা অপ্রাণী ও প্রাণী বিশেষের, বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম। যথা সংখ্যা পরিমিতি পৃথকত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব, অর্থাৎ দূরত্ব নিকটত্ব এবং জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বাদি। স্নেহ, কঠিন দ্রবত্ব। গুরুত্ব লঘুত্ব পক্ক অপক্ক। ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন সংস্কার বাল্য ও যৌবনত্ব বৃদ্ধত্ব সুখ দুঃখ (অদৃষ্ট) অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম। লজ্জা ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা তন্দ্রা সুষুপ্তি স্বপ্ন মূর্চ্ছা জাগ্রত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ গর্ব্ব দয়া ক্ষমা ধৈর্য্য শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি। তন্মধ্যে ইচ্ছাদি গুণ কেবল প্রাণী বিশেষে প্রকাশ হয়। ঐ গুণ অপ্রাণী দ্রব্যেতে নাই।

অভাব পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত সমুদায় পদার্থকে ভাব পদার্থ বলা যায়। ভাব নানা অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, এই ভাবেতে নঞ অর্থাৎ নাস্তি অর্থের যোগে অভাব হয়; অভাব দুই প্রকার মুখ্য অভাব ও গৌণ অভাব: মুখ্য অভাব তিন প্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব, কোন বস্তু কি কর্ম্মাদি উৎপন্নের পূর্ব্বে অভাব থাকে তাহা। ধ্বংসাভাব, বস্তুর সমুদায় বা অল্প বা অধিকাংশ বিনষ্ট হইলে যে অভাব হয় তাহাকে বলা যায়। অত্যন্তাভাব, যাহা দেশে, ও কালে, এবং বস্তুর মিশ্রিতাধারে, অনুৎপত্তি, এবং অস্থিতি, ও ধ্বংস জন্য আত্যন্তিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না তাহাকে অত্যন্তাভাব বলা যায়। যথা আকাশের পুষ্প অনুৎপত্তি নিমিত্ত অত্যন্তাভাব। ইহাকে ন্যায় দর্শনে অলীক বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। শূন্যকে বেদান্তে ঐ রূপ অলীক বলিয়াছেন। অন্ধকারকে কোন পদার্থ বলিয়া ন্যায় দর্শনে সিদ্ধান্ত করেন নাই। কেহ বলেন সৃষ্টির আদিতে অন্ধকারময় ছিল; কেহ বলেন ঐ সময় কেবল ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, তিনি আলোক অথবা অন্ধকার নহেন; তিনি জ্ঞানময় পদার্থ, ও অন্ধকার জন্য অর্থাৎ রাত্রির স্বভাব। এই স্থানে অথবা এক্ষণে ঘট নাই ইহা অস্থিতি জন্য অভাব; ঘটেতে পট নাই অর্থাৎ ঘটের মিশ্রিতাধারে পটের অভাব, ইহা অনুৎপত্তি অস্থিতি জন্য অভাব। মুক্তি হইলে দুঃখের বিনাশ আত্যন্তিকরূপে হয়। অর্থাৎ আর দুঃখ প্রাপ্ত হইবেক না, ইহা ধ্বংস জন্য অভাব।

গৌণ অভাব, সাদৃশ্য, অন্যত্ব, অল্পতা, অপ্রাশস্ত বিরোধস্থলে ঘটনা হয়। সাদৃশ্য, চন্দ্র তুল্য মুখ অর্থাৎ চন্দ্র এবং মুখ দর্শনে তুল্য আহ্লাদ জন্মে, ফলতঃ মুখে চন্দ্রত্বের অভাব আছে। অন্যত্ব এক বস্তুতে অন্য বস্তু নাই ইহাকে অন্যোন্যাভাব বলা যায়; কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রে ইহাকে ভেদ বলিয়াছেন; অর্থাৎ বস্তুর পৃথকত্ব থাকাতে অন্যোন্যাভাব হইয়াছে। অল্পতা, অল্প বস্তুতে অধিক বস্তুর অভাব। অপ্রাশস্ত, অপ্রশস্ত বস্তুতে প্রশস্তের অভাব। অল্পতা ও অপ্রশস্ত, বিষয় ভেদে পৃথকরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। বিরোধ, প্রণয়াভাবকে বিরোধ বলা যায়*। এতাবতায় যে সমস্ত পদার্থের বিচার করা হইল তাহা তিনটী পদার্থ বলিয়া প্রথমত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ অব্যক্ত শক্তিমান্ চৈতন্য, ও ব্যক্ত শক্তি অর্থাৎ গুণ এবং ভৌতিক জড়। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে আছে যে, ব্রহ্মা ভগবতীকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন যে, জগতে সৎ ও অসৎ যে সকল বস্তু আছে, তাহার শক্তি তুমি, ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, সৎ চৈতন্য অসৎ জড় শক্তি গুণময়ী। অর্থাৎ চৈতন্য স্থিত শক্তিকে শক্তি ও জড়স্থিত শক্তিকে গুণ বলা যায়। শক্তি ব্যতীত চৈতন্য ও জড়ের কোন কার্য্য নাই, তাহারা উভয় অচল। এই অব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্য কারণ রূপে মুখ্য গুণ পদার্থে, ও গুণ ভৌতিক জড় পদার্থে আছেন; এবং জড়ের প্রকাশ্য গুণের দ্বারা ব্যবহারিক কর্ম্ম হইতেছে তত্ত্ব বিচারে কেবল শক্তিমচ্চৈতন্য এক মাত্র পদার্থ থাকা সিদ্ধান্ত হইতে পারে; তাহা চতুর্থ ভাগে মীমাংসা করা যাইবেক। ফলিতার্থে পরমেশ্বর নিমিত্ত ও সহকারী, এবং উপাদান কারণ হইয়া জগতে নানা পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। পদার্থ পদের অর্থকে পদার্থ বলে; পদকে শব্দ বলা যায়। তাহাতে, শব্দ হইতে যে অর্থ হয় তাহা ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি, প্রতিকল্পে চলিতেছে। তাহাতে এক কল্প অন্ত হইয়া লয় হইলে, পুনরায় প্রথম সৃষ্টিকালে ঈশ্বর যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম অপরিবর্ত্তিত ভাবে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত চলিতেছে। ও কতকগুলি কর্ম্মের দ্বারা পরিবর্ত্তন হইতেছে

* প্রণয়ভঙ্গরূপ অভাব।

যথা চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, বৎসর, অয়ন; ও জাতি বিশেষের অবয়ব হস্ত পাদাদির সংখ্যা নিরূপণ, ও দেশ ভেদে শরীরের বর্ণ ইত্যাদি, যাহা নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক নিয়ম রূপে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত চলিতেছে ও চলিবেক। কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা ইহার কতকগুলি, স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; ও কতকগুলি হয় না। যেমন ব্রাহ্মণাদিরা জন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং হস্ত পাদাদির অঙ্গের ন্যূন ও বৃদ্ধি হয়, এবং ইহ জন্মে জাতি নাশ ও সুখ দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি অনেক বিষয় কর্ম্ম ফলে ঘটিয়া থাকে; এবং গ্রহদিগের মধ্যে যিনি যে বৎসর রাজা হয়েন, তাঁহাব কর্ম্ম গতিকে ঋতুর কার্য্য সকল বিপর্য্যয় হয়। যুগ পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মাধর্ম্মের ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয়; ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি ও আকাশ নক্ষত্রাদি সমভাবে থাকে, ইহাদিগের স্বভাবের পবিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু স্বভাবের পরিবর্ত্তন হউক বা না হউক সমুদায় পদার্থই কর্ম্মের অধীন করিয়া পরমেশ্বর [illegible] করিয়াছেন। যাহাকে যে কার্য্য সাধনের জন্য প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন [illegible]হার সেই কার্য্য করিতে হইয়াছে ও হইবেক। এবং পুনঃ পুনঃ ক[illegible] [illegible]ণানুসারে যাহাকে পরিবর্ত্তন রূপে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, ত[illegible] সেই কার্য্য করিতে হইতেছে, ও ভবিষ্যৎ যাহাকে যে কার্য্যে নিযু[illegible] [illegible]ন, তাহাকেও তাহাই করিতে হইবেক। ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে জীব সক[illegible] সৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মের গতিকে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত রূপে নানা প্র[illegible] [illegible]নিতে জন্মগ্রহণ, ও সুখ দুঃখভোগী হইয়া থাকে। অতএব অনন্ত [illegible]চৈতন্য পরমেশ্বর সকল বস্তুতে, ও সকল কার্য্যে, আবির্ভাব থাকি[illegible] [illegible]নুসারে ফল প্রদান দ্বারা কতক পরিবর্ত্তন করিতেছেন, ও কতক [illegible]বর্ত্তনে চালাইতেছেন; এবং প্রলয়কালে বিনাশ করিয়া থাকেন [illegible]ল যে, পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টিকালে ছোট বড় পদার্থ সকল সৃষ্টি, এব[illegible] [illegible]ও সুখী ও কাহাকেও দুঃখী করায়, তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতি[illegible] এবং কৃত প্রণাশাদি নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ সৃষ্টি নাশাদি নির্দয়তা দোষ [illegible] ইহা সঙ্গত নহে, ও তদ্বিষয় মীমাংসা করা যাইতেছে।

একাদশ অধ্যায়।

ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নির্দয়তা দোষের পরিহার।

পরমেশ্বর, দেবতা ও মনুষ্য এবং পশু পক্ষী জলচর ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নানা জাতীয় জীব, ও নানা জাতীয় বৃক্ষ গুল্ম লতা ইত্যাদি, অনন্ত প্রকার বস্তু সৃজন করিয়াছেন। তাহাতে বস্তুব প্রকৃতি অনুসারে ছোট বড় বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। কেননা জগতের লোকের দুই প্রকার জ্ঞান আছে; অর্থাৎ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান। তত্ত্ব বিচারের দ্বারা বস্তুর প্রকৃতি জানাকে পারমার্থিক বলা যায়। এবং বস্তুর প্রকৃতি সম্যক প্রকারে না জানিয়া ব্যবহার করাকে ব্যবহারিক বলা যায়। পারমার্থিক দুই প্রকার, অর্থাৎ অমিশ্র ও মিশ্র। অমিশ্র এই যে, জগতের দৃশ্য বস্তু কিছুই নাই; কেবল এক পরমেশ্বর মাত্র আছেন আর সমস্তই মিথ্যা।* মিশ্র ভাব এই যে, পরমেশ্বর সকল বস্তুতেই আছেন; ইহাতে বস্তু সকল আছে, এবং তাহাতে মিশ্রভাবে ' 'মেশ্বর রহিয়াছেন; সুতরাং জগতের সমুদায় পদার্থই তাঁহার মূর্ত্তি বি যা† আর ব্যবহারিক জ্ঞান তিন প্রকার; নাস্তিক্য, অজ্ঞতা, ও অজ্ঞ অ ক্য; তাহাতে নাস্তিক্য এই যে, জগতের পদার্থ কি, তাহা না জানিয়া, বং জগতের কর্ত্তা থাকা অস্বীকার করতঃ বলে যে, বর্ত্তমান জগৎ কাল সমভাবে আছে, ও লোকের পুরুষকারের তারতম্যে সুখ দুঃখ হইতেছে। অজ্ঞতা এই যে, জগতের পদার্থ কি? ও ইহা উৎপত্তি কি নিত্য, এবং ইহার কর্ত্তা আছে কি না? ও সুখ দুঃখ কিজন্য হয় বিষয় কিছুই না জানিয়া ব্যবহার করা। অজ্ঞ আস্তিক্য, এই যে, দার্থ সকল কি? ও ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তাহা না জানা, অথচ ঈশ ছন, তিনি নিরাকার অথবা সাকার হউন, তিনি এই জগতের ক য়া তাঁহাকে মান্য করা যায়।

---

* (

† ·

ইহার মধ্যে নাস্তিক ও অজ্ঞেরা ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ থাকার কোন আশঙ্কা করে না, ও করার সম্ভাবনা নাই; কেননা ঈশ্বর না থাকিলে বৈষম্য হয় না। কেবল অজ্ঞ আস্তিকেরা ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন। তাহাতে বক্তব্য এই যে, পরমার্থ বিচারে ঈশ্বরের বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই; কেননা অমিশ্র তত্ত্ব বিচারে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই নাই, জগৎ কেবল ব্রহ্মময় মাত্র। এবং মিশ্র তত্ত্ব বিচারেও জানা যায় যে, ঈশ্বর জগন্মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; তিনি নিজে ছোট ও বড় রূপ ধারণ করায় তাঁহার বৈষম্য দোষ নাই; কেননা যিনি বাহক তিনিই আরোহী, ও যিনি গুরু তিনিই শিষ্য, এবং যিনি শূকর তিনিই মনুষ্য, অর্থাৎ এক ঈশ্বরই সমুদায় রূপধারী হওযায় বৈষম্য দোষের বিষয় কি? এবং অজ্ঞ আস্তিকেরা কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া দেখিলে জানিতে পারেন যে, নানা প্রকার পদার্থ পরমেশ্বর সৃষ্টি করাতেও ব্যবহারে তাহার বৈষম্য দোষ হইতে পারে না; কারণ একজাতীয় পদার্থের মধ্যে ন্যূনাধিক থাকিলে, বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব দোষ হইতে পারে, জাত্যন্তরের সহিত জাত্যন্তরের বৈষম্য দোষ হইতে পারে না। কেননা যে স্থলে সমতা থাকে তথায় বৈষম্য দোষ হইতে পারে, নতুবা ঘটে না। যথা কুক্কুরের সহিত মনুষ্যের বৈষম্য নাই; অর্থাৎ মনুষ্যের সহিত পশুর তুলনা করিতে হইলে, কে ছোট কে বড় তাহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ তাহারা স্ব স্ব জাতীয় কার্য্যে সকলেই স্বাধীন বটে, এবং উভয় জাতীরই পাঞ্চভৌতিক দেহ আছে। আর আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, পুত্রস্নেহ প্রভৃতি সুখ দুঃখ ও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান সকলেরই আছে, তাহাতেও ঈশ্বরের বৈষম্য দোষের কোন কারণ নাই; তবে আকৃতি ও কার্য্যের বিভিন্ন আছে বটে, তাহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। তাহা কেবল তিনি লীলা অর্থাৎ ক্রীড়া করার জন্য অনন্ত প্রকার পদার্থ ও অনন্ত কার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিতে হইবেক। কেননা খেলা করিতে হইলে নানা প্রকার পদার্থের প্রয়োজন হইতে থাকে; যেমন লোকে সতরঞ্চ খেলা করে, তাহাতে রাজা, মন্ত্রী, হস্তী, অশ্ব, নৌকা পদাতিক প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ জগতে নানা পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি বল যে, পরমেশ্বর নিত্য তৃপ্ত তাঁহার খেলার প্রয়োজন কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, এই

জগৎ কার্য্যরূপ খেলা তাঁহার নিত্য স্বভাবসিদ্ধকার্য্য; কেননা স্বভাবসিদ্ধ-কার্য্য অনিবার্য্য; তাহার নিবারণ নাই। যেমন দিবা অন্তে রাত্রি, ও রাত্রি অন্তে দিবা হইয়া থাকে; তদ্রূপ ঈশ্বর, সৃষ্টি অন্তে প্রলয়, ও প্রলয় অন্তে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহার আদি ও অন্ত নাই, ও কখন নিবৃত্তিও হইবেক না। ইহা প্রবাহরূপে নিত্য চলিয়া আসিতেছে। তবে কল্পে কল্পে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বলিয়া আদ্যন্ত বিবেচনা করা যাইতেছে। যদ্যপি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে অনন্ত বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু ইহা কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করা হয় নাই; অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি পশু হউক, ও অমুক ব্যক্তি মনুষ্য অথবা অন্য জাতি হউক বলিয়া প্রথম সৃষ্টি হয় নাই। কারণ সৃষ্টির আদিতে অন্য কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন না যে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি হইবেক। তবে অনন্ত প্রকার বস্তুর সৃষ্টি এই প্রকারে হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের আত্ম-শক্তি ক্রমে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রকাশ হওয়ায়, ঐ ত্রিগুণা মায়া অঘটন ঘটনা পটীয়সী বিধায় ঐ ত্রিগুণার সহিত ঈশ্বর মিলিত হইয়া, পূর্ব্বকল্পের বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের সৃষ্টিতে যত প্রকার পদার্থ ও জাতির সৃষ্টি হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের যে জাতির যেপ্রকার আকৃতি ও কর্ম্মছিল তাহা স্মরণ করিয়া গুণ বিভাগের দ্বারা, ঐ বিভাগের ন্যূনাধিক সহকারে নানা প্রকার বস্তু ও জাতি এবং আকৃতি ও কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন।* অতএব প্রকৃতির বিভিন্নতা জন্য জগতের বস্তুর বিভিন্নতা হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতির বিভিন্ন-তার কারণ এই যে, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতি বিভাগ দ্বারা সৃষ্টির নানা বস্তু হইয়াছে। তাহাতে সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক হইয়াছে। এবং গুণের অধিক ও অল্পতা জন্য জীব সকল নানা যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণাধিক্যে দেবযোনি, ও রজোগুণাধিক্যে মনুষ্যযোনি, তমো-গুণাধিক্যে তীর্য্যক, অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ গুল্ম লতা প্রভৃতি যোনিতে দেহধারণ হইয়াছে। এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে ঐ সকল গুণের

---

* অধিকরণ মালার ২য় অধ্যায়ের ১ম পদের ১২ শ্লোকান্তর্গত শারীরিক সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা উপরি উক্ত সিদ্ধান্তের সহিত ঐক্য আছে। ইহা মনুর প্রথমাধ্যায়ে ১২।২৮।৩০। শ্লোকে আছে।

ন্যূনাধিক ক্রমে নানাবর্ণ হইয়াছে। এবং দেহভেদে ঐ সকল গুণের অধিক ও অল্প লক্ষণ ও কার্য্য সকল প্রকাশ হইয়াছে। যথা সত্ত্বগুণের লক্ষণ আত্মাতে প্রীতিযুক্ত ও প্রশান্তভাব। এবং রজোগুণের লক্ষণ রাগ, দ্বেষ, ও দুঃখানুবিদ্ধ, অপ্রীতিজনক, বিষয় স্পৃহা। তমোগুণের লক্ষণ; অজ্ঞান, ও সদসদ্বিবেকশূন্য বুদ্ধি, ভ্রান্ত। গুণের কার্য্য যথা, বেদাভ্যাস, তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয় সংযম, পরমাত্মচিন্তা, ও জ্ঞানের বিষয় জানিতে চেষ্টা করিয়া লজ্জিত না হওয়া, এবং আত্মার তুষ্টি জন্য কর্ম্ম করা, ইত্যাদি সত্ত্বগুণের কার্য্য। ও ফল কামনায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অল্প অর্থে অসন্তুষ্ট, নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণ, অজস্র বিষয়োপভোগ, কেবল ইহকালে খ্যাতি লাভের জন্য কর্ম্মকরণ, তাহার ফলের অভাবে দুঃখানুভব করা, রজোগুণের কার্য্য। আর বহুধনে লালসা, ও অল্পধনে কাতরতা, পরোক্ষে পরদোষ কথন, ও পরলোক নাই এরূপ বুদ্ধি, ও আচারভ্রষ্টতা, ও ধনসত্ত্বেও ভিক্ষা, ধর্ম্মকর্ম্মে অনবধান এবং লজ্জিত-কর্ম্ম-করা ইত্যাদি তমোগুণের কার্য্য। এই সকল বিষয় ন্যূনাধিক ক্রমে সকল দেহেই হইয়া থাকে। এই প্রকারে উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে সৃষ্টি হইয়াছিল।* কিন্তু ইহাতেও ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ বলা যাইতে পারে না। কেননা প্রকৃতির গুণ বিভাগে স্বভাবতঃ ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতিও কর্ম্ম সকল হইয়াছিল। তাহাতেও প্রথম সৃষ্টির সময়ে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয় নাই; ও তাহার সম্ভাবনা ছিল না। যদি বল যে, পরমেশ্বর গুণ ও কর্ম্ম বিভাগের দ্বারা ছোট বড় নানা প্রকার কর্ম্মের নিয়মাধীন করায় তাঁহার বৈষম্য দোষ হইয়াছে? তাহা বলিতে পার না? কেননা ঈশ্বর নানা প্রকার সৃষ্টি করিলেও সকল বস্তু ত্রিগুণাত্মক এবং পাঞ্চ-ভৌতিক রূপে সৃষ্টি করায়, এবং তাহার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আহার ব্যবহারাদি বিষয়ে কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী না করায়, এবং সকল প্রাণীকে সুখ দুঃখে মিশ্রিত করায় তাঁহার কোন দোষ নাই। তিনি পশুপক্ষীদিগের শীত গ্রীষ্ম নিবারণের নিমিত্ত লোম ও পাখা ইত্যাদি

* মনু ১২ অধ্যায় ২৪শ অবধি ৪১শ শ্লোক হইতে এই সকল বিষয় উদ্ধৃত করা গেল তদ্ভিন্ন সাত্ত্বিকাদি আহার বিহার ইত্যাদি অনেক ব্যাপার, ভগবদ্গীতা ও মনু ইত্যাদিতে লেখা আছে তাহা সকল উদ্ধৃত করা হইল না।

নানা প্রকার কৌশল করিয়াছেন, যাহা দেখিলে তাঁহাকে পরমদয়ালু বলিয়া বোধ হয়। যদি বল যে, মর্ত্ত্যলোকবাসীদিগের মধ্যে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাতে মনুষ্যাদিরা তাঁহাকে জানিয়া, প্রলয়ের পূর্ব্বেও মুক্তিলাভ করিতে পারে, ও পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষ গুল্ম লতা প্রভৃতিরা তাহাকে জানিতে, এবং মুক্তিলাভ করিতে পারেনা ইহা দোষের কার্য্য? তাহাতে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে আছে যে, ইহারাও ক্রমে ক্রমে ৮০শী অথবা ৮৪শী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতঃ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবেক, এবং তাহাদিগের পশুপক্ষী যোনিতে কোন দুঃখ না পাইলে মুক্তির প্রয়োজন কি? মনুষ্যেরা পশুপক্ষীদিগকে দুঃখী বিবেচনা করেন বটে, ফলতঃ বিচার করিয়া দেখিলে তাহারা দুঃখী নহে। কেননা বন্য পশুপক্ষী ইত্যাদি জন্তুসকল স্বাধীন, ও তাহাদিগের আহার নিদ্রা প্রভৃতির কোন দুঃখ নাই।* চিরদিন সমভাবে থাকে; পরমায়ু শেষ হইলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। ইহাতে তাহারা বরং মনুষ্য অপেক্ষা সুখী; কেননা যে সকল জন্তুর বুদ্ধি অধিক, এবং যাহারা দুঃখাদি সম্যক বিবেচনা করিতে পারে, তাহাদিগেরই অধিক দুঃখানুভব হয়। যাহাদিগের জ্ঞান অতি অল্প সুখ দুঃখাদি সম্যক বিবেচনা করিতে পারেনা, তাহাদিগের দুঃখ অতি অল্পমাত্র বলা যায়, তবে গ্রাম্যপশুর বিষয় পশ্চাৎ বিবেচনা করা যাইবেক। অতএব পরমেশ্বর সুখ দুঃখে মিশ্রিত করিয়া সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার দ্বেষ্য ও প্রিয় কেহ নাই, তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে আছেন। তবে ত্রিগুণের বিভাগে যে ছোট বড় ও ভালমন্দ ইত্যাদি দ্বৈতভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন, সে কেবল লীলা বিস্তারকরণ জন্যই হইয়াছে; কেননা ছোট না হইলে, বড় জানা যাইত না; মূর্খ না থাকিলে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইত না; দুঃখ না থাকিলে সুখ জ্ঞান হইত না, শ্রম না করিলে বিশ্রাম সুখানুভব হইত না; ইহা দোষের কারণ নহে। তবে কেহ রোগী, ও কেহ শোকী ও কেহ দরিদ্র, ও কেহ অধীন ইত্যাদি; এবং কেহ অরোগী ও কেহ শোকহীন ও কেহ ধনী ইত্যাদি যাহা এক্ষণে মনুষ্য মধ্যে দেখা যায়, ইহাতে সকলের

* যাহার যে ভক্ষ্যদ্রব্য তাহা ভোজনে সকলেই সমান তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে।

কর্ত্তা ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, ঐ সকল বিষয়ে ঈশ্বরের দোষ নাই, উহা মনুষ্যদিগের স্বকর্ম্ম বশতঃ হইয়া থাকে। কেননা ঈশ্বর প্রথম সৃষ্টিকালে, গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।* অর্থাৎ সত্ত্ব গুণাধিক্যে ব্রাহ্মণ; তাহার কার্য্য ব্যবস্থা প্রকাশ, ও যজ্ঞাদি কার্য্য সাধন দ্বারা জগত কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করা, রজোগুণাধিক্যে ক্ষত্রিয়। তাহার কার্য্য প্রজাপালনাদি। ও রজস্তমোগুণাধিক্যে বৈশ্য। তাহার কার্য্য কৃষি বাণিজ্যাদি। তমোগুণাধিক্যে শূদ্র। তাহার কার্য্য সেবা ও শিল্পাদি প্রস্তুত করা। এই সকল কার্য্যসাধন জন্য, পৃথক্ পৃথক্ নামরূপধারী জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা সকলেই স্বাভাবিক সুখ ও দুঃখে মিশ্রিত ছিল। রোগ শোক ও দারিদ্র্য প্রভৃতি অন্য কোন দুঃখ তাহাদিগের ছিলনা কারণ এই যে, প্রথম সৃষ্টি হওয়ায় অগ্রে সত্যযুগ হইয়াছিল। মনুর প্রথম অধ্যায়ের ৮১শী শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, প্রথম সত্যযুগে সকল ধর্ম্মই সম্পূর্ণ চতুষ্পাদাবস্থায় ছিল; এবং লোক সকল শাস্ত্রবিধিমতে স্ব স্ব কার্য্য করিত, ও অধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা ধন বিদ্যা অর্জ্জন করিত না; ও তাহারা অরোগী ও শোকবিহীন ছিল: তাহাদিগের অকাল মৃত্যু ছিলনা, ও কামনা সকল সিদ্ধি হইত, এবং অন্য কোন দুঃখ ছিলনা। ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত বটে। তদনন্তর প্রতি সত্যযুগে ঐ প্রকার ভাগ্যবান লোক সকল জন্মগ্রহণ করাতে ঐ প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় যে, প্রথম সত্যযুগে কোন বৈষম্য দোষ ছিল না। তদনন্তর ত্রেতাযুগে একপাদ অধর্ম্ম, দ্বাপরে দ্বিপাদ, কলিতে ত্রিপাদ অধর্ম্ম সঞ্চার হওয়াতে, লোকে ক্রমশঃ রোগ শোক ও দারিদ্র্য এবং অকাল মৃত্যু প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখ ভোগ

---

* চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তার মপিমাং বিদ্ধ্য কর্ত্তার মব্যয়ং ॥
ইতি ভগবদ্গীতায়াং ১৪ অধ্যায় ১৩ শ্লোক।

ইহার অর্থ। ভগবান্ বলেন যে, গুণ কর্ম্ম বিভাগের দ্বারা আমি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহার কর্ত্তা আমি ও অকর্ত্তাও আমি, তাৎপর্য্য এই আমার দ্বারায় হওয়ায় আমি কর্ত্তা। এবং গুণ কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা হওয়ায়, ও কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি না করায় আমি অকর্ত্তা, অর্থাৎ আমাতে বৈষম্য দোষ নাই।

করিতেছে। এই অধর্ম্ম প্রথমতঃ লোকের মনের বাসনা হইতে উত্থিত হইয়া; তদনন্তর বাচনিক ও কায়িক পাপসকল ঘটনা হইয়াছে। অর্থাৎ বাসনাই কর্ম্মসূত্র; তাহা হইতে কর্ম্ম, এবং কর্ম্ম হইতে অদৃষ্ট জন্মে; এবং তাহাতে জন্মান্তরে সুখ দুঃখ ভোগ, ও নানা যোনি প্রাপ্ত হইতে থাকে। মনুর দ্বাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে আছে যে, শরীরজ কর্ম্মের দ্বারা বৃক্ষ গুল্ম লতা প্রভৃতি নানা যোনি প্রাপ্ত, এবং বাক্যগত পাপ দ্বারা পশু পক্ষী যোনি; ও মানস পাপ দ্বারা হীনজাতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এবং মনুর ঐ অধ্যায়েতে আছে যে, নানা প্রকার পাপের দ্বারা নানা রোগ ও দরিদ্র ও শোকগ্রস্ত হয়। এবং শাস্ত্রবিধি ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ জন্য ভিন্ন ভিন্নজাতি প্রাপ্ত হয়। এবং ভিন্ন বর্ণের কন্যা পুত্র সংযোগে নানাবর্ণ উৎপত্তি হইযাছে। এবং ভিন্নবর্ণের ব্যবসা ভিন্নবর্ণে করাতে ক্রমাধীন অভিমান বৃদ্ধি হইয়া নানা প্রকার সুখ দুঃখাদি হইতেছে। এই সকল মনুষ্যাদিরা স্বাধীনতা হেতু অবিবেক বশতঃ কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল প্রাপ্ত রূপ অবান্তর সুখ দুঃখ ভোগ করে; তাহাতে সৃজন কর্ত্তার বৈষম্য দোষ হইতে পারে না। বরং সৃষ্টিকর্ত্তা যেরূপ মনুষ্যদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন; তদ্রূপ শাস্ত্র ও গুরুর সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং বিবেক বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছেন; লোকে তাহা পরিপালন না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মন্দকার্য্য করিয়া স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিবেক তাহাতে কর্ত্তার দোষ কি। তবে লোকে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে কুকর্ম্ম করে, তাহাকে ঈশ্বর শাস্তি দেন; ইহা তাঁহার দোষের কার্য্য নহে। কেননা পাপের শাস্তি না দিলে জগৎ কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া প্রজারা উচ্ছিন্ন যায়। যদি বল যে, তিনি দয়ালু শাস্তি না দিয়া ক্ষমা করিলেই পারেন? কিন্তু তাঁহার শাস্তি দেওয়াই লোকের হিত করা বিবেচনা করিতে হইবেক। কেননা মাতা পিতা, যে বালককে তাড়না করেন, তাহা কেবল বালকের হিতের জন্যই হইয়া থাকে; কারণ বালক পুনরায় আর ঐ কুকর্ম্ম না করে। তদ্রূপ পরমেশ্বর পাপ নিবারণ হওয়ার জন্য শাস্তি দিয়া থাকেন। অর্থাৎ লোকে একবার শাস্তি পাইলে পুনরায় ঐ রূপ কুকর্ম্ম করিবে না বলিয়াই শাস্তি দেন, এবং এইজন্য ঈশ্বর ইহকালে রাজা ও রাজদণ্ড, এবং পরকালে যমযাতনার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দয়া গুণের প্রকাশ ব্যতীত

নির্দয়তা দোষ নাই। তবে গ্রাম্য ও পালিত পশুপক্ষীর যে সুখ দুঃখ দেখা যাইতেছে, ইহারা তত্ত্ববিবেক পরিচালন করিতে সক্ষম নহে? ইহাতে বক্তব্য এই যে গ্রাম্য ও পালিত পশুপক্ষীরা পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য ছিল, তাহাদিগের কর্ম্মদোষে পশুপক্ষী যোনি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মের তারতম্যের ফলানুসারে ঐ ঐ যোনিতে ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। নতুবা স্বাভাবিক পশু পক্ষীদিগের অবান্তর সুখ দুঃখ নাই। যদি বল ঈশ্বর যে, স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া তাহা প্রলয়, অর্থাৎ বিনাশ করেন? ইহাতে তাঁহার কৃত প্রণাশ, নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নির্দয়তা দোষ হইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর প্রলয় করাতে তাঁহার নির্দয়তা দোষ নাই। কেন না পরমার্থ বিচারে তিনি আপন কার্য্য সকল আপনিই লয় করেন; তাহাতে পরের অনিষ্ট নাই। যেমন বালক ধূলি দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং তাহা ভগ্ন করিয়া থাকে। তদ্রূপ মায়ার দ্বারা মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কেবল মায়িক কার্য্য তাহা রহিত হইলেই লয় হইয়া থাকে। তবে ব্যবহারিক বিষয়ে যে দোষ বলা যায় তাহা দোষ নহে। কেন না জগৎ স্থিতিকালে, লোক কুকর্ম্মের দ্বারা নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে মোচন হয় না। আকল্প পর্য্যন্ত কেহ কেহ নরক ভোগ করিতে থাকে। এজন্য ঐ ঐ সকল জীবকে মুক্তি দিবার জন্য ঈশ্বর মহাপ্রলয় করিয়া থাকেন। তাহাতে বস্তু মাত্রের বিনাশ হইলে, জীব সকল অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে; ইহাতে ঈশ্বরের নির্দয়তা দোষ নাই, বরং দয়ার কার্য্যই বলিতে হইবেক। অতএব ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই। জীব, ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া, পরে প্রবৃত্তি ধর্ম্মানুসারে স্বকর্ম্ম বশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ, ও নানা যোনি প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে থাকে। অতএব ঐ জীবের স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করা যাউক। এই পর্য্যন্ত লিখিয়া দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করা হইল।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

জীবের স্বরূপ নির্ণয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ, এবং মন ও বুদ্ধি; এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত* যুক্ত শরীরকে লিঙ্গ শরীর, অথবা সূক্ষ্ম শরীর বলা যায়। এই শরীরে অহঙ্কারাভিমানী চৈতন্য প্রতিবিম্ব অর্থাৎ চৈতন্যাভাসকে জীব বলে†। কেহ কেহ দেহস্থিত চৈতন্যাংশকে জীব বলেন‡। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্য এক বস্তু আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপী; কিন্তু দেহ স্থিত চৈতন্য দুই প্রকার অপহ্নাপন্ন। তাহার এক প্রকার নির্গুণ কূটস্থ চৈতন্য, যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপী নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, ঐ চৈতন্যের যে অংশে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সংযোগ হইয়া ব্রহ্ম তেজস্বরূপ বিদ্যমান আছে সে তাহার অংশ। যাহাকে দীপ কলিকাকার বলিয়া তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দুই প্রকার চৈতন্য দেহেতে আছেন। ইহার প্রথম প্রকার অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্যের নাম পরমাত্মা; ও দ্বিতীয় প্রকার দীপ কলিকাকারের নাম জীবাত্মা। ইহা দেহ দ্বারা অনুমান করা যায়। ঐ দেহ তিন প্রকার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ§ দেহ। তাহাতে কূটস্থ চৈতন্য আকাশের ন্যায়, ঐ তিন দেহের মধ্যে ও বাহিরে এবং অভ্যন্তরে অর্থাৎ সর্ব্বত্র অখণ্ডরূপে আছেন। তিনি অনাবৃত ও নিষ্ক্রিয়। তবে

---

* রামগীতাতে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কথা আছে ইহা পরমাণু মাত্র।

† বেদান্ত দর্শনের মত।

‡ সাংখ্য মত।

§ স্থূল দেহ লোম চর্ম্ম রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এবং নাড়ী ইত্যাদি মিলিত দেহ। সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দেহের মধ্যস্থিত চৈতন্যের অংশকে পরমাত্মা বলা যায় বটে; ঐ অংশ ঘটাকাশ, অর্থাৎ ঘটস্থিত আকাশের ন্যায়, অংশরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ঘটাকাশ যেমন মহা আকাশের সহিত যোগ আছে। আর দীপ কলিকাকার ত্রিগুণাত্মক সগুণ তেজোময় ব্রহ্মের অংশ, কারণ শরীর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। প্রথমত স্থূল দেহ, যাহা সর্ব্বদা দেখা যায়, ও ব্যবহার করা যায়; ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহার মধ্যে কারণ শরীব রহিয়াছে ঐ কারণ শরীরস্থিত চৈতন্যই জীব। ইহার প্রতিবিম্ব অর্থাৎ আভাস সূক্ষ্ম শরীরে লাগে; ঐ আভাসকেও জীব বলা যায়; এই জীব সুখ দুঃখের ভোক্তা যে হেতু কারণ শরীরের নিকটবর্ত্তী সূক্ষ্ম শরীবস্থ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল ঐ চৈতন্যের আশ্রয়ে কার্য্য সাধন কবে বলিয়া সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে; কারণ শরীরস্থ জীব কর্ম্ম করেন না, ও সুখ দুঃখের ভাগী হয়েন না; তাঁহার নাম প্রাজ্ঞ, এবং অন্তরাত্মা; ইনি সগুণ ব্রহ্মের অংশ, ইনি সূক্ষ্ম শরীরস্থ জীবেব অদৃষ্টাসাবে কর্ম্ম ফল প্রদান করেন। প্রকৃত পক্ষে, সূক্ষ্ম শরীরস্থ জীবের চৈতন্যাংশেব সুখ দুঃখ নাই, কেবল মন বুদ্ধির সুখ ও দুঃখ আছে। তাৎপর্য্য এই যে, সূক্ষ্ম শরীরে যে আভাস লাগে, তাহা মিথ্যা; কেন না সে আভাস এইরূপ, অর্থাৎ যেমন জবা ফুল একটী স্ফটীকের নিকট থাকিলে ঐ জবা পুষ্পের রক্ত আভা স্ফটীকে লাগে তাহাতে স্ফটীকটী রক্তবর্ণ বোধ হয়, তদ্রূপ কারণ শরীরস্থ জীবের আভাস মন বুদ্ধিতে লাগে; মন ও বুদ্ধি তাহার সাহায্যে কর্ম্ম করিতে থাকে, এবং সুখ দুঃখভাগী হয়। জীব মন বুদ্ধিব সন্নিধান বশতঃ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত স্বয়ং সুখী ও দুঃখী বোধ করে। নতুবা চৈতন্যাংশে কোন সুখ দুঃখ নাই ও হইতেও পারে না।* আর স্থূল শরীরে যে আভাস লাগে তাহাও ঐরূপ বটে। ইহার উদাহরণ এই যে, যেমন একখানি গৃহের মধ্যে একটী কাঁচের পাত্র অর্থাৎ লণ্ঠন থাকে, তাহার মধ্যে একটী বাতি জ্বলে; ঐ লণ্ঠন হইতে যে আলো বাহির হয়, তাহা সকল ঘরে লাগিতে থাকে, ঘরও তজ্জন্য আলোকময় দেখা যায়; যদি ঐ লণ্ঠনটী ঘর হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়, তবে ঐ ঘরে কেবল আকাশ মাত্র

* ভগবতীগীতা।

থাকে; আর কিছুই দেখা যায় না; এবং গৃহস্থিত লোক লণ্ঠন লইয়া যাওয়ায় ঐ গৃহে কোন কর্ম্ম হয় না; তদ্রূপ এই স্থূল দেহ গৃহস্বরূপ, এবং লণ্ঠনটী সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায়, ও বাতিটী কারণ শরীর স্বরূপ; ঐ গৃহস্থিত মনুষ্যাদিরা মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়স্বরূপ, এবং গৃহস্থিত আকাশ পরমাত্মার স্বরূপ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, বাতির জলন্ত শিখাটী চৈতন্য পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ইহাতে বাতি ও লণ্ঠন, কারণ ও সূক্ষ্ম, শরীরের ন্যায় একত্রে থাকে; এবং বাতির শিখার আলোকেতে যে কর্ম্ম সকল হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোক নিজে কিছু কর্ম্ম করে না, অথচ আলোক ভিন্ন কোন কর্ম্ম হয় না; ও আলোক ঘর হইতে বাহির হইলে, লোক সকল বাহির হইয়া যায়।* তদ্রূপ সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর পরলোক গমন করিলে, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রাণ সকল তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়; সুতরাং শূন্য ঘর পড়িয়া থাকার ন্যায় স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে; এবং আকাশ কোন স্থানে যায় না। তদ্রূপ পরমাত্মাও চলেন না। এবং আলোকেতে যে মনুষ্যেরা কর্ম্ম করে, তাহারা তাহার ফলভাগী হয়; তদ্রূপ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ ফলভাগী হয়। অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ করে। যদ্যপি এই উদাহরণে মনুষ্যগণকে মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সহিত, এবং লণ্ঠনটীকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সহিত উপমা দেওয়া কিছু অসঙ্গত হইতেছে; কারণ লণ্ঠন গেলে যে মনুষ্যও যাইবেক ইহা সম্ভব নহে। ফলত এইরূপ ভাবিয়া লওয়া যাউক যে, মনুষ্যেরা মন বুদ্ধির ন্যায় লণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ঠন লইয়া যাওয়ার সম্ভব আছে; নতুবা লণ্ঠন নিজে চলে না; ইহাতে এই উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ শাস্ত্রে আছে যে, জীব মুক্তি লাভ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করিলে আর পরলোকে যায় না। এস্থলে দেখা যায় যে, বাতিটী পুড়িয়া গেলে আলো নির্ব্বাণ হইলে লণ্ঠনটী আর চলে না। এই বিষয় বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া নানাপ্রকার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ফলিতার্থে আত্মা অগ্নির স্বরূপ নহে; তিনি জ্ঞানস্বরূপ তাঁহাকে আশ্রয় করতঃ এই স্থূল দেহের মধ্যস্থিত পৃথক্‌রূপে যে,

* অর্থাৎ লোকেরা লণ্ঠন সহিত আলোক লইয়া যায়।

কারণ ও সূক্ষ্ম শরীরস্থ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আছে, তাহারা সকলই স্ব স্ব কার্য্য করে; ও পরকালে যাতায়াত করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে বিভাগ করতঃ তিনটী শরীর হইয়াছে। তাহার মধ্যে কারণ শরীরের সহিত জীব চৈতন্য অধিক সন্নিকটস্থ প্রকৃতির সহিত সংযোগ ভাবে থাকায় তাহাকে জীব বলা যায়। এবং তাহার কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থানে সূক্ষ্ম শরীর পৃথক্ ভাবে থাকায় তাহাতে আভাস কল্পনা করিয়া তাহাকেও জীব বলা যায়।* ফলতঃ জীব একই বটে, কেবল কার্য্যসম্বন্ধে দুই প্রকার বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যের নাম জীব; তাহাতে কারণ শরীর উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যাংশ কর্ম্মফলদাতা; ও সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট চৈতন্যাভাস মন বুদ্ধি সহকারে কর্ম্ম করেন বলিয়া, কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা ইহাদিগের উপাধি অনিত্য, ও চৈতন্যাংশ নিত্য, অর্থাৎ উপাধির সৃষ্টি ও প্রলয় আছে। চৈতন্যের সৃষ্টি প্রলয় নাই। ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, জীব অনাদি; ও তাহার অদৃষ্টও অনাদি। এবং সেই অদৃষ্ট বশতঃ পুন পুনঃ নানা যোনি ভ্রমণ করে, ও সুখ দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবং অদৃষ্টবশতঃ কর্ম্ম করে তজ্জন্য পুনরায় অদৃষ্ট জন্মে; তাহাতে কর্ম্ম আদি, কিম্বা অদৃষ্ট আদি, তাহার নির্ণয় নাই। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ হইয়া বীজ হয়; তদ্রূপ কর্ম্ম হইতে অদৃষ্ট, এবং অদৃষ্ট হইতে কর্ম্ম; এবং ঈশ্বর, জীবের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত অদৃষ্টানুসারে সৃষ্টি করেন। জীব জ্ঞানবান। কোন পদার্থ তাহার কতকগুলি গুণ আছে; অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন; এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ এবং চিন্তা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশ গুণ আত্মাতে আছে। এমতাবস্থায় বলা হইল যে, জড় ও চৈতন্য উভয় সংযোগে জীব হইয়াছে। কেন না জ্ঞানবান পদার্থ জীব; এবং তাহাতে গুণ আছে। ইহাকে দুইটী বস্তুর যোগ বলিতে হইবে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, উপরে জীবের লক্ষণ, যে সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট চৈতন্যাভাস; অথবা অংশকে জীব বলা হইয়াছে; তাহার সহিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রভেদ নাই।

* [illegible] আভাস [illegible] হেতু তাহাকে বিশ্ব নামক আভাস জীব বলা হইয়াছে।

কারণ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য; অর্থাৎ জ্ঞানই জীব; অথবা জ্ঞানবিশিষ্ট বস্তুই জীব হউক; উভয় পদার্থ সংযোগ ব্যতীত জীব হওয়া কেহই বলেন না। তবে নিত্যানিত্য বিষয়ও ঐরূপ; কেন না উপাধি অনিত্য, ও চৈতন্যাংশ নিত্য। ইহা বহুতর মতে স্বীকৃত হইবেক তজ্জন্য ইহাকে গৌণনিত্য বলা হইয়াছে। যেহেতু মহাপ্রলয় সময়ে শক্তিমচ্চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।* পরে উপাধির সৃষ্টি হইলে, তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া জীব হয়, ইহার সন্দেহ নাই। তবে ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা যে, জীব নিত্য বলিয়াছেন, তাহা গৌণনিত্যই বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক। তাহা পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্রপ্রকরণে বলা হইয়াছে। আর কর্ম্ম আদি কি অদৃষ্ট আদি এ বিষয় যে, অনবস্থা দোষ ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগের সিদ্ধান্ত নহে; সে কেবল নাস্তিককে নিরাশ করণ জন্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কেন না উপাধির সৃষ্টি হইলে, তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া জীব সৃষ্টি হয়। পরে ঐ জীব স্থূল দেহ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে অদৃষ্ট জন্মে; ইহাতে অগ্রে কর্ম্ম, পরে অদৃষ্ট, তৎপরে ফলভোগ হইতে পারে। এ বিষয়ে, ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ না থাকাও, পূর্ব্ব অধ্যায়ে মীমাংসা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ সৃষ্টির আদি কারণ পরমেশ্বর, তাঁহা হইতে যখন সৃষ্টি হওয়া সকলেই স্বীকার করেন, তখন পূর্ব্বে জীব ছিল, ও তাহার কর্ম্ম দৃষ্টে পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন এ কথা বলা অসঙ্গত। কেন না ন্যায়শাস্ত্রের ভাষাপরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে† যে, পরমেশ্বর সংসার বৃক্ষের বীজস্বরূপ। তাঁহাকে নমস্কার করি। এই বীজ বলাতে তাঁহাকে উপাদান, ও নিমিত্ত কারণ, দুই বলা হইয়াছে। কেবল নিমিত্ত কারণ বলা হয় নাই; কেন না বীজ শব্দে যে কারণ বুঝায়, তাহা উপাদান কারণই হইতে পারে; বরং কারণ শব্দের অর্থের দ্বারা নিমিত্ত কারণ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পরমেশ্বর স্বাধীন; তিনি কর্ম্মের অধীন হইয়া প্রথম সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। তবে দৈনন্দিন প্রলয়ান্তে যে সৃষ্টি হয়,

* ন্যায়শাস্ত্রের নব্য মতে মহাপ্রলয় স্বীকার আছে।

† নূতন জলধররুচয়ে গোপবধূটী দুকূল চৌরায়
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়।

তাহাতে জীবের নাশ না হওয়ায় পুনঃ সৃষ্টি কালে জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মের জন্য অদৃষ্টবশতঃ নানা যোনি প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ইহাও ঈশ্বরের নিয়মে হয়; জীবের অদৃষ্ট জন্য ঐ সৃষ্টি হয় না। এই সকল বিষয় পূর্ব্বে মীমাংসা হইয়াছে। বাস্তবিক সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যস্থিত কারণ শরীরবিশিষ্ট চৈতন্যাংশই জীব। ঐ জীব অবিদ্যার বশীভূত হইয়া, নানা দেহ ধারণ করতঃ ব্যবহারিক অবস্থায় সুখ দুঃখ ভোগ করে। ঐ কারণ ও সূক্ষ্ম শরীর একত্রে পরলোক যাতায়াত করে। কিন্তু পরমার্থতঃ চৈতন্যাংশে সুখ দুঃখ হয় না, তাহা ঈশ্বরের অংশ; তবে সুখ দুঃখ মানসিক ধর্ম্ম, তাহা মনের হয়। কিন্তু জীব অজ্ঞানবশতঃ, আমি সুখী আমি দুঃখী এই বিবেচনা করে। কারণ চৈতন্যাংশ অজ্ঞানে আবৃত থাকায়, ঐরূপ ঘটনা হয়; নতুবা জীব ও ঈশ্বর বস্তু এক। যদি বল যে, জীব ও ঈশ্বর এক বস্তু হইলে, জীবের সুখ দুঃখ কিজন্য অনুভব হয়? তাহাতে বক্তব্য এই যে, জীব ও ঈশ্বর এক বস্তু হইলেও উপাধি ও কার্য্যগত ও শক্তিগত ভেদ আছে। কারণ ঈশ্বর মায়াকে বশীভূতা করিয়াছেন, ও জীব মায়ার বশীভূত রহিয়াছেন। ঈশ্বর প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী, ও জীব অজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞানী। ঈশ্বর বৃহৎ চৈতন্য পদার্থ, জীব অতি অল্প অর্থাৎ বিদীর্ণকেশের সহস্রাংশের একাংশ তুল্য। চৈতন্য পদার্থ* ঈশ্বর কর্ত্তা ও জীব অধীন। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব ভোক্তা। ঈশ্বর উপাস্য, জীব উপাসক। তিনি রাজা, জীব প্রজার স্বরূপ। অতএব উভয়ে এক বস্তু হইলেও, শক্তিগত ভেদ আছে। যেমন সমুদ্র বৃহৎ জলময় পদার্থ, তাহাতে অর্ণবপোত প্রভৃতি অনায়াসে ডুবাইতে পারে। কিন্তু ঐ জল একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তে থাকিলে, পিপীলিকা পরিমাণ নৌকাও ডুবাইতে পারে না। উভয় জলই এক বস্তু বটে, অর্থাৎ জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বর একই বস্তু হইলেও, শক্তিগত ও কার্য্যগত অনেক বিভিন্ন। যদি ঐ জীব কালেতে ঈশ্বর উপাসনা দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া কৈবল্য মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়া ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারে; যেমন

* পঞ্চদশীতে আছে।

গর্ত্তের জল সমুদ্রে পতিত হইলে, ঐ জল সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অভিন্নভাবে সমুদ্রের ক্ষমতা ধারণ করে, তদ্রূপ জীবেরও ঐরূপ ক্ষমতা হইয়া উঠে। ফলতঃ যে কাল পর্য্যন্ত জীব ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি, ও মুক্তি লাভ না করে, ও যে কালপর্য্যন্ত মহাপ্রলয় না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত স্বকর্ম্ম বশতঃ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ঐ সুখ দুঃখ কিপ্রকার, তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুখ ও দুঃখ কি তাহা নির্ণয়।

সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম*, অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল সুখ, ও মনের অপ্রফুল্লই দুঃখ। সুখ দুঃখ কার্য্যানুমেয় নিরাকার পদার্থ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য দ্বারা মনেতে অনুমান হয়। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভব দ্বারা সুখ দুঃখের অনুমান হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল হেতু সাধ্য, অর্থাৎ সুখ দুঃখের হেতু থাকিলেই, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য পরিচালন দ্বারা সুখ দুঃখ হয়। এই সুখ দুঃখের হেতুর কারণ অদৃষ্ট, তাহা দুই প্রকার, অর্থাৎ স্বাভাবিক ও কর্ম্ম জন্য। স্বাভাবিক অদৃষ্ট ঈশ্বর ইচ্ছা ক্রমে যে নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে; তদনুসারে দুর্দ্দৈব এবং জন্ম মৃত্যু ও ক্ষুৎপিপাসাদি দুঃখ হইতে থাকে; তাহা নিবারণ জন্য মহাপ্রলয়। ও পান ভোজনাদি দ্বারা যে সুখ হয় তাহা; † এবং কর্ম্ম জন্য, অন্ধ বধিরাদি ও রোগ শোক প্রভৃতি দুঃখের কারণ। আরোগ্য এবং নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট উপভোগাদি সুখের কারণ। এই বিষয়ে যদ্যপি উক্ত দুই প্রকার অদৃষ্টই সুখ দুঃখের মূল

* ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সুখ দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম, কিন্তু আত্মার সহিত মনের যোগ থাকায়, ও ব্যবহারে অভিন্ন ভাব থাকায়, ইহাতে প্রভেদ নাই; তত্ত্ব-বিচারে আত্মার স্বরূপে কোন গুণ না থাকায়, সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্মই নিশ্চয় হয়।

† মহাপ্রলয় হইলে দুর্দ্দৈব ও জন্ম মৃত্যু নিবারণ হয় এবং পান ভোজন দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ হয়।

কারণ; মনুর গ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ের ১৬০ শ্লোকে আছে যে, সমস্ত বিষয়ে পরবশ দুঃখের কারণ, ও আত্মবশ অর্থাৎ স্ববশ সুখের কারণ।* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুখ দুই প্রকার, নিত্য-সুখ ও অনিত্য-সুখ। নিত্য সুখ এই যে, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরকে স্ববশে রাখিয়া ঈশ্বরে মন সমাধান পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি লাভ করতঃ সমাধি অবস্থায় থাকন কালে, অথবা সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া জ্ঞানীরূপে সংসারে বিচরণ করণ কালে সাংসারিক কোন বিষয়ের প্রয়োজন না থাকায় যে সুখানুভব হয় তাহাকে নিত্য সুখ বলা যায়। আর সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তি হইলে, যে সুখানুভব তাহাকে অনিত্য সুখ বলা যায়। কেন না প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তি হইয়া স্বীয় বশতাপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না, সময়ে ধ্বংস হয়, এবং সমুদায় প্রয়োজনীয় বস্তুও প্রাপ্তি হওয়া যায় না; এজন্য তাহাকে অনিত্য সুখ বলা যায়। যদি বল যে, কোন পুত্রবান অরোগী সম্রাট শোক বিহীন হইয়া আমরণ পর্য্যন্ত সমভাবে সস্ত্রীক থাকিয়া সুখানুভব করিলে, ঐ সুখকে নিত্য সুখ বলা যায় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, বৈষয়িক সমুদায় বিষয়ে, যে সুখ ভোগ করিতে পারে এমত ব্যক্তি সংসারে দেখা বা শুনা যায় না। তত্রাপি ঐ রূপ ঘটনা হইলেও তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখানুভব হয়; এবং পুনরায় যে, ঐ রূপ সুখের অবস্থা হইবেক তাহারও নিশ্চয় নাই। অতএব অনিত্য বিষয় প্রাপ্তি জন্য যে সুখ, তাহাকে অনিত্য সুখ বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই যুক্তি যুক্ত। এই রূপ দুঃখও নিত্য ও অনিত্য দুই প্রকার। যদ্যপি দুঃখ নিত্য হইতে পারে না; কিন্তু জীব আকল্প পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যাতনা রূপ দুঃখ ভোগ করিতে থাকায়, বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ রূপ ঘটনা হওয়াতে যে, দুঃখানুভব হয়; তাহাকে নিত্য দুঃখ বলা যায়। এবং অনিত্য দুঃখ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুর অপ্রাপ্তি, এবং প্রাপ্ত বিষয়ের বিনাশ বিধায়, যে দুঃখানুভব হয়, ঐ দুঃখকে অনিত্য দুঃখ বলা যায়। সুখ দুঃখের প্রভেদ জানিবার জন্য এই সকল লেখা হইল বটে, কিন্তু প্রাণিমাত্রই সুখ দুঃখে

* স্ববশ ও পরবশের মূলকারণ অদৃষ্ট।

জড়িত। তবে একজাতীয় দুঃখের অন্তে সুখ হয়; ও সুখের অন্তে দুঃখ হয় যেমন ধন পুত্র লাভে সুখ হয়, ও তদ্বিনাশে দুঃখ হয়। কিন্তু ভিন্ন জাতীয় সুখ দুঃখ এক-কালীন হইতে পারে; যেমন এক মুহূর্ত্তে লক্ষ মুদ্রা লাভ জন্য সুখানুভব হয়; আবার ঐ মুহূর্ত্তে একটী পুত্রের বিনাশ হওয়ায় দুঃখানুভব হইতে পারে। অতএব ব্যবহারিক অবস্থানুসারে সুখ দুঃখের বিবরণ এই পর্য্যন্ত লেখা হইল বটে; কিন্তু বাস্তবিক সুখ দুঃখ, ব্যক্তি ভেদের মনের গতি ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। কেন না কোন ব্যক্তি রাজ্য ও মণি লাভেও সুখী হয় না; বরং তাহা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়, এবং কোন ব্যক্তি পুত্র মরণেও দুঃখী হয় না; বরং কুপুত্র বিনাশে সুখী হইতে পারে। যদিচ বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে কথন কথন সুখ দুঃখের চিহ্ন অনুভব হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার মনের ভাব কি তাহা তিনিই জানেন, অন্য ব্যক্তির সাধ্য নাই। এতাবতায় জীবের স্ববশ ও পরবশই সুখ দুঃখের হেতু, মনুতে যে বলা হইয়াছে, তাহাই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত। কেননা স্ববশ অর্থাৎ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিতে পারিলে, জীব ইহকালে ও পরকালে সুখী হয়; এবং মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের বশতাপন্ন হইলে, জীব ইহকালে ও পরকালে দুঃখী হয়। তাৎপর্য্য এই যে, মনাদি স্ববশে থাকিলে, ঐ মনাদিকে আপনার আত্মীয় বলা যায়; ও মনাদি অবশ হইলে, তাহাদের বশীভূত হওয়াকে পরবশ বলা যায়। সুতরাং জীব তাহাদিগের বশে থাকিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অতএব জীবের ইহকালে যে সুখ দুঃখ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। পরকালে সুখ দুঃখ হয় কি না তাহা জানিতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, পরকালে সুখ দুঃখ আছে। তবে পরকালে সুখ দুঃখ থাকা নির্ণয় করিবার অগ্রে এই নির্ণয় করা আবশ্যক যে, জীবের পরলোক গমন হয় কি না, ও হইলে তাহা কিপ্রকার হয়, তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

জীবের পরলোকে গমন হয় কি না, ও হইলে কিপ্রকারে হয় তাহা নির্ণয়।

বহুতর শাস্ত্রে আছে যে, জীব পরলোক গমন করতঃ, স্বর্গ ও নরক ভোগ করে। তাহাতে মরণোত্তর এই প্রকারে গমন হয় যে, দৃশ্যমান স্থূল দেহ সকল অতিব্যক্ত জড় পদার্থ এই দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহা সকলেরই অনুভব হয়। কারণ, সূক্ষ্ম দেহ মন বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ প্রাণ যাহা কেহ দেখিতে পায় না, অথচ তদ্দ্বারা এই স্থূল দেহ পরিচালিত হয়। এবং ঐ সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে মিলিত ভাবে কারণ দেহ আছে তাহাও কেহ দেখিতে পায় না। ঐ সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহ হইতে যে পৃথক তাহার সন্দেহ নাই। কেননা মনুষ্যের মরণ হইলে জীব স্থূল দেহ পরিত্যাগ করাতে, ঐ স্থূল দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, ঐ দেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না ; বরং ক্রমে ক্রমে স্থূল পঞ্চভূতের বৈকারিক দেহ স্থিত পদার্থ সকল, স্ব স্ব কারণে মিশ্রিত হয় ; অর্থাৎ পার্থিবাংশ পৃথিবীতে, জলীয় অংশ জলে, ও তেজের অংশ তেজে, ও বায়ুর অংশ বায়ুতে, ও আকাশের অংশ আকাশে, এইরূপ স্থূল ভূত সকল স্থূল ভূতে মিলিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কিন্তু মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সকল পদার্থ দ্বারা স্থূল দেহ চালনা হইত, তাহা কোথায় যায় ; এবং ঐ সকল পদার্থ যে শরীরের মধ্যে থাকে, এ কথার সন্দেহ নাই, তবে সুতরাং অনুভব হয় যে, তাহা স্থানান্তরে যায়। যদি বল যে, মন প্রাণ ইত্যাদি সহযোগে আত্মা যে পরলোকে যায়, ইহা সম্ভব নহে? কারণ অদর্শনীয় পদার্থ যে গমন করে, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, অদর্শনীয় বস্তু যে গমন করিয়া কার্য্য করে, তাহা উদাহরণের দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যেমন বিদ্যুতীয় যন্ত্রের সংবাদ অর্থাৎ তারের সংবাদ যে প্রকার দূর হইতে প্রেরণ হয়, অথচ সকল তার নড়ে না, কেবল যে স্থানে সংবাদ যায় তথায়

একটী কাঁটা নড়িতে থাকে, তাহাতে সংবাদটী জানা যায়; অথচ ঐ সংবাদ যে চলিতেছে তাহা কেহ দেখিতে ও শুনিতে পায় না; তদ্রূপ জীবাত্মা লিঙ্গ শরীরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রাণ বায়ুসহ যোগে বিদ্যুতীয় গতির ন্যায় গতি-বিশিষ্ট হইয়া পরলোকে গমন করে; এ বিষয় আর সংশয় হইতে পারেনা।* তবে যদি বল যে কারণও সূক্ষ্ম। শরীরে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রা ও পরমাণু রূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এমত স্থলে ঐ দেহ গমনকালে কিজন্য দেখা যায় না? তাহার উত্তর এই যে, ঐ সকল পদার্থ অতিশয় সূক্ষ্ম বিধায় তাহা স্থূলচক্ষে দেখা যায় না, কেবল যোগীরা জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পান; এবং পরলোকে উপস্থিত হইলে ঈশ্বর ইচ্ছা-ক্রমে তাহা কিছু স্থূলভাবাপন্ন হইতে থাকে; তাহাতে তথায় দর্শন হইতে পারে ইহা পরে ব্যক্ত করা যাইবেক। বাস্তবিক জীব যখন পরলোকে গমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কারণ ও সূক্ষ্ম শরীর, এবং পাপ পুণ্যের ফল প্রভৃতি অদর্শনীয় পদার্থ সকল গমন করে।† কেবল স্থূল দেহ ও নাড়িকা এবং উদরস্থ অন্যান্য দর্শনীয় পদার্থ সকল পড়িয়া থাকে। ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ বটে। যদি বলা যায় যে, জীব প্রাণবায়ু সহকারে পরলোক গমন করে; তৎকালে স্থূল বায়ুর সহিত ঐ বায়ু মিলিত হইতে পারে; তাহা হয় না। কেননা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পঞ্চীকরণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া স্থূল ভূত হইয়াছে; তাহার সহিত সূক্ষ্ম ভূতের মিলিত হওয়ার সম্ভব নাই। বাস্তবিক তাহা হইতে পারিলে মনুষ্যাদির জীবনকালেও শ্বাস প্রশ্বা-সের সহিত স্থূল বায়ুর যোগ হইয়া মিশ্রিত হইতে পারিত। অতএব স্থূলবায়ুর সহিত প্রাণবায়ু মিলিত হয় না। যদি বল যে, মন প্রাণাদি স্থূল দেহের গুণ, তাহা ঐ দেহ হইতে পৃথক নহে। যেমন দ্রব্যের নাশ হইলে, গুণের নাশ হয়; তদ্রূপ স্থূল দেহের নাশ হইলে, মন প্রাণাদির নাশ হয়; ইহা সঙ্গত নহে। কেননা মৃতদেহ বর্ত্তমান থাকারকালীন মন প্রাণাদি কোথায়

* শাস্ত্রে আছে যে, জীব কর্ম্ম, তিথি ও নক্ষত্র বিশেষে মরিলে ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং ভূত হওয়াও যে প্রত্যক্ষ, তাহাও সর্ব্বদা শুনা যায় ও জানা যায়; তাহাতে জীব দেহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে।

† ভগবদ্গীতার ১৫শ অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

থাকে ; যদি মন প্রাণাদি স্থূল দেহের গুণ হয় ; তবে স্থূলদেহ মৃত হইয়া বর্ত্তমান থাকারকালীন অবশ্যই ঐ দেহে থাকা সম্ভব ; তাহা হইলে মৃত্যুই হয় না। যদি বল যে স্থূলদেহের শক্তির হ্রাস হইলে, মন প্রাণাদির বিনাশ হয় ; সুতরাং মৃত্যু হইতে পারে। এবং রোগাদির দ্বারাও স্থূলদেহে আঘাত প্রাপ্ত হইলে, তদ্দ্বারা, এবং মস্তকচ্ছেদনাদি দ্বারা শক্তির হ্রাস হইতে পারে। অতএব শক্তির হ্রাস হইলে, মন প্রাণাদির বিনাশ হইয়া মৃত্যু হয়, ইহা সঙ্গত নহে। কেননা মৃত্যুর মূল কারণ শক্তির হ্রাস, ও বিনাশ নহে ; মৃত্যুর মূল কারণ জীবের উৎক্রামণ অর্থাৎ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করা। তদ্ভিন্ন শক্তির হ্রাস হওয়ায় যে, কখন কখন মৃত্যু ঘটনা হয়, উহা সহকারি কারণ মাত্র। যেহেতু কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, স্থূলদেহে কোন রোগ নাই, এবং আঘাতাদি প্রাপ্তও হয় নাই, অথচ মরিয়া যায় ; তাহার কোন সহকারি কারণ লক্ষিত হয় না তবে কেন মৃত্যু হয় ? এবং ভেদ বমন প্রভৃতির রোগী মৃত্যুদশায় পতিত হইয়াও মরে না ? অতএব এই বিষয়ে শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা এইরূপ নিরূপণ হইয়াছে যে, পরমায়ু শেষ হইলে জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করায় মন প্রাণাদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে ; ইহাই সঙ্গত। শক্তির হ্রাস ও বিনাশে মৃত্যু হওয়া সঙ্গত নহে। কেননা স্থূলদেহের শক্তি স্বীকার করিলে, তাহা গুণ পদার্থের ন্যায় হয় ; অর্থাৎ দ্রব্যের বিনাশ এককালিন না হইলে, ঐ শক্তির বিনাশ হয় না, যেহেতু গুণ পদার্থ দ্রব্যের সর্ব্বাবয়বে থাকে। অতএব স্থূলদেহের সর্ব্বত্রই মন প্রাণাদি থাকার সম্ভব। তবে মস্তক ছেদন হইলেও মৃত্যু হইতে পারে না ? বরং স্কন্ধ হইতে নূতন মস্তক অঙ্কুরের ন্যায় উত্থিত হইতে পারে ? অতএব স্থূলদেহ হইতে ঐ শক্তিকে পৃথক বিবেচনা করিলে, তাহা স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভব থাকায় মস্তক ছেদন হইলে মন প্রাণাদিসহ স্থানান্তরিত হয় ; সুতরাং মৃত্যু হইতে পারে।* বাস্তবিক স্থূলদেহ জড়পদার্থ ; তাহাতে চেতনাশক্তির আবির্ভাব হইলে, ঐ দেহ পরিচালন হয় ; এবং স্থানান্তরিত হইলে, ঐ দেহ পরিচালন হয় না। এতদ্বিষয় জীবের পুনর্জন্ম হওয়ার অধ্যায়ে আরো পরিষ্কাররূপে

* অচলপ্রাণিবৃক্ষাদির সর্ব্বাবয়বে প্রাণবায়ু থাকায় তাহা নিঃশেষ না হইলে তাহার নাশ হয় না। সচল প্রাণির সূক্ষ্ম দেহের উৎক্রামণ হয়।

মীমাংসা করা যাইবেক। এক্ষণে কেবল মৃত্যুর বিষয় মীমাংসা করা যাইতেছে। এতদ্বিষয়ে মনুর ১ম অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে আছে যে, যে সময়ে অজ্ঞান অর্থাৎ তমোগুণে জীব ইন্দ্রিয়ের সহিত আবৃত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে না; সেই সময় জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলেন যে, জীবের উৎক্রামণ হইলে, মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির উৎক্রামণ অর্থাৎ স্থানান্তরে গমন হয়। শূন্য গৃহের ন্যায় স্থূলদেহ পড়িয়া থাকে। যেমন গৃহের মধ্যস্থিত প্রদীপ স্থানান্তরিত হইলে, অন্ধকারময় শূন্য গৃহ থাকে; তদ্রূপ কারণ ও সূক্ষ্ম শরীরস্থ জীব, অর্থাৎ শক্তিমচ্চৈতন্যাংশ, যাহা অবিদ্যা মায়ার বশতাপন্ন হইয়া যন্ত্রের স্বরূপ স্থূল দেহের মধ্যে প্রবেশ করতঃ কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরলোকগমন করায়, স্থূলদেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, আত্ম মনঃ সংযোগ ধ্বংসের নাম মৃত্যু। তাহার কারণ এই যে, আত্ম শব্দের অর্থ আপনার অর্থাৎ নিজের মন, যাহা স্থূলদেহের সহিত সংযুক্তভাবে থাকা অনুভব হয়; তাহার ধ্বংস, অর্থাৎ দেহ হইতে মনের পৃথকত্ব হইলে মৃত্যু হয়। ইহার দ্বারা এইরূপ নির্ণয় হয় যে, দেহ হইতে মন আত্মার ও প্রাণের সহিত পরলোকগমন করিলেই দেহ হইতে পৃথক হয়। নতুবা আত্মা অর্থাৎ জীব হইতে মন পৃথক হয় না। তবে যে সময় জীব জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, তখন প্রকৃতি ও মন বুদ্ধি ইত্যাদি আত্মাতে লয়প্রাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া দেহ অবসানে মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যাওয়াতে, আর আত্মা, অর্থাৎ জীবাত্মার উৎক্রামণ অর্থাৎ পরলোকে গমন হয় না। তদ্ভিন্ন মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব যতবার দেহত্যাগ করে, ততবার পরলোকে গমন করতঃ স্বর্গ অথবা নরকভোগ করে। এক্ষণে পরলোকে স্বর্গ ও নরকভোগ কিপ্রকারে হয়, তাহা নির্ণয় করা যাউক্।

চতুর্থ অধ্যায়।

জীবের পরলোকে স্বর্গ ও নরকভোগ কি প্রকারে হয়, তাহা নির্ণয়।

মনুর দ্বাদশাধ্যায়ে ২০ হইতে ২২ শ্লোকদ্বারা প্রকাশ যে, জীব এই স্থূল দেহে অবস্থিতি করিয়া যে সকল ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম করে, তজ্জন্য পরলোকে গমন করতঃ অন্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গ অথবা নরক ভোগ করে। যদি অল্প ধর্ম্ম এবং অধিক অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে নরক-যাতনা সহ্য করিতে পারে এরূপ কঠিনদেহ হইয়া নরক ভোগ করে। এবং অল্প অধর্ম্ম ও অধিক ধর্ম্ম করে, তবে সর্গ ভোগ করিতে পারে এরূপ দেহ হইয়া ভোগ করিতে থাকে। জীব যখন স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; তখন অধিকাংশ পাপ করিয়া প্রেত দেহ ধারণ করত, যমকিঙ্করের যাতনা সহ্য করিতে থাকে। তৎকালে জীব আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ু ভূত নিরাশ্রয়রূপে থাকে। তদনন্তর এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে এক একটী দেহ ধারণ করে। তাহার পরে অল্প পুণ্য জন্য অল্পকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া পরে নরক ভোগ করে। মনুর চতুর্থ অধ্যায় ৮৮ শ্লোকে নরকের নাম নির্দ্দিষ্ট করা আছে; যথা তামিস্র, (অন্ধকারময়) অন্ধ তামিস্র, (নিবিড় অন্ধকার) মহারৌরব, ও রৌরব, (অতিশয় তপ্ত ভূমি) কালসূত্র, (কুলাল চক্রের সূত্র দ্বারা ছেদন স্বরূপ) মহানরক, (যাহাতে সর্ব্ব অংশে পীড়া) সঞ্জীবন, (যাহাতে বাঁচাইয়া পুনরায় মারে) মহাবীচি, (যাহাতে অত্যন্ত জলতরঙ্গ) তপন, (অগ্নি আদি দ্বারা দাহরূপ) সম্প্রতাপন, কুম্ভীপাক, (যাহাতে কুম্ভে ক্ষেপ করে) সংঘাত, (যাহাতে অল্প স্থানে অনেকের বাস) কাকোল, (যাহাতে কাকে ভক্ষণ করে) কুড্মলং, (যাহাতে রজ্জু দ্বারা পীড়া) পূতিমৃত্তিক, (যাহাতে বিষ্ঠা-গন্ধি মৃত্তিকা) লোহশঙ্কু, (যাহাতে সূচি দ্বারা ভেদন) ঋজীষ, (তপ্ত পিঠের খোলায় প্রক্ষেপ) পন্থান, (বারম্বার গমনাগমন) শাল্মলী, (যাহাতে শাল্মলী কণ্টক প্রভৃতি দ্বারা ভেদ) নদী, (বৈতরণী প্রভৃতি যে সকল নদী দুর্গন্ধ রুধির পূর্ণ অস্থি ক্লেশরূপ তরঙ্গ

শাল্মিনী উষ্ণ জল যুক্তা ও বেগবতী, তাহাতে ভাসাইয়া লইয়া যায়) অসিপত্রবন, (যাহার পত্র সকল খড়্গের ন্যায় ধারাল তদ্দ্বারা বিদারণ করে) লোহদারক, (যাহাতে লৌহ শৃঙ্খলের দ্বারা নিগড় বন্ধন করে)। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে অনেক নরকের নাম বর্ণিত হইয়াছে। পাপ বিশেষে জীবগণ বিশেষ বিশেষ নরক ভোগ করে; এবং নরক অসংখ্য প্রকার আছে; তাহা সমুদায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এবং যে যে পাপে, যে যে প্রকার নরক ভোগ হয় তাহাও বিষ্ণুপুরাণের ঐ অধ্যায়ে, এবং অন্যান্য পুরাণে আছে, তাহা লিখিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হইয়া পড়ে বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া গেল*। যাহারা অধিক পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছে, ঐ জীবেরা স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রেত দেহ ধারণ করে; কিন্তু অধিক যাতনা হয় না; তাহাদের অল্প পাপের তারতম্যানুসারে, নরক দর্শন বা অল্পকাল নরকবিশেষ ভোগ করিয়া পরিশেষে দেবলোকে বহুকাল বাস করে†। তথায় উত্তম স্থানে বাস, অপূর্ব্ব পান ভোজন, এবং স্ত্রী সঙ্গ, ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ উত্তম শয্যায় শয়নাদি করে; কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। এবং যাহারা পাপ পুণ্য সমান করে, তাহারাও তুল্যরূপে স্বর্গ ও নরক ভোগ করে। যাহারা এককালীন পুণ্য কর্ম্ম করে নাই কেবল পাপ করিয়াছে, তাহারা কেবল নরক ভোগ করে। ও যাহারা এককালে পাপ কর্ম্ম করে নাই; এবং যাহারা পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে তাহারা কেবল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকে কখন নরক ভোগ করে না। ও যাহারা অবান্তর পাপ পুণ্য না করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম মত কর্ম্ম কার্য্য করিয়া মরে; তাহারা পিতৃলোকে বাস করে। তথায় স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু যিনি যে লোকেই বাস করুন না কেন ইহার সীমা আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয় পর্য্যন্ত থাকেন; তদনন্তর পুনর্ব্বার স্বকর্ম্ম বশতঃ নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ঐ প্রলয় সময়ে স্বর্গ ও নরকস্থান সকল বিলুপ্ত হওয়াতে জীব ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করিয়া তদনন্তর পুনরায় স্থূল দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে।

---

* নরক স্থান যমালয়ের দক্ষিণ দিকে আছে, শাস্ত্রে বলে, এবং বিষ্ণুপুরাণের ঐ অধ্যায়ে বলেন যে পাতালের নীচেও নরকস্থান আছে। যমালয় সুমেরু পর্ব্বতের ঊর্দ্ধশৃঙ্গে দক্ষিণদিকে আছে।

† মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব দেখ।

কেবল যাহারা সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহারা পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করে না; ও তাহাদিগের মৃত্যু যাতনা ও স্বর্গ নরকাদি ভোগ হয় না। তাহাদিগের বিষয় মুক্তি প্রকরণে লেখা যাইবেক। এক্ষণে, জীবের স্বর্গ নরকাদি ভোগাবসানে কি প্রকার পুনর্জন্ম হয় তাহা নির্ণয় করা যাউক।

পঞ্চম অধ্যায়।

জীবের পুনর্জন্ম হয় কি না, ও হইলে কি প্রকারে হয় তাহা নির্ণয়।

জীবের পরজন্ম লিখিতে হইলে এই স্থলে প্রথম জন্মের কিয়দংশ লিখিতে হয়; নতুবা সহজে এক স্থানে বুঝা যায় না। প্রথমতঃ প্রজাপতি ব্রহ্মা সমুদায় সূক্ষ্ম দেহ, যাহার সংখ্যা নাই এমত পরিমাণে ঐ দেহ ও জীব সৃষ্ট করণানন্তর ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ নিয়মানুসারে ঐ জীব স্থূল দেহ ধারণ করেন। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, কতকগুলিন যোনিজ ও কতকগুলিন অযোনিজ, এবং অন্যপ্রকারে জীবগণ স্থূল দেহ ধারণ করেন। তন্মধ্যে কতকগুলিন মনুষ্য, ও কতকগুলিন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জলচর ও ভূচর, খেচর প্রভৃতি; ও কিয়দংশ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ইত্যাদি; ইহার মধ্যে মনুষ্যই প্রধান; কেন না তাহারা বিজ্ঞানবলে অনেক কার্য্য সাধন, ও মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেও মুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু দয়ালু ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যেরূপ আদি মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে; তদ্রূপ বৃক্ষ গুল্ম লতা ইত্যাদিরা চৌরাশী-লক্ষ-যোনি ভ্রমণ করতঃ ও পশু আদিরা আশী-লক্ষ-যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করে। তাহাদিগের অর্থাৎ ঐ আদি বৃক্ষ ও পশ্বাদির স্বর্গ নরক নাই; তাহারা অতি শীঘ্র এক যোনি হইতে প্রাণত্যাগ করিয়া অন্য যোনি প্রাপ্ত হয়। তবে মনুষ্যেরা কর্ম্মফলে, বৃক্ষাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদিগের স্বর্গ নরক ভোগ হইতে পারে। ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। ইহাতে আদি মনুষ্য, এবং আদি বৃক্ষাদি ও পশ্বাদি, যাহারা

ঈশ্বরের নিয়মানুসারে চৌরাশী অথবা আশী-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতঃ মনুষ্য হয়;* তাহাদিগের স্থূল দেহ ধারণ, এইরূপে হয় যে, তাহারা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিদিগের ইচ্ছানুরূপ প্রারব্ধের বশবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট জীব, শস্যগত হওনানন্তর শুক্রগত হয়; পরে ঐ শুক্র স্ত্রীর গর্ভ্তে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকের শোণিতের সহিত যোগ হইয়া, হস্ত পদাদি নানা অবয়বযুক্ত স্বাভাবিক দেহ ধারণ করে। উহা প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের গর্ভ্তে জরায়ু নামে একটী চর্ম্মবেষ্টিত থাকায়, জরায়ুজ নাম হইয়া থাকে। ঐ দেহে যতপ্রকার পদার্থের প্রয়োজন তৎসমুদায় প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি অদর্শনীয়, এবং দর্শনীয় পদার্থ সকল প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ পশ্বাদিরও হইয়া থাকে। পরে মনুষ্যেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে স্বাধীন মনের বাসনা দ্বারা ইচ্ছানুরূপ নানাপ্রকার কর্ম্ম করিয়া আয়ুঃ শেষ হইলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া পরলোকে গমন করতঃ স্বর্গ নরকাদি ভোগ করেন। ঐ ভোগাবসানে পূর্ব্ব কর্ম্ম বশতঃ অন্যান্য যোনি, অথবা মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হয়। ঐ জন্মে দুই প্রকার প্রারব্ধের বশবর্ত্তী হইতে থাকে; অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রারব্ধবশতঃ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। এবং পূর্ব্বকর্ম্ম জন্য তনু, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র, রিপু, ভার্য্যা, নিধন, (মৃত্যু) ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয়, ব্যয় এই দ্বাদশ প্রকার ভাব দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় নিবদ্ধ হইয়া, জন্মের প্রারম্ভে জীব কারণ ও সূক্ষ্ম শরীর সহ গমন করে। তৎকালে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, যাহা প্রারব্ধবদ্ধ হইল, তদ্ভিন্ন সঞ্চিত অনেক কর্ম্মফল জীবের সঙ্গে থাকিল তাহাকেও অদৃষ্ট বলা যায়। ঐ জীব চন্দ্রের সুধা সহযোগে শস্য মধ্যে পতিত হয়। জীব যদি বৃক্ষাদি যোনি প্রাপ্ত হয়, তবে স্থাবর বীজে প্রবেশ করে। আর যদি মনুষ্যাদি জন্তু শরীর প্রাপ্ত হয়; তবে জঙ্গম বীজে প্রবেশ করে।† ঐ জঙ্গমবীজরূপ শস্য পুরুষে ভোজন করিলে, ক্রমে ক্রমে রস, রক্ত, মাংস, মেধ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রগত হয়। পরে স্ত্রীলোকের শরীরে

---

* এই আদি মনুষ্যপদে, যাহারা পিতৃলোক হইতে জন্মিয়াছে তাহারা। পিতৃলোকের জন্ম অন্য প্রকারে হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

† মনুর ৯ম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।

রজোযোগ হইলে, ঐ স্ত্রীর উদরে পুরুষ হইতে প্রবিষ্ট ও শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া জরায়ুচর্ম্মে বেষ্টিত থাকিয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অঙ্কুর হইতে থাকে। পরে পঞ্চম মাসে চৈতন্যাংশের প্রকাশ হইয়া সপ্তম মাস পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় আদি সম্যক্‌রূপে প্রকাশ হয়। ক্রমে জীবের জ্ঞানোদয় হইয়া পূর্ব্ব জন্মের মন্দকর্ম্মফলে যে যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহাই ভাবিয়া খেদ করিতে থাকে; এবং বলে যে, আর মন্দ কর্ম্ম করিব না, কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করিব। তদনন্তর সপ্তম মাস হইতে, দশম মাস পর্য্যন্ত প্রসব-কাল নির্ণয় আছে। কিন্তু কখন কখন তাহার অধিক কালেও প্রসব হয়। প্রসব হইয়া জীব ভূমিষ্ঠ হইলে, ঐশ্বরিক মায়ার প্রভাবে, ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া যায়।* তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বাল্য, পোগণ্ড, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ, আতুর, (অতিশয় বৃদ্ধ) হইয়া প্রারব্ধের ফলভোগ করিতে থাকে। ঐ প্রারব্ধবশতঃ জীব বাল্য প্রভৃতি কালের মধ্যে কোন সময়ে আয়ুঃ শেষ হইলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আবার পরলোকে গমন করতঃ স্বর্গ নরকাদি ভোগ করে। এইরূপে মুক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বারম্বার যাতায়াত কবিতে থাকে। কোন কোন কুতর্কবাদীরা বলেন যে, পঞ্চভূতের সারাংশ হইতে শস্যাদি উৎপন্ন হয়; তাহা ভোজনের দ্বারা শুক্রশোণিত জন্মে। ঐ শুক্র শোণিত সহযোগে দেহের উৎপত্তি হয়। ঐ দেহের শক্তি অর্থাৎ গুণ বিশেষ মন প্রাণ ইত্যাদি, তাহা দেহ হইতে জন্মায়। ঐ দেহের শক্তির হ্রাস বা বিনাশ হইলে, মন, প্রাণ, জ্ঞান ইত্যাদির বিনাশ হয়। জীব কোন স্থান হইতে আইসে না, ও কোন স্থানে যায় না। প্রথমতঃ পিতা মাতার কর্ম্মদোষে বা গুণ দ্বারা, জীবেব ভাল মন্দ হয়। তদনন্তর মনুষ্যের স্বকার্য্য বশতঃ ইহকালে সুখ দুঃখাদি ভোগ করে। অদৃষ্টানুসারে যে সুখ দুঃখাদি ভোগ হয় ইহা সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ বস্তুর স্বভাবে দেহ হয়; পরে পিতা মাতার ও নিজের স্বভাবে সুখ দুঃখাদি প্রাপ্ত হইতে থাকে; এইরূপ অনেক কুতর্ক করিয়া থাকেন। এই কুতর্কের মূল আলোচনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইতে

* ভগবতী গীতায়াং। ১৭ অধ্যায়।

পারে; কিন্তু পূর্ব্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় মীমাংসা করা হইয়াছে। তাঁহার দ্বারা স্থষ্টি ইত্যাদির কার্য্য হওয়া, ও জীবের পূর্ব্বজন্ম, এবং পরজন্মাদি নিয়ম নিবন্ধ হওয়া, ও জীবের পূর্ব্বজন্মের স্বকর্ম্মবশতঃ সুখ দুঃখাদির ভোগ হওয়া ইত্যাদির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তবে এক্ষণে কেবল শুক্র শোণিতের স্বভাবে দেহ, ও তন্মধ্যস্থিত মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি ঐ দেহের গুণস্বরূপ হয় কি না? এবং পিতা মাতার ও আপনার কার্য্যবশতঃ ইহকালে ফল ভোগ করা সঙ্গত কি না? তাহার মীমাংসা করা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাউক যে, স্থূল মৃত্তিকা হইতে শস্যাদি জন্মে; তাহা হইতে শুক্র শোণিত হয়। যদি স্থূল মৃত্তিকায় মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি না থাকে, তবে শস্য মধ্যে তাহা থাকিবেক না; এবং শুক্র শোণিতেও ঐ সকল পদার্থ জন্মিতে পারে না। কেন না কারণে যে গুণ না থাকে, তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভব নহে। তাহাতে প্রকাশ যে, স্থূল ভূতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি নাই। ঐ ভূত কেবল ব্যক্ত জড়পদার্থ মাত্র। যদি উহাতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে মৃত্তিকা, জল ও তেজ ও বায়ুরা কথা কহিত; এবং মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিত। তাহা না পারায়, সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, স্থূল ভূতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি নাই। যদি অসঙ্গতরূপে এই কথা বল যে, স্থূল ভূতাদি কারণে ঐ সকল গুণ না থাকিলেও, শুক্র শোণিতের স্বভাব-বশতঃ যখন দেহ উৎপন্ন হয়, তখন ঐ দেহের গুণ মন বুদ্ধি ইত্যাদি হইতে পারে? তাহাতে দেখা যাউক যে, ঈশ্বরের নিয়ম ও অদৃষ্ট সহকারে কারণ ব্যতীত শুক্র শোণিতের স্বভাব বশতঃ কেহ উৎপন্ন হয় কি না? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহা হইতে পারে না। কেন না শত শত রজোযুক্তা স্ত্রীতে শুক্র নিক্ষেপ হওয়াতেও সন্তান হয় না। যদি বল যে, পীড়া প্রযুক্ত অথবা দোষযুক্ত শুক্র শোণিত যোগ হওয়ায় দেহ উৎপন্ন হয় না। তবে স্বভাব অপেক্ষা পীড়া বলবতী বিবেচনা করিতে হয়। ইহাতে স্বভাব বলবান্ অথবা নিত্যসিদ্ধ নহে? তবে স্বভাব স্বীকার করা বিফল? আর শস্যাদি ভোজনে শুক্রাদি জন্মায় তাহাই বা দূষিত কেন হয়? ইহার কারণ কি? যদি বল যে, কোন দ্রব্যের গুণে ঐ রূপ দূষিত শুক্রাদি জন্মায়, তাহা নির্ণয় করা যায় না, অথচ ঐরূপ ঘটনা হয়। কিন্তু যাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় না, তাহাকে

অদৃষ্ট বলিলেই যথেষ্ট হয়। যদি তাহাও না বলিয়া কেবল শুক্র শোণিতের গুণের দ্বারা দেহ হয় বল? তবে দেহ সকল অসমান কিজন্য হয়? এবং নানাপ্রকার বর্ণ হওয়ার কারণ কি। যদি বল, যে যে দ্রব্য ভক্ষণে শুক্র শোণিত জন্মে, সেই সেই দ্রব্যের গুণেতে বিভিন্ন বর্ণ হয়? ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, যেরূপ নানা প্রকার দ্রব্য ভক্ষণে এতদ্দেশে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়া নানা বর্ণ হয়; তদ্রূপ অন্য দেশীয় লোকেরা তাহা হয় না; ববং দেশভেদে একরূপ বর্ণই দেখা যায়, তাহারা এদেশীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও বর্ণ বিভিন্ন হয় না। যদি বল পিতা মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়? তাহাও নহে। কারণ পিতা মাতা কৃষ্ণবর্ণ, তাহার সন্তান গৌরবর্ণ হয়। অথবা অন্য প্রকার বর্ণের পিতা মাতার সন্তান, অন্য প্রকার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। আরও দেখা যায় যে, মনুষ্য ও পশু ইত্যাদির আকৃতি সকল বিভিন্ন হয়। এমন কি এ পর্য্যন্ত যতলোক দেখা গিয়াছে তাহার কাহারু আকৃতির সহিত কাহারু তুলনা হয় না। ইহা কথনই শুক্র শোণিতের গুণ নহে; কেননা এক শুক্রশোণিতে এককালীন দুই তিন, অথবা চারটী পুত্র কন্যা একগর্ব্ভে যমজ রূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগেরও আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিশেষতঃ জড়পদার্থ যে শুক্র শোণিত তাহা দ্বারা স্থূলদেহ জড়ের উৎপন্ন হয় বটে; কিন্তু তাহাতে চৈতন্য পদার্থ যে জ্ঞান, বুদ্ধি, মন, ইত্যাদি, তাহাদিগের জন্ম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অতএব এই বিষয়ে, সিদ্ধান্ত এই যে, মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়, তাহা দেহের গুণ নহে; স্বতন্ত্র পদার্থ; উহা জীবের সহিত পরলোকগমন; ও পুনর্ব্বার শুক্রশোণিতের যোগে দেহধারণাদি কার্য্য করে। ঐ দেহ হইবার সহকারি কারণ পিতা মাতা; এবং শস্য ভোজন, ও শুক্রশোণিতের দোষগুণ, দেশ-কাল ইত্যাদি। এর মূলকারণ ঈশ্বরের নিয়ম ও অদৃষ্ট। যেরূপ চক্র, দণ্ড, সলিল, মৃত্তিকা, সহকারি ও উপাদান কারণ; ও কুম্ভকার মূল কারণ হইয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করে; তদ্রূপ জীবের দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে; তবে পিতা মাতা, ও আপনার স্বকার্য্যবশতঃ ইহকালে ফলভোগ হয় যে বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ সকলই ইচ্ছা করে যে, আমার সুখ হউক; ও আমার পুত্র সুখী হউক; দুঃখ কেহ ইচ্ছা করে না, তবে দুঃখ কিজন্য হয়? তাহা নিবারণ কেহ করিতে পারে না; ও ইচ্ছামত লভ্য হয় না; এতদ্বিষয়ে

অদৃষ্টবশতঃ ঘটনা হওয়া স্বীকার করিতে হইবেক। এই অদৃষ্ট জন্মান্তরের কার্য্য; কেননা ইহজন্মে কেহ পাপ করিয়া শাস্তি পায় না; এবং তাহার উন্নতি হইতে দেখা যায়; এজন্য জন্মান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি জন্মান্তর স্বীকার করা যায়, তবে অদৃষ্টাধীন পরকালে স্বর্গ নরক ভোগ হওয়াও অসম্ভব নহে। তবে কোনস্থলে অদৃষ্টের প্রাধান্য, ও কোনস্থলে পুরুষকারের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার নির্ণয়।

শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, দৈব অর্থাৎ অদৃষ্ট ও পুরুষকার এবং কাল, এই তিন দ্বারা মনুষ্যাদির শুভাশুভফলপ্রাপ্তি হয়। এই অদৃষ্ট শব্দে প্রারব্ধ; প্রারব্ধ দুই প্রকার; স্বাভাবিক ও কর্ম্মজন্য। স্বাভাবিক প্রারব্ধ এই যে, ঈশ্বর প্রথম সৃষ্টিকালে যে জাতির যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মৈথুন, ও অন্যান্য কর্ম্ম যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা এবং কর্ম্মজন্য প্রারব্ধ অর্থাৎ কর্ম্মের ফল অদৃষ্ট তাহাই ভোগ হইবার যে নিয়ম ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিবদ্ধ হয় তাহা। ঐ কর্ম্ম তিন প্রকারে ঘটনা হয়। মানসিক বাচনিক ও কায়িক; এই তিন প্রকার কর্ম্মের কর্ত্তাই পুরুষ, অর্থাৎ জীব। কেননা পুরু-ষের মন হইতে বাসনা হয়।* তাহাতে পুরুষ সদসৎ বিবেক পরিচালন না করিয়া নানা প্রকার মনোরাজ্য করিতে থাকে। তাহাতে বাঞ্ছাকল্পতরু ঈশ্বর ঐ বাসনা পূরণ করেন; ইহা ঈশ্বরত্বের মহিমা। অতএব শুভাশুভ প্রত্যেক বাসনাই কর্ম্মসূত্র; ঐ কর্ম্মসূত্র হইতে কর্ম্মের চেষ্টা হয়, তাহা হইতে উদ্যোগ হয়, পরে সেই কর্ম্মকৃত হইয়া, তাহার ফলভোগ করে। ইহার মধ্যে মনের দৃঢ় বাসনা যত প্রকার হয়, তন্মধ্যে অগ্র পশ্চাৎক্রমে কতকগুলি প্রারব্ধ নিবদ্ধ হয়, ও কতকগুলি সঞ্চিত থাকে। ঐ সঞ্চিত কর্ম্ম

* মনুর ১২ অধ্যায় হইতে ৯ম শ্লোক।

পর-জন্মকালীন প্রারব্ধ নিবদ্ধ হইতে থাকে। এবং ঐ পর-জন্মে যত-প্রকার বাসনা করে, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকে। মনের অসংখ্য বাসনা প্রযুক্ত শীঘ্র কর্ম্মসূত্রের ক্ষয় হয় না। তবে এ বিষয়ের উপায় চতুর্থভাগে নির্ণয় করা যাইবেক। বাস্তবিক মনই সমুদায় অনর্থের মূল; এই মন হইতে সকল শুভাশুভ ঘটনা হয়। অতএব পুরুষকার হইতেই প্রারব্ধের উৎপত্তি হয়। এবং কাল তাহার সহকারি-কারণ হইয়া থাকে। কেননা পুরুষ যেকালে কর্ম্ম করে, পুনরায় সেই কালেই সেই কর্ম্মের ভোগ হয়; এবং যেকালে কর্ম্মের ফলভোগ হইবার নিয়ম থাকে, সেই কালেই কর্ম্মফল প্রাপ্তি হয়। যদ্যপি পুরুষকার হইতে প্রারব্ধ উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। যেমন কোষকার কীট অর্থাৎ গুটীপোকা হইতে সূত্র উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহাতে ঐ কীট আবদ্ধ হইয়া পড়ে; তদ্রূপ পুরুষকার হইতে কর্ম্মসূত্র উৎপন্ন হইয়া পুরুষ তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। পশ্চাৎ শুভাশুভ ফলভোগের নিমিত্ত পুরুষের চেষ্টা আপনি ঘটনা হইয়া থাকে; তখন পুরুষ তাহা নিবারণ করিতে পারে না। কর্ম্মজন্য প্রারব্ধ এতই প্রবল যে, স্বাভাবিক প্রারব্ধকে অতিক্রম করে। কেননা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যাহার যত প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইবার নিয়ম আছে, তাহা কর্ম্ম জন্য বিপরীত হইতে দেখা যায়; যথা অন্ধ, বধির, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, প্রভৃতি দেখা যায়। ইহার কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল জন্য ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে; ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম, ও শাস্ত্রকারেরা তাহাই বলিয়াছেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে যে, তনু, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয়, ব্যয়, এই দ্বাদশ বিষয়ে প্রারব্ধ পরিচালন হয় বলিয়াছেন, ঐ প্রারব্ধ দুই প্রকার; অর্থাৎ দৃঢ় যাহা খণ্ডন হয় না, এবং অদৃঢ় যাহা খণ্ডন হয়, অর্থাৎ নিয়মাধীন ঘটনা হয়। তন্মধ্যে দৃঢ় প্রারব্ধ স্থলে, প্রারব্ধের প্রাধান্য; ও অদৃঢ় প্রারব্ধ স্থলে পুরুষকারের প্রাধান্য; কাল এই উভয়ের সহকারি কারণ। কেননা কাল উপস্থিত না হইলে প্রারব্ধের ঘটনা হয় না; ও পুরুষকারের চেষ্টা বিফল হয়। ঈশ্বরের এইরূপ নিয়ম যে শুভাশুভ ফলাবহ, কর্ম্মকালীন, অদৃষ্ট ও পুরুষকারের চেষ্টা, এবং কাল, এই তিন এক যোগ হয়। তবে পুরুষকারের চেষ্টা তিন প্রকার; যথা স্বতঃ ইচ্ছা, ও

অনিচ্ছা পরেচ্ছা ক্রমে ঐ চেষ্টা হয়। যেস্থলে প্রত্যক্ষ-ফল-জনক কর্ম্ম হই-বার দৃঢ় প্রারব্ধ আছে, সেস্থলে প্রারব্ধের বলবত্ত প্রযুক্ত পুরুষকারের চেষ্টা আপনিই হইয়া থাকে; এবং নিয়মিতকালেই অদৃষ্টবশতঃ ঐ চেষ্টা হয়। তাহার উদাহরণ এই যে, যেস্থলে পুত্র জন্মাইবার দৃঢ় প্রারব্ধ আছে, তৎকালীন স্ত্রীর রজো যোগ উপস্থিত হয়; এবং ইচ্ছাবশতঃ স্ত্রী পুরুষের মিলন হয়; স্ত্রী নিকটে না থাকিলেও কোন না কোন ঘটনাধীন নিকটে উপস্থিত হয়। এস্থলে শরীর অপটুতা থাকিলেও অনিচ্ছাবশতঃ মিলন হইয়া থাকে। এবং কোনব্যক্তি পথিমধ্যে গমন করিতেছে, ভারবহন করিতে তাহার ইচ্ছা নাই, কিন্তু রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ভারবহন করায়; এস্থলে তাহার অনিচ্ছা থাকিলেও পরেচ্ছাবশতঃ ভার বহন করিতে হয়। কোন বালক তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে রাজার দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করতঃ রাজপদে অভিষিক্ত করা যায়; এ স্থলে কেবল পরেচ্ছাবশতঃ ঘটনা হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির বজ্রাঘাতে অথবা প্রাসাদ ভগ্ন হইয়া মস্তকে পতিত হওয়ায় মৃত্যু হয়; এস্থলে স্বতঃ ইচ্ছা অথবা পরেচ্ছা না থাকায় অনিচ্ছাবশতঃ মৃত্যু ঘটনা হয়। এই সকল স্থলে দৃঢ় প্রারব্ধের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর যে কার্য্যে কোন ফললাভ হইবেক না বলিয়া দৃঢ় প্রারব্ধ থাকে, তাহাতে পুরুষকারের সম্যক চেষ্টা, ও সহকারী কাল তাহার অনুকূল হইলেও ফলপ্রাপ্তি হয় না। তাহার উদাহরণ এই যে, কোন ব্যক্তির পুত্র জন্মাইবে না বলিয়া দৃঢ় প্রারব্ধ থাকে; সেস্থলে স্ত্রীর ঋতু-কাল-সহকারে পুরুষকারের যথোচিত চেষ্টা, এবং নানা প্রকার ঔষধি প্রদান করিলেও কখনই সন্তান হয় না। আরও পুরুষকারের চেষ্টায় ধান্যাদি রোপন, অথবা বপন করে, কালেতে বৃষ্টি হইয়া শস্য উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয়, কিন্তু দুরদৃষ্টবশত বন্যার জলে নিমগ্ন হইয়া কিছুই প্রাপ্ত হয় না। আর কোন অনিবার্য্য ঘটনা বিষয়ে দৃঢ় প্রারব্ধের কাল উপস্থিত হয়; সেস্থলে পুরুষ-কারের চেষ্টায় নিবারণ হইতে পারে না; এবং চেষ্টাও ঘটে না। যথা কোন ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে তাহার মৃত্যু হইবেক, এইরূপ দৃঢ় প্রারব্ধ আছে; এস্থলে উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারাও রক্ষা পায় না; হয়ত উপ-যুক্ত বৈদ্য, অথবা ঔষধ পাওয়া যায় না। এবং উত্তম বৈদ্য, ও ব্যাধি কি

তাহা নির্ণয় করিতে পারে না, অথবা চিকিৎসার ইচ্ছাও থাকে না, কিম্বা অনিচ্ছাতে ঔষধ খায় না, এবং পরের ইচ্ছাও শুনে না; অতএব দৃঢ় প্রারব্ধের স্থলে পুরুষকারের চেষ্টার অপেক্ষা থাকে না; এবং চেষ্টা থাকিলেও অভিমত ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর অদৃঢ়, অর্থাৎ নিয়মাধীন খণ্ডনীয় প্রারব্ধের স্থলে পুরুষকারের চেষ্টার প্রয়োজন; তাহা চেষ্টা ব্যতীত হয় না। কেননা প্রারব্ধে এইরূপ থাকে যে, যদি কোন কর্ম্ম করে তবে ফল প্রাপ্ত হইবেক। নতুবা কর্ম্ম না করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবেক না। যথা প্রারব্ধে এইরূপ থাকে যে, অধ্যয়ন করিলে বিদ্বান হইবেক, এই স্থলে অধ্যয়নের নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা পুরুষের নিজের ইচ্ছা বশতই হউক অথবা তাহার নিজের অনিচ্ছা থাকিলেও পরেচ্ছা অর্থাৎ পিতা মাতা ও গুরু ইত্যাদির ইচ্ছাপূর্ব্বক অধ্যয়ন হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে ঘটনা হয় কিম্বা পরেচ্ছাক্রমে যে ঘটনা হয়, এবং ইচ্ছা ও পরেচ্ছাক্রমে যে কর্ম্মসিদ্ধি না হয় তাহাই দৃঢ় প্রারব্ধ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। আর যেস্থলে স্ব ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া ফল প্রাপ্তি হয়, সেস্থলে নিয়মাধীন প্রারব্ধ থাকা নির্ণয় করা যাইতে পারে। যদি বল যে, প্রারব্ধ দুই প্রকার হইবার কারণ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, যে সকল কর্ম্ম হইতে অদৃষ্ট জন্মিয়া প্রারব্ধ নিবদ্ধ হয়, তাহার তারতম্য অনুসারে প্রারব্ধ দুই প্রকার হইতে পারে। তাহার উদাহরণ এই যে, দ্রব্যাপহারক দস্যু চুরি করণকালে স্ত্রীলোকের নাসিকাভরণ চাহিয়া লয়, অথবা কখন নাসিকা ছিন্ন করিয়া লয়; ইহা উভয় কর্ম্মই পাপকার্য্য বটে, কিন্তু কর্ম্মগতিকের ফলানুসারে দৃঢ় বা অদৃঢ় প্রারব্ধ হইয়া থাকে। কামাতুর ব্যক্তি স্বদার অপ্রাপ্তে বেশ্যাসক্ত হয়; এবং নিজপত্নী সাক্ষাৎ থাকিতে তাহাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক বেশ্যাসক্ত হয়, এই উভয়ের পাপের তারতম্য অবশ্যই হইতে পারে। অত্যন্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান, ও দরিদ্রকে দান; এবং অক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান, এবং ধনীকে দান, এই উভয়ের পুণ্যের তারতম্য অনুসারে ফলের তারতম্য হইতে পারে। এই সকল কারণে দুই প্রকার প্রারব্ধ হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার প্রারব্ধ অনুসারেই লোকে ফল প্রাপ্ত হয়। যদি বলা যায় যে, দৃঢ় প্রারব্ধের ফল পুরুষ-কারের চেষ্টা ব্যতীতও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে পুরুষ-

কারের চেষ্টার প্রয়োজন কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, প্রারব্ধ দৃঢ়, কি নিয়মাধীন, তাহা অগ্রে জানিতে পারা যায় না; এবং প্রারব্ধ অদৃশ্য বস্তু বিধায় সংসারী লোকের পুরুষকার সহকারে সকল শুভ কর্ম্মের চেষ্টা ও উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। কেন না উদ্যোগী পুরুষ লক্ষ্মী লাভ করে; ইহা যুক্তি যুক্ত ও মনু এবং যোগ-বাশিষ্ঠ গ্রন্থে তাহাই বলিয়াছেন। বিশেষতঃ পুরুষ-কার হইতেই অদৃষ্ট জন্মিয়াছে, এজন্য পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। তবে উপযুক্ত চেষ্টা করিয়াও যদি শুভ ফল প্রাপ্ত না হয়, তবে জানা গেল যে, দৃঢ় প্রারব্ধ বশতঃ ঘটনা হইল না; ইহাতে পুরুষের কোন দোষ নাই। এবং বিনা চেষ্টায় শুভ বা অশুভ ফল প্রাপ্ত হইলেও, ঐ রূপ দৃঢ় প্রারব্ধ অনুভব করা যাইতে পারে। তাহা ক্বচিত ঘটনা হয়, এজন্য সমুদায় শুভ কর্ম্ম সাব-ধান পূর্ব্বক পুরুষকার সহকারে যত্ন ও উদ্যোগ দ্বারা করা উচিত। এবং অশুভ-কার্য্য সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যথা পীড়াদি বিপদ উপস্থিত হইলে, ঔষধি সেবন ও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করা কর্ত্তব্য; কারণ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা নানা প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। কেন না ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা অশুভ বিনাশ হইয়া শুভ ফল ঘটনা হইয়া থাকে। চৌর্য্য ও পারদর্য্যাদি কার্য্য কদাচ ইচ্ছা পূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা প্রারব্ধ দ্বারা কোন কোন স্থলে প্রতিবন্ধক হয় না। পুরাণে আছে যে, মার্কণ্ডেয় ঋষির জন্ম কালীন ৭ম দিবস পরমায়ু নির্ণয় হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা বর প্রাপ্তি হইয়া সপ্ত কল্প পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর সকলের কর্ত্তা; ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা দ্বারা নিয়মিত রূপে নৈমিত্তক অথবা কাম্য কর্ম্ম করিলে, তাঁহার তুষ্টি জন্মিতে পারে; তাহাতে অশুভ বিনাশ ও শুভ ফল প্রাপ্তি হইতে পারে। যদি বল যে, অনেক সময় দেখা যায় যে দৈব কর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা রূপ শান্তি স্বস্ত্যয়ন বিফল হয়? ইহার কারণ এই যে দৈব কর্ম্ম নিয়মিত রূপে হয় না; অর্থাৎ কর্ত্তার শ্রদ্ধা ও উপযুক্ত দ্রব্য ও পুরোহিত এবং মন্ত্রের অভাব বশতঃ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই বিষয় শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অঙ্গ ভঙ্গ হইলে ফল প্রাপ্ত হয় না; এবং মন্দ কর্ম্ম করিবার

অভিসন্ধি পূর্ব্বক কু-কর্ম্ম করিয়া বিপদাপন্ন হইলে, তাহাতে দুই একবার ঈশ্বরকে ডাকিলেও উদ্ধার হওয়ার সম্ভব নাই। কারণ তাহা হইলে পাপ কর্ম্মের শাস্তি হয় না। তবে অকস্মাৎ প্রয়োজন অথবা অনবধানতা বশতঃ বিপদাপন্ন হইলে ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হইয়া একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে অবশ্যই শুভ হইতে পারে; তাহার সন্দেহ নাই। যদি বল যে, যে স্থলে নিয়মাধীন প্রারব্ধ থাকে সেই স্থলে ঐ রূপ ঈশ্বরের উপাসনায় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু দৃঢ় প্রারব্ধের স্থলে ঘটে না? তাহাতে বক্তব্য এই যে, প্রারব্ধ দৃঢ় কি নিয়মাধীন তাহা অগ্রে জানা যায় না; এই জন্য উপাসনা আবশ্যক, তাহা উপযুক্ত রূপে সাধন করিয়া ফল না পাইলে ঐ রূপ অনুভব হইবেক। পরন্তু ঈশ্বরের উপাসনা যাহা মনেতে করা যাইতে পারে, তাহা অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা-রূপ যে প্রারব্ধ তাহাতে প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা কারাবদ্ধ ব্যক্তি মনে মনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারে; যদ্যপি তাহাতে দৃষ্ট ফল কিছুই না হয়, তথাপি জন্মান্তরে ফল প্রাপ্ত হইবেক; এবং প্রতিবন্ধ প্রারব্ধ না থাকিলে ইহ জন্মেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি, যে প্রকার অবস্থায় থাকুক না কেন, সকল সময়ে ঈশ্বর চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ইহা পুরুষকারের প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যদ্বারা ঋষিরা যোগ সিদ্ধি করিয়া আকাশগামিত্ব লাভ ও দেবতার ন্যায় পূজ্য হইয়া ছিলেন। অতএব ঈশ্বর উপাসনায় দৃষ্ট ফল হউক বা না হউক, পর-জন্মে শুভ ফল হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। কেননা দৃষ্ট-ফল-জনক কর্ম্ম অদৃষ্ট সাপেক্ষ হইলেও অদৃষ্ট-ফল-জনক-কর্ম্ম অদৃষ্টের জনক বটে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিয়া লোকে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা দৃঢ় অথবা অদৃঢ় প্রারব্ধ জন্যই হয়; আর যে কর্ম্ম করিয়া অবাস্তব ফল প্রাপ্ত না হয়; তাহা ভবিষ্যত ফলাবহ হইবেক। কোন ব্যক্তি পাপ-কার্য্য করিয়াও সুখ ভোগ করে; ও কেহ পুণ্য-কর্ম্ম করিয়াও দুঃখ ভোগ করে। ইহাতে পাপের ও পুণ্যের ভোগ ইহ-কালে না হইলেও পর-জন্মে হইবেক; তবে ইহ-জন্মে পাপ করিয়া ফল না পাওয়ার কারণ এই যে, যে সময়ে প্রারব্ধ বশতঃ পুণ্যের ভোগ হইতেছে, তৎ সময়ে পাপের ভোগ হইতে পারে না; ও পাপের ভোগের সময় পুণ্যের ভোগ হয় না; তবে অতি উৎকট পাপ, অথবা পুণ্যের ভোগ ইহ জন্মেই হইয়া থাকে।

তাহা পূর্ব্ব-জন্মে উদ্যোগ হইয়া ছিল, কেবল কর্ম্ম কৃত হইয়াই ফল প্রদান করার প্রারব্ধ থাকায় ঐ রূপ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঈশ্বর, নব-গ্রহ-রূপ ধারণ করিয়া জগতের শুভাশুভ ফল অদৃষ্টানুসারে প্রদান করিয়া থাকেন।* ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্র-দ্বারা জানা যাইতে পারে। ঈশ্বরের নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। তবে খণ্ডনীয় প্রারব্ধ পুরুষকারের চেষ্টা-দ্বারা খণ্ডন হয়, কিন্তু তাহার উপায় না করিলে হয় না। আর দৃঢ় প্রারব্ধ ভোগ করিলেই ক্ষয় হয়† ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সতত পুরুষকার সহকারে শুভ চেষ্টা করাই সাংসারিক লোকের কর্ত্তব্য। এবং উদাসীনদিগের দৃঢ় প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত সাংসারিক শুভ চেষ্টায় পুরুষকার পরিচালন না করিয়া কেবল ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে, যে ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা অদৃষ্ট জন্মিয়া লোকে সুখ দুঃখ ভোগ করে; সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? তদ্বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক হইতেছে।

সপ্তম অধ্যায়।

ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়।

অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বর অনন্ত প্রকার মনুষ্য ও অনন্ত প্রকার দেশ সকল সৃষ্টি করতঃ ঐ মনুষ্যাদির ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কার্য্যে ধর্ম্ম ও যে কার্য্যে অধর্ম্ম হয় তাহার নিয়ম করিয়াছেন। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ ধারণ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ স্থিতি, অর্থাৎ রক্ষা ও পালন হইবার জন্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ও তদ্বিপরীতাচরণে অধর্ম্ম কর্ম্মের নিয়ম নির্দ্ধারিত

* গ্রহ গণ অদৃষ্টের ফল প্রকাশক ও ফল প্রদানের সহকারী কারণ বলিয়া গ্রহ গণ ফল দেন বলা যায়।

† ভগবদ্গীতা। শ্রীধর-স্বামীর টিপ্পনী।

হইয়াছে। এবং ঈশ্বর, ধর্ম্মাচরণে সুখ ও অধর্ম্মাচরণে দুঃখ প্রাপ্ত হইবার নিয়ম করিয়াছেন। ঈশ্বর দেশ ভেদে, ব্যক্তি ভেদে, ও সাধারণ-রূপে ও বর্ণ-ভেদে এবং আশ্রম-ভেদে নানা-প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ম করিয়া তাহার কোন্ কার্য্য ধর্ম্ম, ও কোন্ কার্য্য অধর্ম্ম; ইহা জানিবার জন্য নানা-দেশে নানা প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রচার করাইয়াছেন। তাহা এইরূপ প্রকার প্রচলিত হইয়াছে যে, পরম্পরাগত কার্য্য দর্শনে কি কার্য্য ধর্ম্ম ও কি কার্য্য অধর্ম্ম, এবং তাহা স্ব স্ব দেশে কিপ্রকার আচরণ করিতে হয়, তদ্বিষয় প্রায় অনেকেই সহজ বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক সুপণ্ডিত মহাশয়েরা কেহ কেহ বলেন যে, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম শাস্ত্রমূলক নহে; তাহা কেবল যুক্তিমূলক; ও তাহা কতকগুলি লোক একত্র হইয়া যুক্তি অনুসারে যাহাকে ধর্ম্ম ও যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহাই নির্ব্বোধ লোকেরা ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া মান্য করিয়া আসিতেছে; ইহা সঙ্গত নহে। কেননা প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা ধর্ম্মা-ধর্ম্মের নিরূপক শাস্ত্র প্রচার না করিলে, এবং তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে, কেবল যুক্তি-দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের নিরূপণ হইতে পারিত না। কারণ যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হইলে, তাহাতে অনেক তর্ক উপস্থিত হইতে পারে; যথা প্রচলিত কার্য্য দৃষ্টে অনুমান হয় যে, উপকার ধর্ম্ম, ও অপকার অধর্ম্ম; কিন্তু ইহাতে দেখা যায় যে, এক পক্ষের অপকার ব্যতীত অন্য পক্ষের উপকার হয় না। যেমন এক জন দস্যু স্বীয় জীবিকা নির্ব্বা-হের জন্য একটি সাধু-লোকের ধন অপহরণ করে; তাহাতে এক ব্যক্তি দস্যুর নিকট হইতে বল পূর্ব্বক ঐ ধন পুনরায় গ্রহণ করতঃ ঐ সাধুকে প্রদান করে; সুতরাং এক পক্ষের অপকার হওয়াতে, ঐ কার্য্য অন্য-পক্ষের উপকার জনক হইলেও, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না; বরং অপকার-রূপ অধর্ম্ম-ঘটনা হইতে পারে। তদ্রূপ সত্য কথা উপকার-জনক; কিন্তু কোন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিলে, তাহার প্রাণ দণ্ড রূপ অপকার হয়; এ স্থলে সত্য-কথা ধর্ম্ম বলা যায় না; এবং সামান্য লোকে প্রাণী বধ করিলে, রাজা তাহার প্রাণ দণ্ড করেন; এই উভয়ে হিংসাত্মক অপকার কার্য্য করাতে, রাজার অধর্ম্ম হয় না; সামান্য লোকের অধর্ম্ম হয়। অত-এব যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করা যাইতে পারে না। যদি বলা যায় যে,

সমাজের লোকের সুবিধা বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ হইয়াছে? তাহাও বলা যাইতে পারে না; কেননা অল্পায়াসে ও অল্প-ব্যয়ে, লোকে সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারিত। এবং স্ব সম্পর্কীয় বিধবা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি হইলে লোকে অধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিত না। যদি বল যে, বস্তুর উত্তমাধম বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ হইয়াছে? তাহা বলিতে পার না; কারণ এই যে, জন্তুর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; এবং তাহারা পায়সাদি নানা-প্রকার উত্তম দ্রব্য ভোজন করে; তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র অতি অপবিত্র। এবং গো-জাতিরা নানা-প্রকার অপবিত্র অর্থাৎ মনুষ্যের বিষ্ঠা পর্য্যন্ত ভোজন করে, কিন্তু তাহাদিগের বিষ্ঠামূত্র পবিত্র এবং তাহা নানা প্রকার ধর্ম্মকার্য্যে, বিশেষতঃ দৈব ও পিতৃ কার্য্যে নিতান্ত আবশ্যক হয়। যদি বলা যায় যে, গো-জাতি পশু, তাহার সহিত মনুষ্যের তুলনা হয় না? কিন্তু শৃগাল প্রভৃতি অনেক পশু আছে তাহাদিগের বিষ্ঠাদি কেহ স্পর্শ করেন না কেন? অতএব গোজাতির বিষ্ঠা মূত্র যে শাস্ত্র-মূলক পবিত্র বস্তু, এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল যে ঈশ্বরের নিয়মানুরূপ, তাহার সন্দেহ নাই। যদি বল যে, ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ঈশ্বরের নিয়মানুরূপ নহে, তাহা স্বেচ্ছাচারীর মতে প্রচার হইয়াছে? ইহাও সঙ্গত নহে; কেননা ধর্ম্মশাস্ত্র সকল, স্বেচ্ছাচারীর মতে প্রচার হইলে চুরি, পরদারগমন ও হিংসা, মিথ্যা বাক্য সকল ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইত। কারণ স্বেচ্ছাচারী লোক বলবান না হইলে তাহার কথা, লোকে গ্রাহ্য করার সম্ভব ছিল না? অথচ উপরোক্ত কার্য্য সকল স্বেচ্ছাচারী ও বলবান লোকেরই সুবিধা জনক বটে, সুতরাং ঐ সকল বিষয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত; যাহা কোন দেশেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া ব্যবহার নাই, এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রবক্তারাও বলেন নাই, বরং অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। যদি বল যে, রাজ্য শাসনের নিমিত্ত বলবান রাজার আজ্ঞা ক্রমে ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল প্রচার হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের নিয়মাধীন নহে? কেননা রাজা-কর্ত্তৃক যে ব্যবস্থা প্রণয়ন হয়, তদ্দ্বারা লোকের শুভাশুভ হইয়া থাকে; এবং রাজা যাহাকে ধর্ম্ম বলেন, তাহাই ধর্ম্ম; ও তিনি যাহাকে অধর্ম্ম বলেন তাহাই অধর্ম্ম। যেহেতু লোকে রাজ্নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে, রাজা তাহাকে শাস্তি

দেন। এবং রাজ নিয়ম পালন করিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট পদ দিয়া থাকেন; ইহাও সঙ্গত নহে; কেন না কতকগুলিন দৃষ্ট ফল রাজা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হওয়া দেখা যায়; অর্থাৎ রাজ-নিয়ম পালন বা উল্লঙ্ঘনে লোকের শুভাশুভ হয় বটে; কিন্তু অদৃষ্ট ফল যে, রোগ শোকাদি, তাহা রাজনিয়মে হয় না। এবং রাজার নিয়মানুসারে লোকের যে সুখ দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়; তাহাও পূর্ব্ব-জন্মের কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলে হইয়া থাকে; তাহাও পূর্ব্বে মীমাংসা করা হইয়াছে। অতএব রাজার ব্যবস্থা সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ামক নহে; তাহা কেবল লোকের পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল ভোগের নিয়ামক বটে; যেহেতু রাজা ও রাজনিয়ম সকল, ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে হইয়াছে; কারণ প্রথমে ঈশ্বর সৃষ্টি-কার্য্যের জন্যে রাজা, রাজ নিয়ম, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল সৃষ্টি ও প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণ করায়, তাহার ফল সকল ইহ-কালে ও পরকালে ভোগ করতঃ অদৃষ্ট বশতঃ পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া, ঐ কর্ম্ম ফল স্বরূপ শান্তি অথবা শাস্তি রাজা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয়; এবং রাজা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা লোক রক্ষা হয়। ও সময়ে সময়ে রাজব্যবস্থা দ্বারা জগতের লোকের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ইহা সকল সহকারি কারণ, এবং ঈশ্বরের নিয়ম, মূল কারণ। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে যে নিয়ম এক কালীন করিয়াছেন, তদনুসারে দেবতা মনুষ্য এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি, যে প্রকার কর্ম্মাচরণে যাহা ঘটনা হইবেক; এবং যে সময়ে যে রাজা হইবেক, ও যে বিধি যে সময়ে চলিবেক, ও ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি ভবিষ্যত ব্যাপার সকল নিয়ম হইয়া, তাহার কার্য্য সকল স্বয়ং নানা প্রকার মূর্ত্তি ধারণাদি করিয়া প্রচার করিতেছেন। এবং কতক গুলিন ব্যাপার অতীত হইয়াছে; এতাবতায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল ব্যাপারের কর্ত্তাই ঈশ্বর; ইহা শাস্ত্র দ্বারা বিশেষ রূপে জানাইতেছে; অতএব এই সকল কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রের লিখিত কর্ত্তব্য বিধির লঙ্ঘন, ও নিষেধ বিধির আচরণই অধর্ম্ম। এবং কর্ত্তব্য বিধির আচরণ, ও নিষেধ বিধির আচরণই-

ধর্ম্ম * এবং কতক-গুলিন কর্ম্ম করণের বিহিত বিধি, অথবা নিষেধ বিধি না থাকায়, তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মই নাই। ইহা প্রায় ব্যবহারিক কার্য্যের অন্তর্গত স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এবং তাহার মধ্যে কতক গুলিন কার্য্যকে শাস্ত্র কারেরা পর্য্যদস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কার্য্যের দৃষ্ট ফল আছে, তাহাকে ব্যবহারিক এবং যে কার্য্যের দৃষ্ট ফল নাই, তাহাকে পর্য্যদস্ত বলে। অতএব শাস্ত্র বিধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হওয়াই সিদ্ধান্ত হইতেছে। এক্ষণে ঐ বিধি কত প্রকার, এবং কি প্রকার কার্য্যকে কি বিধি বলা যায়, তাহা নির্ণয় কর, যাইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

কি কার্য্যে কি প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয়।

অপ্রাপ্ত প্রাপকের নাম বিধি। তাহা দুই প্রকার, প্রথমতঃ উৎপত্তি বিধি, অর্থাৎ পিতৃ-শ্রাদ্ধ, দেব-পূজা, যাগ যজ্ঞ, ও ঈশ্বরের উপাসনা এবং দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রাগ প্রাপ্তির উপায় বিধি, অর্থাৎ সাংসারিক দৃষ্ট বস্তুর পান ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতির ব্যবহারের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট যাহা হইয়াছে তাহা। এই দুই প্রকার বিধি চারি শ্রেণিতে বিভক্ত, নিয়ম, পরিসংখ্যা, নিষেধ, পর্য্যদাস; তন্মধ্যে নিয়ম-বিধি, যাহা নিশ্চয় করিতে হইবেক; তাহা না করিলে পাপ জন্মে।† যথা সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া, এবং ঋতু-কালে স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি। এবং

* কেহ বলেন যে, নিষেধ বিধির আচরণ না করিলেই ধর্ম্ম হয় না, কিন্তু রাগ নিবৃত্ত হেতু অবশ্যই ধর্ম্ম বলা যায়।

† কেহ বলেন কোন কোন স্থলে নিয়ম বিধি প্রতিপালন না করিলে পাপ হয় না, কেবল প্রতিপালনে পুণ্য হয় যথা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভগিনীর হস্তে ভোজন ও শবানুগমনে ঘৃত ভোজন ইহা না করিলে পাপ হয় না ইহা স্মার্ত্ত ভটাচার্য্যের সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই দুই স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্র এই নিয়ম অপালনে পাপ জন্মে।

নৈমিত্তিক পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও পুত্রের উপনয়নাদি সংস্কার। পরিসংখ্যা-বিধি, ইহা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রতিপালন বটে, কিন্তু তৎসদৃশ কর্ম্মের নিষেধ। যথা ঋতুকাল ভিন্ন স্বদারে উপগত হওয়া ইহা স্বেচ্ছা বশত হয়, না করিলে পাপ নাই; কিন্তু পরদার গমন নিষেধ ইহা-দ্বারা হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত-কারী-ব্যক্তি যদি ভোজন করে তবে সায়ংকালে দ্বাবিংশতি গ্রাস ভোজন করিবেক। ইহা দ্বারা অধিক ভোজন নিষেধ হইল; কিন্তু উপবাস করিয়া থাকিলে অর্থাৎ দ্বাবিংশতি গ্রাস ভোজন না করিলেও ব্রত ভঙ্গ হয় না। নিষেধ বিধি, হিংসা, দ্বেষ, প্রাণী-বধ, চৌর্য্য পরদারাদি গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি নিষেধ হইয়াছে; ইহা করিলে পাপ হয়। এই নিষেধ বিধি দুই প্রকার অর্থাৎ যে বিষয়ে পাপ হওয়া উল্লেখে নিষেধ হইয়াছে তাহাকে নিন্দিত বিধি বলা যায়।* আর কেবল নিষেধ মাত্র হইয়াছে তাহা আচরণ করিলে পাপ অথবা পুণ্য কিছুই হয় না। যেমন গ্রহণ ভিন্ন সময়ে, রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করা নিষেধ হইয়াছে, ঐ শ্রাদ্ধ করিলে পাপ পুণ্য কিছুই হয় না; ইহাকে পর্য্যুদাস বিধি পণ্ডিতেরা বলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে যখন শাস্ত্রে নিষেধ হইয়াছে, তখন ঐ বিধি অমান্য করিয়া অনর্থক অর্থ-নাশ, এবং শারীরিক কষ্ট করিলে অবশ্যই পাপ জন্মে। তবে যে কার্য্যে নিষেধ অথবা বিধি নাই তাহাকে পর্য্যুদাস বলা যাইতে পারে। ইহা প্রাত্যহিক সাংসারিক গমন ভোজন স্থিতি ও উপবাসাদি। বিধি শ্রুতি মূলক; ইহার অন্তর্গত কার্য্য সকল আচরণে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে থাকে। অতএব ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত বিধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম জানা যাইতে পারে। তাহার কি কার্য্যে কি প্রকার ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম হয় তৎ সমুদায় লেখা যাইতে পারে না; তাহা শাস্ত্র দৃষ্টে নির্ণয় করা যাইতে পারে। কেন না পরমেশ্বর নানা-প্রকার দেশ ও নানা-প্রকার বর্ণ এবং নানা প্রকার আশ্রম ও নানা প্রকার দ্রব্য ও কর্ম্ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও নানা-প্রকার সৃষ্টি করা অভিপ্রেত বোধ হয়; অতএব তৎসমুদায় নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে কতকগুলি নিয়ম যদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় হইতে পারে তাহা

* তিথি বিশেষে নিম্বা ঘটনা বিশেষে অথবা চিরকালের জন্য যে দ্রব্য ভক্ষণ ও পান নিষেধ হইয়াছে তাহাও ইহার অন্তর্গত।

শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে। সত্য-কথা, অহিংসা, এবং অচৌর্য্য অর্থাৎ অন্যায্য-রূপে পর-ধন গ্রহণ না করা, দয়া, দান, পরোপকার ঈশ্বরের আরাধনা, ইহা সকল দেশেই ধর্ম্ম বলিয়া মান্য আছে। মিথ্যা-কথা অবৈধ হিংসা, চৌর্য্য, নৃসংশতা, প্রবঞ্চনা, ও ঈশ্বরের নিন্দা, পরের অপকার, পরদার-গমন, ইত্যাদি কর্ম্মকে সকল দেশেই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল ব্যাপার সমুদায় দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিধি-বদ্ধ হওয়াই অনুভব হয়। মনুর ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৯২ শ্লোকে আছে যে, ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা, (অপকারীর প্রত্যুপকার না করা) দম, (বিষয় সংসর্গে মনের অবিকার) অস্তেয়, (অন্যায়ে পরধন হরণ না করা) শৌচ, (মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শাস্ত্র সম্মত দেহ শোধন) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, (বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ) ধী, (শাস্ত্র তত্ত্ব জ্ঞান) বিদ্যা, (আত্ম জ্ঞান) সত্য (যথার্থ কথন) অক্রোধ (ক্রোধের কার্য্য ঘটনা হওয়া সত্বেও ক্রোধ না করা) এই দশ-বিধ ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত শ্লোকে ধর্ম্মের মূল নিয়ম সকল বেদ ও স্মৃতি হইতে প্রকাশ হওয়া ব্যক্ত হইয়াছে। হারীত সংহিতা হইতে উদ্ধৃত স্মৃতিশীল শব্দের তাৎপর্য্য। ব্রহ্মণ্যতা দেব-পিতৃ-ভক্ততা-সৌম্যতা অপরোপ তাপিতা, (পরকে তাপ না দেওয়া) অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, সারল্য, কারুণ্য, প্রশান্তি, এই রূপ মনুতে নানা প্রকার ধর্ম্মের মীমাংসা হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার ধর্ম্মের বিধি সকল দেশে ব্যবহৃত নাই। এবং দেশ ভেদে পান ভোজন ও বিবাহ এবং পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেব পূজা প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা সমস্তই ঈশ্বরের নিয়মানুসারে লোকের কর্ম্ম ফল ভোগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তবে কোন কোন অসভ্য-দেশে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা নাই, তাহারা কেবল পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে; তাহা কেবল তাহাদিগের কর্ম্ম ফল ভোগিবার নিমিত্ত সেই দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে বলিতে হইবেক। নতুবা তাহাদিগের ঐ রূপ ঘটনা হইত না। যদ্যপি স্বস্ব কর্ম্মের ফলে লোকের স্বতন্ত্র ভাগ্য ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন একটি কর্ম্মের এরূপ ফল আছে যে, ঐ রূপ কর্ম্ম অনেক লোকে করাতে তাহারা সকলেই ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া এক দেশে জন্মগ্রহণ করে ইহা অসম্ভাব্য নহে। ফলতঃ

যত প্রকার অসভ্য মনুষ্য থাকুক না কেন, প্রায় সকলেই রাজ নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকে। তবে রাজ-নিয়ম দেশ ভেদে নানা-প্রকার হয় বটে; ইহা সকলই ঈশ্বর ইচ্ছা ব্যতীত নহে। এক্ষণে রাজা ও রাজ নিয়ম কি তাহা বিবেচনা করা যাউক।

নবম অধ্যায়।

রাজা ও রাজনিয়ম কি তাহা নির্ণয়।

পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করতঃ তাহার রক্ষার জন্য রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুর সপ্তম অধ্যায়ের ৩ য় শ্লোক হইতে ১৪ চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অরাজক হইলে প্রজারা বলবদ্ভয়ে ব্যাকুল হইবেক, অর্থাৎ দস্যু ও বলবান লোক কর্ত্তৃক দুর্ব্বল ব্যক্তি পীড়িত হইবেক, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিচালন হইবেক না, ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই অষ্ট লোক পালের সারাংশ হইতে ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং আত্ম-তেজ হইতে রাজ দণ্ডের সৃষ্টি করিয়া রাজাকে প্রদান করিয়াছেন। রাজা দেশ কাল ও লোকের শক্তি ও বিদ্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া লোকের শুভাশুভ ফল প্রদান করিবেন। ঈশ্বর, রাজার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন*। প্রথমতঃ মনু প্রভৃতি রাজা হইয়া ছিলেন; তাহারা ঈশ্বর ইচ্ছা ক্রমে রাজপদে অভিষিক্ত হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়া দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন করতঃ যথার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া ছিলেন। তদনন্তর যে সকল রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা পুণ্য কর্ম্মের ফলে রাজ পদে অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন; এবং রাজার ব্যবস্থা সকল ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যে হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে মীমাংসিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, রাজাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে। যে হেতু রাজা ঈশ্বরের প্রেরক, এবং তাঁহার প্রধান বিভূতি অংশ†। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা ঈশ-

---

* মনু ৭। ৮ম অধ্যায়ে দৃষ্ট কর।

† নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ। ভগবদ্গীতায়াং দশমোধ্যায়।

রের কৃত নহে; উহা প্রজা-তন্ত্র অর্থাৎ প্রজারা একত্র হইয়া এক জনকে শাসন কার্য্যের জন্য রাজপদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা সঙ্গত নহে কেননা প্রজারা এক জনকে রাজা করিতে চাহিলে তাহার মধ্যে সমতুল্য অনেক লোকেরই রাজা হইবার ইচ্ছা থাকায় কোন ক্রমে একমত হইতে পারিত না; এবং যদ্যপি একজন ব্যক্তি মনোনীত হইবার সম্ভব হয়; তথাচ সে মরিয়া গেলে অন্য উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও ঐ মৃত রাজার অনুপযুক্ত পুত্রাদি কদাচ রাজা হইত না; এবং মনুষ্য কৃত শাসন প্রণালীও মান্য হইত না। যদি বল যে, বলবান্ ব্যক্তি স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করতঃ রাজপদে অভিষিক্ত হইতে পারে, তাহাও সম্ভব নহে। কেননা স্বাভাবিক মনুষ্য এরূপ বলবান হইতে পারে না যে, বহুতর লোককে একাকী আক্রমণ করিয়া রাজা হইতে পারে। * তবে কোন কোন স্থলে দেখা যায়, এবং শুনা যায় যে, প্রজারা একত্র হইয়া এক জনকে রাজ-পদে নিযুক্ত করে; এবং কেহ কেহ বল পূর্ব্বক রাজ-পদ প্রাপ্ত হয়। ইহার মূল কারণ, ঐ ব্যক্তির দৃঢ় প্রারব্ধ বশতঃ সে রাজা হইয়া থাকে। নতুবা কখনই ঐ রূপ ঘটনা হইতে পারে না; কেননা সকল লোকের মন যে এক ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হওয়া ঈশ্বরের নিয়ম ব্যতীত কোন ক্রমেই হইতে পারে না। অত-এব রাজা যে প্রাণ দণ্ড, অথবা কারাবাসদণ্ড, কিম্বা অর্থ-দণ্ড করেন, সে কেবল লোকের অদৃষ্টানুসারে হইয়া থাকে। কেননা দুরদৃষ্ট-প্রযুক্তই লোকে অপরাধের কার্য্য করে, তাহাতে শাস্তি প্রাপ্ত হয় নতুবা রাজা কখনই নিরপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন না। যদি বল যে, রাজ-বিচারে কখন কখন নিরপরাধীর শাস্তি হইতে দেখা যায়? তাহার কারণ পূর্ব্ব-জন্মের কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ রূপ শাস্তি প্রাপ্তি হয়। কারণ কর্ম্মের ফল নানা প্রকার, তাহা পূর্ব্বে মীমাংসা করা হইয়াছে। আর যে প্রকার ঈশ্বরের নিয়মানু-সারে গ্রহ নক্ষত্র মেঘ ও বৃষ্টি সকল এবং ঝটিকা প্রভৃতি-দ্বারা লোকের অদৃষ্ট ফল ভোগ হইয়া থাকে; তদ্রূপ রাজা কর্ত্তৃক ঐ রূপ নানা প্রকার ফল প্রদান হইয়া থাকে। রাজা যে বংশ সম্ভূত হউন না কেন, তিনি ঈশ্বরের

* পুরাণে যে সকল বীরপুরুষের কথা লেখা আছে তাহারা সকলেই দৈব বলে বলবান হইয়াছেন।

প্রেরক ব্যক্তি তাহার সন্দেহ নাই। যদি বলা যায় যে, প্রথমত ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষত্রিয় এবং অসুবগণ রাজা হইয়া ছিল; এক্ষণে অন্য জাতিরা রাজা হইবার কারণ কি? অতএব বর্তমান রাজা ঈশ্বরের প্রেরক হইতে পারেন না? ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না ক্ষত্রিয়গণ চিরকাল রাজা হইয়া আসিতেছেন, তবে কখন কখন অসুরেরা রাজা হইত; তাহারা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান রাজা সকল ঐ ঐ বংশ সম্ভূত বটে, তবে নানা দেশে বাস হওয়াতে তাঁহারা নানাধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। অতএব কি কারণে পৃথিবীতে নানা জাতি ও নানা-ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

দশম অধ্যায়।

নানা প্রকার ধর্ম্মের কারণ নির্ণয়।

মনুব ১০ ম অধ্যায় দৃষ্টে জানা যায় যে, মনুষ্য-জাতির মধ্যে প্রথমতঃ চারি-বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহারা সকলেই সনাতন বৈদিক-ধর্ম্ম আচরণ করিতেন: অর্থাৎ বেদে যে বর্ণের যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছিল, তাহাই আচরণ করিতেন। তদনন্তর এই চারি বর্ণ হইতে আর ছয়টি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; যেহেতু পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র; ও ক্ষত্রিয়েরা, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র; এবং বৈশ্যেরা বৈশ্য এবং শূদ্র; ও শূদ্রেরা কেবল শূদ্র বর্ণের কন্যা বিবাহ করার প্রথা ছিল। তাহাতে সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ত্ত-জাত সন্তান সবর্ণা অর্থাৎ সেই-সেই-বর্ণ হইয়া ছিল; এবং ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়ার গর্ত্ত-জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত; ও বৈশ্যার গর্ত্ত-জাত অম্বষ্ঠ, অর্থাৎ বৈদ্য; এবং শূদ্রা গর্ত্তে নিষাদ, যাহাকে পারশব বলা যায়। এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যার গর্ত্তজাত মাহিষ্য; শূদ্র গর্ত্ত-জাত উগ্রক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ত্তজাত সন্তানের নাম করণ। * এই ছয়টি বর্ণ, অথবা জাতি হইয়া ছিল। ইহারা

* করণকে কেহ কেহ কায়স্থ বলেন। কিন্তু কায়স্থই আদি শূদ্র তাহা ব্যবহার দৃষ্টেই জানা যায়।

পিতৃসদৃশ বটে, কিন্তু মাতৃ দোষে, অর্থাৎ মাতা হীন বর্ণের কন্যা প্রযুক্ত সবর্ণ জাত সন্তান অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট হওয়াতে ইহাদিগকে অপসাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ইহারা মাতৃকুল হইতে উৎকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন প্রতিলোমজ কতক-গুলিন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণী-গর্ব্ভে ক্ষত্রিয়-জাত সন্তানকে সূত, ও বৈশ্য-জাতকে বৈদেহ, ও শূদ্রজাতকে চণ্ডাল বলা যায়। এবং ক্ষত্রিয়া গর্ব্ভে বৈশ্য-জাত সন্তানকে মাগধ, ও শূদ্র-জাতকে ক্ষত্তা, এবং বৈশ্যার গর্ব্ভে শূদ্র-জাত সন্তানকে আয়োগব বলা যায়, ইহারা অপধ্বংসজ। ইহার মধ্যে চণ্ডাল অতি নিকৃষ্ট, স্পর্শ যোগ্য নহে। কারণ অধম হইতে উত্তমার গর্ব্ভজাত সন্তান মাত্রেই অপকৃষ্ট; তন্মধ্যে অতি অধম ও অতি উচ্চ জাতি হইতে বিলোম জাত সন্তান অতি নিকৃষ্ট হইয়াছে। এবং অনুলোম বিলোম ক্রমে এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে উৎপন্ন, অর্থাৎ যাহারা ব্যভিচার দোষে জন্ম গ্রহণ করে, ও যাহারা অবিবাহ্যা স্ত্রীকে বিবাহ করাতে জন্মায়, এবং যাহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর জাতি *। ফলত ঐ সকল জাতি, যে জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যাহার যে নাম ও কর্ম্ম এবং ব্যবসায় ইহা সমুদায় মনুর ঐ দশম অধ্যায়ে লেখা আছে। তৎ সমুদায় লিখিতে হইলে এই পুস্তক অনেক বাহুল্য হইয়া উঠে। বাস্তবিক যত প্রকার জাতির নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ও যাহার নাম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, অথবা নাম জানা যায় না, তৎ সমুদায় প্রায় হিন্দু নামে খ্যাত আছে; কিন্তু কি জন্য হিন্দু নামে খ্যাত হইল তাহার বিষয় শাস্ত্রে কিছু নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাই নাই। তবে বহু দিন হইতে ঐ শব্দ প্রচলিত হইতেছে। ফলিতার্থে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ প্রথমতঃ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে, অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদ্বর মধ্য স্থানে যে দেশ আছে, যাহাকে দেব নির্ম্মিত দেশ বলা যায়, তথায় বাস করিতেন। কারণ এই দেশের আচরই সদাচার† তদনন্তর ঐ স্থানে লোক সংখ্যা অধিক হইতে থাকায় কতক-গুলি ক্ষত্রিয় স্থানান্তরিত হইয়া অসুর নির্ম্মিত

* মনু ১০ ম অধ্যায় ২৪ শ্লোক।

† মনু ২ অধ্যায় ১৭ ও ১৮ শ্লোক।

ম্লেচ্ছভূমিতে* বাস করিতে লাগিলেন; এবং কতক গুলি লোক উষ্ট্র, ও পৌণ্ড্র ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ, খস দেশে বাস করিতে লাগিল। তাহারা কেহ কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক, এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মণ অপ্রাপ্ত হইয়া বেদ বিহিত ক্রিয়া লোপ করতঃ স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। তদনন্তর ঈশ্বর ইচ্ছা বশতঃ ঐ ঐ দেশের মহাত্মা লোক দ্বারা তৎ তৎ দেশোপযুক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রচার হইতে লাগিল। কিন্তু সনাতন বেদ বিহিত ক্রিয়া কাণ্ড রূপ ধর্ম্ম প্রচলিত হইল না। এবং সগর রাজা ঐ সকল দেশের লোকের কেশ মুণ্ডন ও শ্মশ্রু ধারণাদি চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন†। অনন্তর ঐ ঐ দেশের লোক যে যে দেশে বাস করিতে লাগিলেন, তথায় তাহাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র চলিতে লাগিল। এই সময় যাহারা সনাতন বেদ বিহিত ধর্ম্ম মান্য করিয়া তদনুসারে ক্রিয়া কলাপ করিতে লাগিলেন, তাহারা হিন্দু নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই আদি মনুষ্য জাতি ছিল; তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ নানা প্রকার জাতি ও নানা প্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে। কিন্তু বর্ণ-ধর্ম্মাদি সকল বেদ ও স্মৃতি হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার তাহা সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকায় অন্য দেশের ধর্ম্মের সহিত অনৈক্য দেখা যাইতেছে। যদি বলা যায় যে, ভিন্ন দেশবাসীরা যে আদি ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, ইহার অনুমান কি প্রকারে হইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র জাতিকে মৃদু স্বভাবাপন্ন, এবং ক্ষত্রিয় সকল রাজা ও রাজ বংশ সম্ভূত এবং স্বাধীন ও বীর্য্যবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তজ্জন্য ভিন্ন দেশবাসী ম্লেচ্ছদিগকে প্রায় ঐ রূপ স্বাধীন ও বীর্য্যবান্ দেখা যায়; এবং এতদ্দেশ বাসীদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতি ব্যতীত অন্য লোক সকলকে প্রায় মৃদুস্বভাবাপন্ন দেখা যায়; বিশেষত ভিন্ন দেশবাসীরা যুদ্ধ কার্য্যে, এবং অস্ত্রাদি ধারণ বিষয়ে, বিলক্ষণ নিপুণ জন্য তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ রাজা ও রাজবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমান হয়। অতএব

* অসুরের বাসভূমির নাম ম্লেচ্ছভূমি।

† মনু ১০ অধ্যায় ৪৩। ৪৪ শ্লোক।

‡ বিষ্ণু পুরাণে ও অন্যান্য পুরাণেও আছে।

সকল দেশ-বাসী লোক যে আদিম চারি বর্ণ সম্ভূত এবং আর্য্য বংশীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। আরও দেখা যায় যে, বেদ হইতে সকল ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে; তাহাতে অহিংসা সত্য, ও দয়া প্রভৃতি ধর্ম্ম, সকল দেশেই আদিম কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এবং কোন কোন দেশে পূর্ব্ব কালে বৈদিক নিয়মানুসারে অগ্নির পূজার বিধি প্রচলিত ছিল। যাহা এইক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এই সকল কারণে বিবেচনা হয় যে, পরমেশ্বর অনন্ত কার্য্য করণ জন্য অনন্ত প্রকার দেশ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল প্রচলিত করাইয়াছেন। তাহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, পুরাকালের লোক প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় ছিল, তাহারা সকলই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তদনন্তর বিভাগ মতে নানা স্থানে বাস করিতে থাকায় হিন্দু প্রভৃতি নানা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং হিন্দুদিগের স্মৃতি ও পুরাণ এবং তন্ত্র-শাস্ত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্র নামে খ্যাত হইয়াছে। এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। যে যে সময়ে যে দেশে ধর্ম্মের হানি, ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ভগবান ঈশ্বর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নানা-প্রকার অবতার হইয়া ধর্ম্ম প্রচলিত করণ জন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে*। যদি বলা যায় যে, ভিন্ন দেশ বাসী দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি না থাকার কারণ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, ভিন্ন দেশে, যদিচ ব্রাহ্মণেরা গমন করিয়া থাকেন, তাহা আর চিনিতে পারা যায় না। কারণ, বর্ণ-ধর্ম্ম কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকায় জাতি প্রভেদ জানা যাইতে পারে; অন্যান্য দেশে বর্ণধর্ম্ম প্রচলিত না থাকায় সকল বর্ণই এক বর্ণ তুল্য হইয়াছে। অতএব ঈশ্বর যে দেশে যে প্রকার শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সকল, এবং জল বায়ু মৃত্তিকা ও অন্যান্য দ্রব্য সকল, ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মের নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাই চলিতেছে। পরন্তু এই ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নানা দেশ নানা-প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে; কিন্তু কোন্ দেশের কি প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম চলিত আছে, তৎসমুদায় জানা

* ভগবদ্গীতা চতুর্থ অধ্যায়।

সুকঠিন বলিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল। এক্ষণে ভারতবর্ষের বিশেষ ধর্ম্ম কি তাহা বিবেচনা করা যাউক।

একাদশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের বিশেষ ধর্ম্ম কি তাহা ও ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থ ও যতির ধর্ম্মনির্ণয়।

ভারবর্ষেব লোকের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে * ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদিগেব দশ বিধ সংস্কাব, অর্থাৎ বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমোন্তনয়ন, জাতকর্ম্ম, পৌষ্ঠিক-কর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন; এবং শূদ্র জাতির মধ্যে উপনয়ন ব্যতীত আর নববিধ সংস্কার প্রচলিত আছে। এবং শূদ্র জাতিরা স্বয়ং বেদ মন্ত্র পাঠ কবিবেক না; তাহাবা ব্রাহ্মণেব দ্বারা-পাঠ কবাইবেক। ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম যজন, যাজন, বেদ অধ্যয়ন ও বেদ অধ্যাপন, এবং দান, ও প্রতিগ্রহ; তন্মধ্যে যজন অর্থাৎ দেবার্চ্চনা ও প্রাত্যাহিক বেদ-পাঠ, হোম, অতিথি-সেবা, এবং পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, এবং বলিবশ্য এই পঞ্চ মহা-যজ্ঞ ও সন্ধ্যোপাসনা ইহা নিত্য ধর্ম্ম; এতদ্ভিন্ন শ্রুতি স্মৃতি ও তন্ত্রবহিত নানাপ্রকার কর্ম্ম আছে। ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম প্রজা পালন, দান, এবং বেদাধ্যায়ন, যজ্ঞ ও বিষয়ে অনাসক্তি হইয়া ভোগ করা; এবং পঞ্চ-মহা-যজ্ঞাদি নিত্য ক্রিয়া সকল আচবণ করা। বৈশ্য দিগের

* পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বে অশ্বক্রান্ত রথক্রান্ত বিষ্ণুক্রান্ত এই তিন দেশে ভারতবর্ষ বিভক্ত ছিল। এবং ইহাতে দ্বীপ ও উপদ্বীপ অনেক আছে। ঐ ঐ দেশের নাম ও ব্যবহার এবং মনুষ্যাদির আকাবের সহিত শাস্ত্রলিখিত কথা মিলন করিলে প্রমাণ হয় যে, অশ্বক্রান্ত দেশকে ইযুজাত ইদানীং ইয়রোপ বলে, রথক্রান্তকে সূর্য্যাবিকা ও ইদানীং আফ্রিকা ও বিষ্ণুক্রান্তকে অসেচনক ইদানীং আসিয়া বলে। এবং কুমারদ্বীপ অথবা মাহেয় দেশকে ইদানীং আম্রিকা বলে। এবং কুমারিকাকে ভারতবর্ষ অথবা ইণ্ডিয়া বলে। কুমারিকা সিন্ধুনদের পূর্ব্ব হিমালয়ের দক্ষিণ দেশ কথিত হয়। এই দেশে বর্ণবিচার ও আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত থাকায় ইহাকেই বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষ বলাতে এই দেশের ধর্ম্ম বলা হইল। পূর্ব্বোক্ত দেশ সকলেব বিষয় শাস্ত্রের সহিত মিলন করিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত ও বর্ত্তমান নাম ব্যবহার লিখিতে গেলে গ্রন্থ নিতান্ত বাহুল্য হয় বলিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল।

বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, পশু-পালন দান যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন বাণিজ্য কৃষি এবং কুশীদ, অর্থাৎ স্থদ গ্রহণে ঋণ দান এবং পঞ্চ যজ্ঞ প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়া করণ। শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম বিপ্র সেবা ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কর্ম্মচারী হওয়া এবং শিল্প কর্ম্ম করণ, ও অমন্ত্রক পঞ্চ-যজ্ঞ এবং তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ও পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম করা। এই প্রকার চারি বর্ণের বিশেষ ধর্ম্ম সকল মনুর গ্রন্থে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে লিখিত আছে। ইহার মধ্যে কতক-গুলিন জীবিকা জন্য ও কতক-গুলিন পরকালের উপকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা গৃহস্থের ধর্ম্মের অন্তর্গত বিধায় সেই অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া লেখা যাইবেক। এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশের শৌচ একটী প্রধান ধর্ম্ম, অর্থাৎ ভোজনান্তর আচমন এবং বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগানন্তর মৃত্তিকা জল দ্বারা হস্ত পাদাদি প্রক্ষালন ও আচমন করা; এবং পান ভোজনে দ্রব্য নিরূপণ, ও বিবাহাদি কর্ম্মে জাতি ভেদ এবং স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য জাতি ও দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট রূপে ব্যবহার প্রচলিত আছে। আর ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম সকল এতদ্দেশেই প্রচলিত। এই ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির হইয়া থাকে। ঐ ব্রহ্মচারী দুই প্রকার, যথা—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী উপনয়নানন্তর আমরণ পর্য্যন্ত গুরু কুলে বাস; এবং স্ত্রী, তৈল, মধু, মাংসাদি, ব্যবহার বর্জ্জিত হবিষ্যান্ন ভোজন এবং ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্যাদি সমুদায় গুরুকে অর্পণ, এবং গুরু আজ্ঞা ব্যতীত কোন কর্ম্ম না করিয়া ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করা ইত্যাদি। এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রায় ব্রাহ্মণ জাতি-রাই হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ঐ রূপ হওয়া প্রায় ঘটে না; কারণ তাহারা বিষয় ভোগী বলিয়া এই ধর্ম্ম যাজন করিতে অধিক লোকের প্রবৃত্তি হয় না। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী উপনয়নানন্তর গুরুকুলে বাস করতঃ ঐ রূপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় আচরণ ও নিয়মিত কাল অতীত হইলে গুরু দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক গৃহস্থ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দার পরিগ্রহ করিতে হয়। এই গৃহস্থ ধর্ম্ম পরে প্রকাশ হইবেক*। এইক্ষণে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম লেখা যাই-তেছে। ইহা অর্দ্ধ বয় ক্রম গতে আচরণের সময় উপস্থিত হয়; তাহাতে নিয়ম এই যে, গৃহস্থ ব্যক্তি যখন আপনার দেহে চর্ম্মের শিথিলতা, ও কেশ

* কলিযুগে উপনয়নানন্তর স্ব গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম করিতে হয়।

পক্কতা, এবং পৌত্রের মুখাবলোকন করিবেন, সেই সময়ে বনে গমন করা উচিত, তাহাতে আপন স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে পুত্রের প্রতিপালনে রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবেন। মনুর ষষ্ঠাধ্যায়ের ১ম হইতে সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া বিষয়স্পৃহারহিত হইলে সুতরাং আর গৃহে না থাকাই কর্ত্তব্য। তাহাতে বন গমন পূর্ব্বক বন্য ফল ও কন্দ মূলাদি ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় আচরণ করিতে হয়। বানপ্রস্থের প্রধান ধর্ম্মই তপস্যা; তন্মধ্যে গ্রীষ্ম কালে পঞ্চপতা, অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মস্তকের উপর সূর্য্য দেবের তাপ সহ্য করণ পূর্ব্বক, ও শীত কালে জলে ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করা; তদনন্তর বয়সের তিন ভাগ গত হইলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেক। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম এই যে, বিধিপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ড গ্রহণ, ও ভিক্ষা দ্বারা কেবল প্রাণ ধারণ করিয়া পর-ব্রহ্মে মনঃ সমাধান করিতে হয়। তদনন্তর কুটিচর, বহূদক, হংস, জটী, মুণ্ডী, শিখী প্রভৃতি যে সকল আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহা সকলই উদাসীনের আশ্রম; কিন্তু তাহা সন্ন্যাসাশ্রমের অন্তর্ভূত, সন্ন্যাসিরা সাংসারিক বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করতঃ কেবল ঈশ্বরের ধ্যান দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে মুক্তি লাভ করে। এতদ্বিষয়ে আর বিস্তারিত লেখা অপ্রয়োজন। এইক্ষণে গৃহস্থের ধর্ম্ম বিশেষরূপে লেখা যাইতেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গৃহস্থের ধর্ম্মনির্ণয়।

গৃহস্থের ধর্ম্ম দুই প্রকার, ঐহিক এবং পারমার্থিক। তাহাতে ঐহিক দুই প্রকার, অর্থাৎ ইহকালে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ, এবং তৎ কর্ম্ম ফলে পরকালে স্বর্গ-ভোগ। পারমার্থিক কার্য্যে স্বর্গ সুখাদি ভোগ ও মুক্তি লাভ হয়। গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;

কেননা ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পদ পাইতে পারে; অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সাধন এই আশ্রমে হয়; ও অন্যান্য আশ্রমী সকলের অন্নদাতা ও আশ্রয় স্বরূপ বর্ত্তমান থাকে। শাস্ত্রে চারি বর্ণের যে ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে* তন্মধ্যে অনাপৎকালে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য, ব্রাহ্মণের যাজন অর্থাৎ পুরোহিতের কার্য্যে দক্ষিণা প্রাপ্তি, এবং অধ্যাপনা অর্থাৎ বেদ পড়াইয়া শিষ্য দ্বারা গুরু দক্ষিণা লাভ, ও প্রতিগ্রহ, সৎ দান গ্রহণ করা, এবং উঞ্ছশীলা অর্থাৎ পরিত্যক্ত শস্য এক একটি করিয়া সংগ্রহের নাম উঞ্ছ; ও মঞ্জরী রূপ ধান্যাদি সংগ্রহের নাম শিল, এবং যাচ্ঞা ব্যতীত লাভ। তদনন্তর ক্রমাধীন আপদ্ উপস্থিত অর্থাৎ পরিবার অধিক হইতে লাগিলে তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থে বাণিজ্য ও কৃষি†। অনন্তর অত্যন্ত আপদ্ উপস্থিত হইলে বিদ্যা অর্থাৎ তর্ক, বৈদ্য বিষচিকিৎসাদি বিদ্যা, শিল্প-কার্য্য, ভৃতি, বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক, কর্ম্ম করা, অর্থাৎ চাকরী করা, সেবা, ব্রাহ্মণের পাচক-বৃত্তি, সুদ গ্রহণ করতঃ ঋণ প্রদান করা, এবং যথা কথঞ্চিৎ লাভে সন্তোষ লাভ, ও ভিক্ষা, এবং বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করা।‡ এই সকল কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কেবল ব্রাহ্মণেরা সেবা অর্থাৎ পরিচর্য্যা-কর্ম্ম করিতে পারেন না। এবং তাহাদিগের বাণিজ্য কর্ম্মের মধ্যে চর্ম্মপাদুকা, মদ্য, মাংস, লাক্ষা, লৌহ, লবণ, প্রভৃতি বিক্রয় নিষেধ আছে। আর অত্যধিক আপদ না হইলে হীন জাতির নিকট দান গ্রহণ করাও নিষেধ আছে। এই জীবিকা ধর্ম্ম। এবং তাহাদিগের কতক গুলিন নিষিদ্ধ কর্ম্ম আছে। অর্থাৎ মদ্যপান ও পরদার গমন, এবং গো-মাংস, কুক্কুট, পলাণ্ডু, রশুন প্রভৃতি, এবং হীন জাতির কৃত বা স্পর্শ হওয়া অন্নাদি ভক্ষণ, ও অস্পৃশ্য জলাদি পান শাস্ত্রে নিষেধ করা হইয়াছে;§ এই সকল বিষয় ব্যবহারিক ধর্ম্ম। এবং অতিথি সেবা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা,

* এই ভাগের ১১শ অধ্যায় দৃষ্ট কর।

† মনুসংহিতা ৪র্থ অধ্যায়।

‡ মনু ১০ম অধ্যায় ১১৬ শ্লোক।

§ এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণে পাপ ও জাতি নাশ হয়, ইহার শাস্ত্রসঙ্গত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শুদ্ধির উপায় নাই।

দেবার্চ্চনা, ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি, তীর্থস্নান, দেবতা-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী ও মঠাদি প্রতিষ্ঠা, এবং ব্রত, ও উপবাসাদি নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত, ও ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি স্বর্গসুখাদির নিমিত্ত, এবং ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক ঈশ্বরের ধ্যান ধারণার দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া মুক্তি লাভের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহা পারমার্থিক ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে দান গ্রহণ, ও পুরোহিতের কার্য্য এবং বেদ পাঠ-করান, ও শূদ্রের বেদমন্ত্র পাঠ করা নিষেধ হইয়াছে। পরন্তু শূদ্রের যে ত্রিবর্ণের সেবা করা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্র, পরকালের উপকারের জন্য বিপ্র সেবা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিবেক; ও জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবা অর্থাৎ লিখনাদি কার্য্য করিবেক। কারণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ধনী হওয়াতে তাহাদিগের বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অর্থ লাভ, ও বিপ্র সেবা-দ্বারা জ্ঞানালোচনা করতঃ পরকালের সদগতি লাভের চেষ্টা করিবেক। এতদ্ভিন্ন শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এবং অন্যান্য হীন বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ জীবিকা ও পারমার্থিক ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট যে হইয়াছে, তাহা প্রায় একই মূল নিয়ম আছে। কিন্তু মনুতে ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে তদ্বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় এই গ্রন্থ বাহুল্য হইবার আশঙ্কায় লেখা হইল না। উপরে যে বর্ণের যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার বিপরীত আচরণে অধর্ম্ম হইয়া থাকে। কেহ কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলেন যে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শাস্ত্রে রাজ দণ্ড-কিছু ন্যূন হইবায়, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম বলা যাইতে পারে না, তাহা অসঙ্গত। কেননা ব্রাহ্মণের দ্বারা জগতের অধিক হিত সাধন হওয়াতে বিষয় বিশেষে রাজ-দণ্ড কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল বটে; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল ও আছে; বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানী এবং দয়ালু ও সরলস্বভাব সম্পন্ন থাকাতে তাহাদিগের দ্বারা অধিক পরিমাণে কুকর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, কেবল অনবধানতা প্রযুক্ত পাপ কর্ম্ম ঘটনা হওয়ায় ঐ রূপ দণ্ড বিধান হইয়া ছিল। এইক্ষণে ঐ রূপ স্বভাব ব্রাহ্মণদিগের প্রায় না থাকায় সমান রূপে রাজ-দণ্ড বিধান হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন দোষ নাই; ঈশ্বরের নিয়মা-

মুসারে নানা-প্রকার ধর্ম্ম এবং তাহা কর্ম্ম জন্য ফলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং হইবেক। নতুবা জগতে ব্যক্তির ও ধর্ম্মের বৈষম্য অর্থাৎ ছোট বড় ভাব ও স্বতন্ত্র-ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইত না*। কেননা সকল লোকই সুখ ইচ্ছা করে; দুঃখ কেহ ইচ্ছা করে না; তবে ব্রহ্মচারী কি জন্য সাংসারিক সুখ এককালীন পরিত্যাগ করতঃ শারীরিক এত কষ্ট সহ্য করেন? তদ্রূপ বানপ্রস্থ ও যতিরা কি নিমিত্ত বিষয় ত্যাগ করেন? এবং হীনবর্ণ বাহক বেহারা ও ম্যাথোর, ধোপা ও নাপিত প্রভৃতি, সকল হীন কর্ম্ম করে? যদি বল যে, মনুষ্যেরা আপনা আপনি করিয়াছে? তাহা কখনই সম্ভাব্য হয় না; কেননা সুখ দুঃখ ও মান অপমান সকলই বোঝে, তাহাতে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কেহ উহা স্বীকার করিয়া হীন হইয়া থাকিত না। যদি বল যে, রাজ-শাসনে ঐ রূপ হইয়াছে; ইহাও সঙ্গত নহে; কেননা রাজ শাসনে ঐ রূপ হওয়ার কোন নিয়ম দেখা যায় না; এবং পুরাকালের কোন ইতিহাসেও শুনা যায় না। বরং হীন বর্ণেরা উত্তম ব্যবসায় ও ব্যবহার করিতে দেখা যায়; তাহাতে কোন রাজ-শাসন নাই; অতএব ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী অদৃষ্ট বশতঃ ঐ রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ঈশ্বরের নিয়ম যে কোন ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ব্যবসায় এবং ব্যবহার করিলেও উৎকৃষ্ট জাতি প্রাপ্ত হইতে পারে না; বরং উত্তম বর্ণেরা হীন জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহা ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিরূপণ হইয়াছে; তাহা কার্য্যতও দেখা যাইতেছে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিরূপণ আছে যে, যুগে যুগে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহাতে ধর্ম্মের ও জাতির হীনতা ব্যতীত উত্তমতা হয় না। অতএব যুগধর্ম্ম কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক্।

---

* দ্বিতীয় ভাগের ১১শ অধ্যায় দৃষ্ট কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যুগধর্ম্ম নিরূপণ ও কলিকালের অবস্থা বর্ণন।

কাল ক্রমে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যাইতেছে; ইহা ঈশ্বরের নিয়ম ব্যতীত নহে। কেননা প্রথমতঃ মনুষ্য জাতির মধ্যে চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়া; পরে নানা-প্রকার জাতি ও নানা-প্রকার ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম যুগারম্ভের পূর্ব্বে এক প্রকার ধর্ম্ম; তদনন্তর সত্য যুগ আরম্ভ হইলে অন্য প্রকার; ও ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিতে স্বতন্ত্র প্রকার ধর্ম্ম নিরূপণ হইয়াছে। যথা যুগারম্ভের পূর্ব্বে প্রজা বৃদ্ধির জন্য প্রজাপতি প্রভৃতি তেজীয়ান মহাত্মাগণ, যাঁহারা সৃষ্টি কার্য্যের সাহায্য হেতুক জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন; তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষের রতিক্রিয়ার নিয়ম ছিল না অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছা বশতঃ রতি কার্য্য সমাধা, এবং পুত্র উৎপাদন হইত; প্রায় বিবাহ বিধি প্রচলিত ছিল না। অন্যান্য বিষয়ে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তদনন্তর বহুতর প্রজা বৃদ্ধি হইলে নানা প্রকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। ধর্ম্ম শাস্ত্র ও মহাভারতাদি দর্শনে জানা যায় যে, সত্য-যুগ আরম্ভ হইলে বিবাহ বিধি প্রচলিত হইয়াছিল। এবং উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু হইতে পুত্রোৎপাদন বিষয়ে পূর্ব্ব রীতি রহিত হইয়া ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণেরা চতুর্বর্ণের; ক্ষত্রিয়েরা ত্রিবর্ণের; ও বৈশ্যেরা দুই বর্ণের কন্যা বিবাহ করা প্রচলিত ছিল। এবং পরদার গমনে পাপ হইত। কিন্তু স্বামী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইবার এবং অক্ষত যোনি বিধবার বিবাহ, ও স্থানে স্থানে দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করাইবার বিধি প্রচলিত ছিল। এই নিয়ম দ্বাপর যুগের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে; এবং অন্যান্য ধর্ম্ম অনেক প্রকার প্রচলিত ছিল; তাহা কলিযুগে মনুষ্যেরা হীন বীর্য্য বিধায় রহিত হইয়াছে। অর্থাৎ অশ্বমেধ, ও গোমেধ যজ্ঞ, ও বেদোক্ত সন্ন্যাস, এবং মাংস-অষ্টকা শ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, ও বিধবা বিবাহ, এবং ভিন্ন বর্ণের কন্যা বিবাহ, নৈষ্ঠিক

ব্রহ্মচারির আশ্রম, হীন বর্ণের অন্ন ভক্ষণ, * মহাপ্রস্থান গমন; অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে একটি দুর্গম গহ্বর আছে তথায় গমন, অগ্নি-প্রবেশ, বা ঊর্দ্ধ হইতে পতন পূর্ব্বক প্রাণ-ত্যাগ ইত্যাদি বহুতর বিষয় নিষেধ হইয়াছে। সত্যযুগে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ, কলিতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকল আশু ফলবান হইবার বিধি আছে। সত্যযুগে তপস্যা এবং ত্রেতায় জ্ঞান, ও দ্বাপরে যজ্ঞ, এবং কলিতে দান, প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্য-যুগে বেদতুল্য মনুর স্মৃতি, এবং ত্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ লিখিত, কলিতে পরাশর স্মৃতি মান্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের প্রচলিত শাস্ত্র এককালীন রহিত না হইয়া কোন কোন বিষয়ে অতিরিক্ত বিধি প্রচলিত হইয়াছে মাত্র। কেননা মনুর গ্রন্থে যত প্রকার বিষয়ের ব্যবস্থা লেখা আছে, তাহার শতাংশের একাংশও গৌতমাদি স্মৃতিতে নাই; সুতরাং মনুর মত রহিত হইলে এককালীন ধর্ম্ম কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। অতএব সকল যুগেই সকল শাস্ত্র প্রচলিত ছিল ও আছে; এবং স্থল বিশেষে যুগ ভেদে মতের প্রবলতা মাত্র। এই বিষয়ে একটী উদাহরণ এই যে, মনুর মতে অন্য বর্ণের কন্যা বিবাহ করা ব্রাহ্মণাদির বিধি ছিল; কিন্তু পরাশরের মতে কলিতে তাহা নিষেধ হইয়াছে; সুতরাং ঐ বিষয়ে মনুর মত সত্য-যুগে প্রবল ছিল; কলিযুগে পরাশরের মত প্রবল হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে রঘুনন্দনের কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতি শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে অনেক মীমাংসা জানা যাইতে পারে। অতএব যুগভেদে যে, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম; ধর্ম্ম-শাস্ত্র-কর্ত্তা-দিগের কৃত নহে; কেন না ঈশ্বরের অভিপ্রায় না থাকিলে লোকে কখনই ঐ সকল শাস্ত্র মান্য করিত না। বিশেষতঃ কলিযুগের ব্যবহার বিষয়ে ভবিষত্ কথা যাহা পুরাণাদি শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান কালের আচরণ দৃষ্ট করিলে শাস্ত্র সকল সত্য ও নিতান্ত ঈশ্বরের নিয়ম বলিয়া

* পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্কান্ন ভোজন ও শূদ্রের আমান্ন ভোজনের বিধি ছিল তাহা রহিত হইয়াছে। শূদ্রের পক্কান্ন ভোজন নিষেধ। মনু ৪ অধ্যায় ২২৩ শ্লোক। কৃষক, কুল মিত্র, গোপাল, দাস, নাপিত, ভোজ্যান্ন বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু ইহা দ্ব্যর্থ। ব্রাহ্মণাদিরা সর্ব্বকালে ইহাদিগের আমান্ন, উহারা পক্কান্ন ভোজন বিধি ছিল।

প্রতীতি হইবেক। যথা অধ্যাত্ম রামায়ণে, ঘোর কলিযুগ প্রাপ্ত সময়ে মনুষ্যেরা পুণ্য বর্জিত, এবং দুরাচার রত, মিথ্যাবাদী, পরাপবাদনিরত, পরদ্রব্যাভিলাষী, পরদার রত, পরহিংসা পরায়ন, দেহাত্মবাদী, মূঢ়, নাস্তিক, পশু-বুদ্ধি-যুক্ত, মাতৃপিতৃদ্বেষী, স্ত্রীর বশতাপন্ন, কামের দাস; ও বিপ্র সকল লোভী এবং বেদবিক্রয়ী, ধনার্জ্জনার্থ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার গর্ব্বেতে উন্মত্ত হইবেক; স্বজাতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক; প্রায় পরবঞ্চক হইবেক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা স্বধর্ম্ম-ত্যাগী; এবং শূদ্রে কেহ কেহ ব্রাহ্মণাচার তৎপর হইবেক। অধিকাংশ স্ত্রী-লোক ভ্রষ্টা হইবেক; এবং কেহ কেহ স্বামীকে অবজ্ঞা করিবেক ইত্যাদি। ভাগবতে আছে যে, কলিযুগপ্রভাবে লোক সকল ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ক্ষুদ্র-ভাগ্য, ক্ষুদ্রমনা; ক্ষুদ্র-জীবী, বহু-পুত্র, বহু দরিদ্র; এবং স্ত্রী-সকল স্বেচ্ছাচার বিহারিণী ও অসতী হইবে। জনপদ সকল দস্যু প্রধান; বেদ সকল পাষণ্ডদূষিত; রাজা সকল প্রজা ভক্ষক; ব্রাহ্মণাদিরা শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান ও অগম্যা গমন করিবেক; ব্রহ্মচারিরা বিহিতাচার বর্জ্জিত ও শৌচ শূন্য; ক্রমে ক্রমে সত্যের কথা মাত্র, জ্ঞানের লেশ মাত্র, তপস্যার কথা মাত্র, দানের নাম মাত্র থাকিবেক না। লোক সকল হ্রস্ব-কায়, নির্লজ্জ, কটুভাষী, চোর, মায়াবী, মদ্য-পায়ী, ও দুঃসাহসী হইবে। ধূর্ত্ততা ও কপটতার বৃদ্ধি হইবেক, কেহ কাহার উপকার বা সাহায্য করিবেক না। লোক সকল স্বার্থ-পরতা, ও বণিক সকল ক্ষুদ্র এবং কূটকারী হইবে। ধর্ম্ম দূরে পলায়ন করিবে, ন্যায় পরিহৃত হইবে, লোকরুচিরই প্রাধান্য হইবে, অনেকেই সাধু বিগর্হিত দূষিত বৃত্তি অবলম্বন করিবে, এক মাত্র ধন এবং ধনেরই আদর ও বিদ্যা বুদ্ধির অনাদর হইবে। স্ত্রীলোক অপ্রিয়বাদিনী, গাভী সকল দুগ্ধহীনা, ভূমি সকল শস্য হীনা, বৃক্ষ সকল ফল হীন হইবে। লোক সকল পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সুহৃৎ ও জ্ঞাতিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একান্ত স্ত্রী-পরায়ণ হইয়া শ্যালক প্রভৃতিকে সমাদর করিবেক। দুর্ভিক্ষ মরক এবং দরিদ্রতার বৃদ্ধি ও দুঃখ ক্লেশের একশেষ হইবে; সকলেই আপনা আপনি লইয়া ব্যস্ত হইবে; কেহ কাহার শোক দুঃখে কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। যাহারা ধর্ম্মের লেশ মাত্র অবগত নহে, সেই সকল

কপট মতি দুরাচার উত্তম আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম্মের উপদেশ করিবে। অপণ্ডিত পণ্ডিত অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক এবং অশাস্ত্রী শাস্ত্রী ও অজ্ঞানী জ্ঞানী বলিয়া অভিমানী হইবে। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি অকাল বৃষ্টি ও অল্পবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাত ঘটনা হইবে। রোগ শোক চিন্তা বিষাদ অকাল মৃত্যুর সীমা থাকিবে না। প্রতি নিয়ত দুর্ভিক্ষ হইয়া পিতার সমক্ষে পুত্রকে এবং পুত্রের সমক্ষে পিতাকে ভক্ষণ করিবে। লোক সকল বিকলেন্দ্রিয় হইবে। উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষ হইয়া, ও অনাবৃষ্টিতে সমুদায় সংসার নিরন্ন ও উপায় শূন্য হইলে, সমস্ত প্রজা লোক অন্ন পান ভোজন পরিধান শয়ন স্নান ও ভূষণাদি বিহীন হইয়া নিতান্ত শ্রীহীন-আকার হীনপিশাচের ন্যায় একান্ত কুৎসিত ও মলিন হইবে। অধিক কি, বিংশতি কপর্দ্দক জন্য লোকে পরস্পর সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরানল প্রজ্বালিত করিবে; তাহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে কৃত সংকল্প হইবে। এবং আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিবে; স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কুৎসিত আচরণকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রশংসা করিবে ইত্যাদি। এবং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ষষ্ঠাধ্যায়ে* আছে যে, কলির পঞ্চ সহস্র বৎসর গতে ভগবতী ভাগীরথী পৃথিবী ত্যাগ করিবেন; তখন কাশী এবং বৃন্দাবন ব্যতীত প্রায় সকল তীর্থ লোপ হইতে থাকিবেক। ক্রমশ লোপ হইতে হইতে যখন দশ সহস্র বৎসর গত হইবেক, তখন শ্রীশ্রীঈশ্বর জগন্নাথ দেব ও শালগ্রাম শিলা সকল অন্তর্হিত হইবেন। তীর্থসকল লোপ হইবেক; এবং তৎকালে বিষ্ণু ভক্ত ও পুরাণাদি শাস্ত্র এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ ও বেদোক্ত কর্ম্ম সকল হরি পূজা ও তন্নাম সংকীর্ত্তন ও বেদাঙ্গ শাস্ত্র সকল সাধু ও ধর্ম্ম ও সত্যব্রত ও তপস্যা ও অনশন ব্রত ইহা সমস্ত লোপ হইবেক। লোক সকল মিথ্যা কপট ও বামাচাররত ও তুলসীবর্জ্জিতা পূজা ও একাদশী রহিত হইবেক, ও লোক সকল হরিনামে বিমুখ, কেবল শঠ, ক্রূর, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, চোর, হিংসক হইবেক। স্ত্রী পুরুষের বিবাহ ভিন্ন বর্ণে হইবেক, এবং দ্রব্যের স্বামী নির্ণয় থাকিবেক না। লোক সকল স্ত্রীর বশতাপন্ন, ও গৃহে গৃহে স্ত্রীলোক সকল ব্যভিচারিণী হইবেক; স্বামীকে সর্ব্বদা তর্জ্জন ও ভর্ৎসন করিবেক; তিনি

* আমার নিকট যে পুস্তক আছে, তাহা ১০৮৩ শকের লেখা, তাহার কলেবর দৃষ্টে তাহা যথার্থ বোধ হয়।

গৃহেশ্বরী, ও স্বামী ভৃত্যের অধম হইবেন; শ্বশুর শাশুড়ী দাস দাসীর ন্যায় হইবেক। বলবান ব্যক্তিই কর্ত্তা হইবেক। এবং যোনি সম্বন্ধই বান্ধব; অন্য সম্পর্কীয় লোকেরা বান্ধব হইবেক না; বরং নিঃসম্পর্কীয় লোককে বন্ধু বলিয়া আদর করিবেক; স্ত্রীর আজ্ঞা ব্যতীত পুরুষ কোন কার্য্য করিতে পারিবেক না। দ্বিজাতিরা সন্ধ্যা বন্দনাদি ও যজ্ঞোপবীত বর্জ্জিত হইয়া বর্ণ-ভেদ রহিত হইবেক; ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া-স্ব শাস্ত্র সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল ম্লেচ্ছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেক; ব্রাহ্মণাদিরা শূদ্রের সেবক এবং পাচক ধাবক বলদবাহক হইবেক। মনুষ্য সকল সত্য হীন, পৃথিবী শস্য-হীনা, বৃক্ষ সকল ফলহীন, স্ত্রীলোক প্রায় বন্ধ্যা ও গাভী দুগ্ধ হীনা, ও দুগ্ধ ঘৃত হীন; দম্পতী সকল প্রীতি হীন হইবেক। রাজা শঠ ও প্রজারা কর পীড়িত, নদ নদী ও দিঘী আদি সকল জল হীন ও চতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্ম ও পুণ্য হীন হইবেক। লক্ষ জনের মধ্যেও একটী পুণ্যবান পাওয়া যাইবেক না; নর নারী ও বালক বালিকা সকল কুৎসিত বিকৃতাকার কুভাষী ও কুৎসিত শব্দকারী হইবেক। কোন কোন গ্রাম ও নগর মনুষ্য শূন্য ভয়ানক হইবেক। অরণ্য সকল গ্রাম ও নগর হইবেক, তাহাতে স্বল্প কুটীরে বাস করিয়াও লোক কর-পীড়িত হইবেক; নদ নদীতে শস্য ও মহদ্বংশ সকল লোপ হইবেক; কখন কখন মিথ্যাবাদী ধূর্ত্তেরা, সত্যবাদী, পাপিরা পুণ্যবান্‌, লম্পটেরা জিতে-ন্দ্রিয়, সতী, বেশ্যারা পাতকীরা তপস্বী, অবৈষ্ণবেরা বিষ্ণুভক্ত, ও চোর নর-ঘাতীরা অহিংসক ভিক্ষুক বেশ ধারণ করিয়া হাস্য ও লোককে নিন্দা করিবেক। ফলতঃ অধার্ম্মিকেরাই পূজ্য হইবেক। নর নারী সকল বামনাঙ্গ হইবেক; অল্পায়ু ভোগী ও সর্ব্বদা পীড়িত, ও ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৃদ্ধ হইবেক; বিংশতি বর্ষে মহাবৃদ্ধ হইবেক, অষ্টম বর্ষে স্ত্রীলোকের রজ ও বৎসরান্তে সন্তান; সহস্রের মধ্যে জনৈক প্রসূতা, নতুবা প্রায়ই বন্ধ্যা হইবেক, বর্ণ চতুষ্টয় কন্যা বিক্রয় এবং কন্যা ভগিনী ইত্যাদি স্ত্রী লোকের ব্যভিচার উপার্জ্জিত ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেক; কীর্ত্তি ধর্ম্মের নিমিত্তে দান করিয়া পরে কাড়িয়া লইবেক, দেববৃত্তি ব্রাহ্মণবৃত্তি গুরুর বৃত্তি স্বয়ং দাতাই হউক বা পর দাতারই হউক তাহা উচ্ছেদ করিয়া লইবেক। কেহ কন্যা, কেহ শাশুড়ী, কেহ পুত্র-বধূ, কেহ ঐ সকল; এবং কেহ ভাগিনী, কেহ বিমাতা, কেহ ভ্রাতৃপত্নী গমন

করিবেক, প্রায় ঘরে ঘরে অগম্যা গমন করিবেক; পত্নীর নির্ণয় থাকিবেক না; কুব্যবসায় কুকর্ম্ম শালী ও ম্লেচ্ছ আচারী হইবেক; ইহা সকল কলির প্রবৃত্তে আরম্ভ হইয়া ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক; তদনন্তর হস্ত প্রমাণ বৃক্ষ ও অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত মনুষ্য সকল হইবেক ইত্যাদি। আর আর সকল বিষয় অনেক পুরাণে লিখিত আছে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, পরে প্রবল কলি প্রবর্ত্ত হইলে ঐ সকল ঘটনা হইবেক। যে সময় পঞ্চসহস্র বৎসর গত হইয়া ভাগীরথী তিরোহিতা হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন; তখন প্রবল কলি আরম্ভ হইবেক। তদনন্তর পর্য্যন্ত, কিছু দিন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে স্থানে স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা চলিবেক। তৎপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও সালগ্রাম শিলা সকল তিরোভূত হইলে একবর্ণা হইবেক। ও কলির শেষে কল্কি অবতার হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ করতঃ ভগবান ঈশ্বর পুনরায় সত্যযুগের সৃষ্টি করিবেন*। এইক্ষণতক দেব পূজা চলিতেছে; ক্রমশঃ তাহা লোপ হইয়া কেবল নাম সংকীর্ত্তনে ধর্ম্ম রক্ষা হইবেক; পশ্চাৎ তাহাও লোপ হইবেক। এক্ষণে যে দেব পূজা প্রচলিত আছে, তাহার উদ্দেশ্য ও ফল ও দেবতা কি, তাহা নির্ণয় করা যাউক্।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দেবতা নির্দ্দেশ ও তাহার পূজার প্রয়োজন।

দেবতা দুই প্রকার; তাহার কতক গুলি দেখা যায়, ও কতক গুলি দেখা যায় না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর কতক গুলি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট দেবতা ও কতকগুলি স্থূল শরীর বিশিষ্ট চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাঁরা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত থাকিয়া জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কেবল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি কতকগুলি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ

* সিংহলে এবং পর্ব্বতে ও অন্যান্য স্থানে তপস্বী ও যোগী স্ত্রীপুরুষ এবং রাজবংশীয় সকল ধার্ম্মিক লোক থাকিবেক। কল্কী ম্লেচ্ছ বিনাশ করিলে ঐ সকল লোকের দ্বারা সত্যযুগ হইবেক; কল্কী পুরাণে আছে।

দেখা যায়; এবং বায়ুকে প্রত্যক্ষ করা যায় ও জল অগ্নি ও পৃথিবীকে গ্রহণ করা যায়। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল এক্ষণে দেখা যায় না; কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, দেবতা সকল লোকদিগের শরীরে আছেন। অর্থাৎ শরীরস্থ বিরাটের ব্যষ্টি বিশ্ব-নাম-ধারী আত্মা দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিষয় অনুভব করেন। এবং অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, প্রজাপতি কর্ত্তৃক বাক্,পাণি,পাদ,পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমেতে বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ, আনন্দ, এই বাহ্য বিষয় অনুভব করেন। চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর, বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়, ইহারা ক্রমেতে সঙ্কল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, অহঙ্কার্য্য, চিত্ত, এই সকল বিষয় অনুভব করেন।*, ফলিতার্থে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও মনাদি প্রত্যেকে এক একজন দেবতার অংশ আছে; ইঁহারা কর্ম্মাত্মা দেবতা; ঐ সকল সূক্ষ্মরূপী দেবতারা ক্রীড়া করণ মানসে নিজ নিজ অংশ হইতে হস্ত পদাদিবিশিষ্ট স্বীয় স্বীয় নামধারী হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া কশ্যপ প্রজাপতি হইতে অদিতির গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ স্থূল দেহ† ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে হইয়াছিল; ঐ সকল দেবতারা তপস্যাদ্বারা সিদ্ধি লাভ করতঃ হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু নামক পর্ব্বতের উপরে স্বর্গ নামক স্থানে বাস করিতেন। তথায় অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করতঃ পৃথিবীর সকল স্থানে বিচরণ করিতেন। কিন্তু ঐ কশ্যপ হইতে দিতির গর্ব্ভে কতকগুলি দৈত্য, যাহাদিগকে অসুর এবং দানব বলা যায়; তাহারা জন্মগ্রহণ করতঃ দেবতাদিগের ঐ অনির্ব্বচনীয় সুখ দর্শনে লুব্ধ হইয়া ঐ স্বর্গ স্থান অপহরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়াছিল। তজ্জন্য সময়ে সময়ে দেবাসুরের সংগ্রাম হইত; অসুরেরা তপস্বী এবং বলবান্ বিধায় ঐ শরীরধারী দেবতাদিগকে সময় সময় পরাজয় করিয়া স্বর্গ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তন্নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণু এবং ভগবতী দুর্গা এবং

* বেদান্ত সার।
† স্থূল দেহের ন্যায় দেহ।

লক্ষ্মী ও শিব, ইহাঁদিগের অংশ হইতে নানাপ্রকার অবতার হইয়া ঐ অন্যায় কারী অসুরদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন। ইহা নানা পুরাণে ব্যক্ত আছে; দ্বাপরযুগের শেষ এবং কলির প্রথম সময় পর্য্যন্ত অসুরের প্রাদুর্ভাব থাকাতে দেবতারা সময় সময় মর্ত্ত-লোকে বিচরণ করিয়াছেন। অধুনা অসুর সকল তপস্যাহীন হওয়াতে আর প্রবল না থাকায় স্বর্গস্থান আক্রমণে সমর্থ হয় না; এজন্য দেবতারা স্বর্গে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা তথায় থাকিয়া স্বীয় স্বীয় শক্তিদ্বারা জগৎকার্য্য চালাইতেছেন। দেবতারা যোগবলে এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সাকার ও নিরাকার দুই হইতে পারেন। তাহাতে স্থূল দেহ রূপে সাকার না হইলে সুখ সম্ভোগ হয় না বলিয়া সাকার হইয়াছিলেন; এবং এখনও বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু নিরাকার রূপে জগৎ কার্য্য করিতেছেন; অর্থাৎ ইন্দ্র, মেঘ দ্বারা; ও পবন বায়ু দ্বারা, বরুণ জল দ্বারা, এবং চন্দ্র সূর্য্য আলোক দ্বারা, ও নবগ্রহ সকল লোকের অদৃষ্ট জনক শুভাশুভ ফল প্রদান দ্বারা, জগৎকার্য্য সাধন করিতেছেন। দেবতারা যোগ বলে এই সকল কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কেননা অষ্ট সিদ্ধির তাৎপর্য্য এই যে, অনিমা, (সূক্ষ্ম হওয়া) লঘিমা, (ছোট হওয়া) মহিমা (বড় হওয়া) গরিমা, (গুরুত্ব) ঈশিত্ব, (ঈশ্বরত্ব) বশিত্ব, (বশীভূত করা) প্রাপ্তি, (ইচ্ছা-বিষয় লাভ) প্রাকাম্য, (ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য সমাধা করণ) এই অষ্টসিদ্ধি, ইহার মধ্যে ঈশিত্ব গুণ সকল দেবতার ছিল না; কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁদিগের অষ্টসিদ্ধি ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ইন্দ্র দেবতার রাজা, তাঁহারাও ঈশিত্ব সিদ্ধি ছিল। কিন্তু বোধ হয় তাহা তাঁহার অল্পমাত্র ছিল; সমুদায় ঈশ্বরত্ব গুণ ছিল না; ইন্দ্রের যে বজ্র ছিল, তাহা দধীচি মুনির অস্থিতে হইয়াছিল। বৃষ্টির সময় যে বজ্রাঘাত হয়, তাহা সেই বজ্র নহে, ইহা মেঘের তেজ হইতে নির্গত হয়। দেবতাদিগের ঈশ্বরত্ব না থাকার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আরাধনা করিয়া ঐ রূপ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; স্বয়ং ঈশ্বর হইলে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন না। তবে দেবতারা জগৎ কার্য্যে মনুষ্যদিগের প্রতি কর্তৃত্ব থাকায় তাহা-দিগের পূজা, হোম ইত্যাদির বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাঁহারা আমাদিগের

অভীষ্ট ফল প্রদানে সম্যক প্রকারে সমর্থ, তাহার সন্দেহ নাই। এই বিষয় ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ ম হইতে ১৬ শ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাদিগকে বলেন যে, এই যজ্ঞ তোমাদিগের বৃদ্ধির হেতু, এবং যজ্ঞই তোমাদিগের অভীষ্ট ফল-দাতা হইবেন। কারণ তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণকে পূজা ও ঘৃতাহুতি প্রদান দ্বারা তুষ্ট কর: এবং দেবতারা বৃষ্টি ইত্যাদি দ্বারা অন্নাদির উৎপত্তি করিয়া তোমাদিগকে বৃদ্ধি করুন। অতএব পরস্পর ইষ্টসাধন করিলে উভয়ে শ্রেয় লাভ করিবে। বিশেষতঃ যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট হইয়া দেবতারা তোমাদিগকে ভোগ সামগ্রী সকল প্রদান করিবেন। তোমরা তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোজন করিলে চোর হইবে। কেননা যাহারা দ্রব্য প্রদান করেন, তাহাদিগকে তাহা নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে, সে অবশ্যই ধর্ম্মতঃ চোর হইবেক,তাহার সন্দেহ নাই। যিনি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন; এবং যিনি দেবতাকে প্রদান না করিয়া কেবল নিজের নিমিত্ত পাক ও ভোজন করেন, তিনি পাপভোজন করেন। কারণ যজ্ঞ ধূম দ্বারা মেঘ হয়, মেঘ-দ্বারা বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দ্বারা শস্যাদি জন্মে; ঐ শস্যাদি ভোজন দ্বারা শুক্র শোণিতের উৎপত্তি হয়; তাহাতে প্রজার দেহ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই যজ্ঞ লোকের কর্ম্ম হইতে হয়, কর্ম্মসকল বেদ হইতে নির্দ্দিষ্ট হয়; বেদ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভব হওয়াতে তিনি সকল যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব কর্ম্ম দ্বারা যিনি দেবতা-দিগের আরাধনা না করেন, তাহার বৃথা জীবন; এবং তিনি অনবরত নরক যাতনা ভোগ করিতে থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ধূম জ্যোতি অর্থাৎ তেজ এবং জলীয় পরমাণু ও বায়ু দ্বারা মেঘের উৎপত্তি হয়। ঐ মেঘ যজ্ঞাহুতির ধূম যাহা সূর্য্যমণ্ডলে যায়,সেই ধূম দ্বারা উৎপন্ন হইলে,তাহা হইতে যে বৃষ্টি হয়, তাহা অখণ্ডনীয় শস্য উৎপাদক। এবং ঐ মেঘের দ্বারা অতি-বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অন্য ধূম দ্বারা যে মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়, তাহাতে উত্তম শস্য ও ফলাদি জন্মে না; ও তাহাতে অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইতে থাকে। ইহা এইক্ষণ প্রত্যক্ষ হইতেছে; কারণ পূর্ব্বে যে পরিমাণ শস্য হইত, এক্ষণে তাহা হয় না; ক্রমে যত যজ্ঞ নিবারণ হই-

বেক, ততই শস্য হইবেক না; এবং অকাল বৃষ্টি প্রভৃতি দোষ সংঘটন হইবেক। ফলতঃ মন্ত্রযুক্ত ঘৃত আহুতি দ্বারা যে মেঘ হয়, তাহাতে উত্তম রূপ ঘটনা হয়; তাহা দ্রব্য গুণ স্বীকার করিলেও অনুভব হইতে পারে। এক্ষণে কলিকাল উপস্থিত হইবাতে যজ্ঞ বিঘ্ন জন্য এরূপ মন্দ কাল ঘটনা হইতেছে। কলিতে যজ্ঞ বিঘ্নের কারণ এই, যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে লেখা আছে যে, দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য কেবল তপস্যায় নিরত থাকেন, তাহাতে জগৎ কার্য্য বিশৃঙ্খল হয়, এজন্য ঈশ্বর-ইচ্ছা-ক্রমে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা তপস্যা দ্বারা বলবান হইয়া দেবতার সহিত যুদ্ধ করাতে দেবগণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকাতে আর তপস্যা করিতে না পারিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না; কেবল জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেন; ক্রমশঃ অসুরেরা যজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, অসুরেরা প্রবল হইলে দেবতারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া বলেন যে,কলিতে অসুরেরা তপস্যাবলে স্বয়ং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতঃ আমাদিগের ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি পদ অপহরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে; তাহা নিবারণ ব্যতীত জগৎকার্য্য চলে না। ভগবান বিষ্ণু দেখিলেন যে, ক্রূর অসুরগণকে নিবারণ না করিলে জগৎকার্য্য বিশৃঙ্খল হইতে পারে। কেননা দেবতার কার্য্য অন্যের দ্বারা হইতে পারে না; ইহা বিবেচনা করিয়া দুষ্টবুদ্ধি-অসুর-দিগকে মোহনার্থ বুদ্ধ অবতার হইয়া মায়া মোহকে অসুর সমীপে প্রেরণ করেন। তাহারা অসুরদিগকে ভুলাইয়া যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড সকল রহিত করাইলেন; অসুরেরা ক্রিয়া-হীন ও তপস্যা হীন হইবায়, তাহারা সামান্য মনুষ্যের ন্যায় হইয়া গেল; সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা আর দেবগণের অনিষ্ট হইতে পারে না। এবং ভগবানের আর অবতার হইতে হয় না; কারণ সামান্য মনুষ্যেরা যতই জগতের অনিষ্টকারী হউক না কেন, তাহাদিগের তপস্যা না থাকায় দেবতারা তাহাদিগকে স্বয়ংই নষ্ট করিতে পারেন। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ বুদ্ধ অবতার হওয়ার পরে কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিবায় এককালীন অকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞ রহিত হইয়া নাস্তিকের বৃদ্ধি হইয়াছিল। তদনন্তর ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অবতার হইয়া নাস্তিক নিরাস করতঃ যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রচার

করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ সম্যক্ রূপে প্রচলিত হয় নাই; সে কেবল কলির মাহাত্ম্য প্রযুক্তই হয় নাই। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৭।৮ ম শ্লোকে আছে যে, যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই সময় "আমি" অর্থাৎ ঈশ্বর অবতার রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধুদিগেব পরিত্রাণ এবং পাপীদিগকে বিনাশ করতঃ ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকি। এইরূপ যুগে যুগে হইতে থাকে। অতএব ঈশ্বরেব কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন; কি জন্য তিনি কি কার্য্য করেন, তাহা তিনিই জানেন; পুরাণে আছে যে, অত্যন্ত অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে ভগবান কল্কীরূপ ধারণ করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন; কেননা ধর্ম্ম ব্যতীত জগৎকার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হয় না। এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্যতীতও ধর্ম্ম হয় না; ও যাগ যজ্ঞাদি কেবল দেবতাদিগের ও পিতৃলোকের এবং ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র, বেদে তাহাই বিহিত হইয়াছে। অতএব দেবতা-দিগের পূজা ও হোম করা অতীব কর্ত্তব্য; তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে করা হইলে কাম্য ফল প্রাপ্তি হইতে পারে; এবং দেবতাদিগের অর্চ্চনা না করিলে মহাপাপ জন্মে, তাহাতে পরকালে নরক ভোগ এবং ইহকালেও কোন সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেরূপ দেবতাদিগের পূজা করা প্রয়োজন, তদ্রূপ পিতৃ-দেবতা-দিগের পূজা করাও আবশ্যক, অতএব পিতৃলোক কি, ও তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদির আবশ্যকতাই বা কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পিতৃলোক এবং তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদির আবশ্যকতা নির্ণয়।

মনুর ৩ য় অধ্যায়ের ১৯৪ হইতে ২০০ শ্লোক দৃষ্টে জানা যায় যে, মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে কএক জন পিতৃলোক নামে অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ সোম সদ সাধ্যগণের, ও অগ্নিষ্বত্তা দেবগণের ও বর্হিষদ দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব সুপর্ণ কিন্নরদিগের, এবং সোমপা ব্রাহ্মণগণের, হবির্ভুজ ক্ষত্রিয়ের, আজ্যপা বৈশ্যের, সুকালিন্ শূদ্রের পিতৃ-

লোক হইয়াছিলেন। এবং অগ্নিদগ্ধ, ও অগ্নিদগ্ধ ও কাব্য, বর্হিষদ, এবং অগ্নিষত্বা ও সৌম্য ইহঁারাও ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক অর্থাৎ ইহঁাদের হই-হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ জন্মাইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ঋষিরা কেবল তপস্যা-নিরত ছিলেন, তাঁহারা কেহ প্রজাপতি ও কেহ মহর্ষি ও কেহ দেবর্ষি হইয়াছিলেন; আর যাঁহারা সংসারে থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করতঃ পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিয়মিত পরমায়ু ভোগান্তে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গতুল্য স্থানে পিতৃলোককে আকল্প পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহারাই পিতৃলোক নামে খ্যাত হইলেন। মনুর ৩ য় অধ্যায়ের ২০১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দৃষ্টে জানা যায় যে, যাঁহারা পিতৃলোক হইতে প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা দেবতা-নামে খ্যাত হয়েন। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পিতৃদেবতা বলা যায়। তাঁহাদিগের অংশ হইতে ক্রমে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ও তাহা হইতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি; অর্থাৎ জগতের সকল মনুষ্যই হইয়াছে। যদ্যপি ঈশ্বর হইতে সকল পদার্থ ও মনুষ্যাদি হইয়াছে; কিন্তু পিতৃলোকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। কেননা পুত্রেতে যে রূপ পিতার অংশ আছে, তদ্রূপ পিতা প্রভৃতিতে পিতামহাদির অংশ আছে। ঐ রূপ পূর্ব্বাপর পিতৃলোকে প্রজাপতির অংশ এবং প্রজাপতিতে সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ব্ভ ঈশ্বরের অংশ আছে; অতএব মনুষ্য মাত্রের সাক্ষাৎ ঈশ্বর পিতা মাতা হইতেছেন; তাহার সন্দেহ নাই। মনুর ২য় অধ্যায় ২২৫ শ্লোকে আছে, পিতা প্রজাপতি ও মাতা পৃথিবী তুল্য; এবং পিতা মাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। এক্ষণে শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ কি তাহা দেখা যাউক। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে। শ্রদ্ধা শব্দে শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়। তাহাতে মৃত পিতৃলোক দিগের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য দান করা যায়, তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে; এবং জলদানকে তর্পণ বলে; দেবতা উদ্দেশে যে দান করা যায়, তাহাকে পূজা বলে; বাস্তবিক ঐ সকল দান সকলই শ্রদ্ধার কার্য্য। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে, দেবঋণ, ঋষিঋণ, মনুষ্যঋণ, এবং পিতৃঋণগ্রস্ত হইয়া লোকে জন্মগ্রহণ করে। তাহাতে যজ্ঞদ্বারা দেব-ঋণ, ও বেদপাঠে ও নিত্যক্রিয়া-দ্বারা ঋষিঋণ, ও মনুষ্য দিগকে অন্নপ্রদান এবং তাহাদিগের উপকার দ্বারা মনুষ্য-

ঋণ হইতে মুক্ত হয়; পিতৃঋণ পরিশোধের আর উপায় নাই, কেবল শ্রাদ্ধ তর্পণ ও গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান, এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ হওয়া শাস্ত্রে বিধান হইয়াছে। পুত্রোৎপাদনের তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রের দ্বারা ঐ সকল শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবেক বলিয়া ঐ বিধি হইয়াছে। বিশেষতঃ পুরাণাদি শাস্ত্রে আছে যে, বিধি পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা হইলে যাগ যজ্ঞাদি তাহার ষোড়শাংশের একাংশও হইতে পারে না; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুত্র পৌত্রাদিবংশের সন্তান কর্ত্তৃক যে শ্রাদ্ধ তর্পণ হয়, তাহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে, এই বংশ পরম্পরার মূলই পুত্র। অতএব যে কারণ পিতা মাতার বৈধ পুত্র উৎপাদন করা আবশ্যক, সেই কারণের কার্য্য করাও পুত্রগণের কর্ত্তব্য, অতএব ভক্তি পূর্ব্বক পিতৃকার্য্য করা পুত্রাদির নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তি শব্দের অর্থ ভালবাসা; তাহা তিন প্রকার, অর্থাৎ আপনা হইতে গুরুতর ব্যক্তিকে ভাল বাসা হইলে তাহাকে ভক্তি বলে; ও তুল্য ব্যক্তিকে ভালবাসার নাম প্রেম; এবং লঘুকে ভালবাসার নাম স্নেহ। তাহাতে পিতা মাতা যে প্রকার স্নেহ করেন; পুত্রাদিরও পিতা মাতার প্রতি তাদৃশী ভক্তি করা উচিত; এবং পিতা মাতাই লোকের ভক্তির পাত্র। কেন না পিতা বিধি পূর্ব্বক মাতার পাণিগ্রহণ করণানন্তর যথাকালে পুত্র উৎপাদন ও মাতা দশম মাস পর্য্যন্ত গর্ভে ধারণ করেন, ইহাতে যে উদরের মধ্যে একটা মনুষ্যের ভার বহন করিতে হয় এবং গাত্র ভঙ্গ প্রভৃতি বাহ্যিক ও আন্তরিক যাতনা সহ্য করিতে হয় তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন; পরে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে সে যাতনাতে মৃত্যু-প্রায় হইতে হয়। এমন কি কেহ কেহ ঐ সময়ে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর ভূমিষ্ঠ বালকের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয়; অর্থাৎ বালকের বিষ্ঠা মূত্রাদি পবিত্যাগ করান; এবং সময়ে সময়ে ঐ বালকের নিমিত্ত আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া থাকেন। পিতা স্নেহ-বশতঃ বহু কষ্টে ঐ পুত্রের নানা প্রকার আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রদান; এবং যথা বিধি সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস দ্বারা পরম উপকার করেন; এবং অন্যান্য কত প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া পিতা মাতা পুত্রের মঙ্গল সাধন করেন, তাহা সমুদায় লেখা অসাধ্য। অতএব যাহারা পুত্রাদির নিমিত্ত এতাধিক

বেক, ততই শস্য হইবেক না; এবং অকাল বৃষ্টি প্রভৃতি দোষ সংঘটন হইবেক। ফলতঃ মন্ত্রযুক্ত ঘৃত আহুতি দ্বারা যে মেঘ হয়, তাহাতে উত্তম রূপ ঘটনা হয়; তাহা দ্রব্য গুণ স্বীকার করিলেও অনুভব হইতে পাবে। এক্ষণে কলিকাল উপস্থিত হইবাতে যজ্ঞ বিঘ্ন জন্য এরূপ মন্দ কাল ঘটনা হইতেছে। কলিতে যজ্ঞ বিঘ্নের কারণ এই, যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে লেখা আছে যে, দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য কেবল তপস্যায় নিরত থাকেন, তাহাতে জগৎ কার্য্য বিশৃঙ্খল হয়, এজন্য ঈশ্বর-ইচ্ছা-ক্রমে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা তপস্যা দ্বারা বলবান হইয়া দেবতার সহিত যুদ্ধ করাতে দেবগণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকাতে আর তপস্যা করিতে না পারিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না; কেবল জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেন; ক্রমশঃ অসুরেরা যজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, অসুরেরা প্রবল হইলে দেবতারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া বলেন যে,কলিতে অসুরেরা তপস্যাবলে স্বয়ং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতঃ আমাদিগের ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি পদ অপহরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে; তাহা নিবারণ ব্যতীত জগৎকার্য্য চলে না। ভগবান বিষ্ণু দেখিলেন যে, ক্রুর অসুরগণকে নিবারণ না করিলে জগৎকার্য্য বিশৃঙ্খল হইতে পারে। কেননা দেবতার কার্য্য অন্যের দ্বারা হইতে পারে না: ইহা বিবেচনা করিয়া দুষ্টবুদ্ধি-অসুর-দিগকে মোহনার্থ বুদ্ধ অবতার হইয়া মায়া মোহকে অসুর সমীপে প্রেরণ করেন। তাহারা অসুরদিগকে ভুলাইয়া যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড সকল রহিত করাইলেন; অসুরেরা ক্রিয়া-হীন ও তপস্যা হীন হইবায়, তাহারা সামান্য মনুষ্যের ন্যায় হইয়া গেল; সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা আর দেবগণের অনিষ্ট হইতে পারে না। এবং ভগবানের আর অবতার হইতে হয় না; কারণ সামান্য মনুষ্যেরা যতই জগতের অনিষ্টকারী হউক না কেন, তাহাদিগের তপস্যা না থাকায় দেবতারা তাহাদিগকে স্বয়ংই নষ্ট করিতে পারেন। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ বুদ্ধ অবতার হওয়ার পরে কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিবায় এককালীন অকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞ রহিত হইয়া নাস্তিকের বৃদ্ধি হইয়াছিল। তদনন্তর ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অবতার হইয়া নাস্তিক নিরাস করতঃ যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রচার

করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ সম্যক্ রূপে প্রচলিত হয় নাই; সে কেবল কলির মাহাত্ম্য প্রযুক্তই হয় নাই। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৭।৮ ম শ্লোকে আছে যে, যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই সময় "আমি" অর্থাৎ ঈশ্বর অবতার রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং পাপীদিগকে বিনাশ করতঃ ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকি। এইরূপ যুগে যুগে হইতে থাকে। অতএব ঈশ্বরের কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন; কি জন্য তিনি কি কার্য্য করেন, তাহা তিনিই জানেন; পুরাণে আছে যে, অত্যন্ত অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে ভগবান কল্কীরূপ ধারণ করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন; কেননা ধর্ম্ম ব্যতীত জগৎকার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হয় না। এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্যতীতও ধর্ম্ম হয় না; ও যাগ যজ্ঞাদি কেবল দেবতাদিগের ও পিতৃলোকের এবং ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র, বেদে তাহাই বিহিত হইয়াছে। অতএব দেবতা-দিগের পূজা ও হোম করা অতীব কর্ত্তব্য; তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে করা হইলে কাম্য ফল প্রাপ্তি হইতে পারে; এবং দেবতাদিগের অর্চ্চনা না করিলে মহাপাপ জন্মে, তাহাতে পরকালে নরক ভোগ এবং ইহকালেও কোন সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেরূপ দেবতাদিগের পূজা করা প্রয়োজন, তদ্রূপ পিতৃ-দেবতা-দিগের পূজা করাও আবশ্যক, অতএব পিতৃলোক কি, ও তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদির আবশ্যকতাই বা কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পিতৃলোক এবং তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদির আবশ্যকতা নির্ণয়।

মনুর ৩ য় অধ্যায়ের ১৯৪ হইতে ২০০ শ্লোক দৃষ্টে জানা যায় যে, মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে কএক জন পিতৃলোক নামে অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ সোম সদ সাধ্যগণের, ও অগ্নিষ্বত্তা দেবগণের ও বর্হিষদ দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব সুপর্ণ কিন্নরদিগের, এবং সোমপা ব্রাহ্মণগণের, হবির্ভুজ ক্ষত্রিয়ের, আজ্যপা বৈশ্যের, সুকালিন শূদ্রের পিতৃ-

লোক হইয়াছিলেন। এবং অগ্নিদগ্ধ, ও অগ্নিদগ্ধ ও কাব্য, বর্হিষদ, এবং অগ্নিষত্বা ও সৌম্য ইহাঁরাও ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক অর্থাৎ ইহাঁদের হই-হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ জন্মাইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ঋষিরা কেবল তপস্যা-নিরত ছিলেন, তাঁহারা কেহ প্রজাপতি ও কেহ মহর্ষি ও কেহ দেবর্ষি হইয়াছিলেন; আব যাঁহারা সংসারে থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করতঃ পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিয়মিত পরমায়ু ভোগান্তে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গতুল্য স্থানে পিতৃলোককে আকল্প পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহারাই পিতৃলোক নামে খ্যাত হইলেন। মনুর ৩ য় অধ্যায়ের ২০১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দৃষ্টে জানা যায় যে, যাঁহারা পিতৃলোক হইতে প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা দেবতা-নামে খ্যাত হয়েন। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পিতৃদেবতা বলা যায়। তাঁহাদিগের অংশ হইতে ক্রমে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ও তাহা হইতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি; অর্থাৎ জগতের সকল মনুষ্যই হইয়াছে। যদ্যপি ঈশ্বর হইতে সকল পদার্থ ও মনুষ্যাদি হইয়াছে; কিন্তু পিতৃলোকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। কেননা পুত্রেতে যে রূপ পিতার অংশ আছে, তদ্রূপ পিতা প্রভৃ-তিতে পিতামহাদির অংশ আছে। ঐ রূপ পূর্ব্বাপর পিতৃলোকে প্রজাপতির অংশ এবং প্রজাপতিতে সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের অংশ আছে; অতএব মনুষ্য মাত্রের সাক্ষাৎ ঈশ্বর পিতা মাতা হইতেছেন; তাহার সন্দেহ নাই। মনুর ২য় অধ্যায় ২২৫ শ্লোকে আছে, পিতা প্রজাপতি ও মাতা পৃথিবী তুল্য; এবং পিতা মাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। এক্ষণে শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ কি তাহা দেখা যাউক। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে। শ্রদ্ধা শব্দে শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়। তাহাতে মৃত পিতৃ-লোক দিগের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য দান করা যায়, তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে; এবং জলদানকে তর্পণ বলে; দেবতা উদ্দেশে যে দান করা যায়, তাহাকে পূজা বলে; বাস্তবিক ঐ সকল দান সকলই শ্রদ্ধার কার্য্য। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে, দেবঋণ, ঋষিঋণ, মনুষ্যঋণ, এবং পিতৃঋণগ্রস্ত হইয়া লোকে জন্মগ্রহণ করে। তাহাতে যজ্ঞদ্বারা দেব-ঋণ, ও বেদপাঠে ও নিত্যক্রিয়া-দ্বারা ঋষি-ঋণ, ও মনুষ্য দিগকে অন্নপ্রদান এবং তাহাদিগের উপকার দ্বারা মনুষ্য-

ঋণ হইতে মুক্ত হয়; পিতৃঋণ পরিশোধের আর উপায় নাই, কেবল শ্রাদ্ধ তর্পণ ও গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান, এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ হওয়া শাস্ত্রে বিধান হইয়াছে। পুত্রোৎপাদনের তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রের দ্বারা ঐ সকল শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবেক বলিয়া ঐ বিধি হইয়াছে। বিশেষতঃ পুরাণাদি শাস্ত্রে আছে যে, বিধি পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা হইলে যাগ যজ্ঞাদি তাহার ষোড়শাংশের একাংশও হইতে পারে না; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুত্র পৌত্রাদিবংশের সন্তান কর্তৃক যে শ্রাদ্ধ তর্পণ হয়, তাহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে, এই বংশ পরম্পরার মূলই পুত্র। অতএব যে কারণ পিতা মাতার বৈধ পুত্র উৎপাদন করা আবশ্যক, সেই কারণের কার্য্য করাও পুত্রগণের কর্ত্তব্য, অতএব ভক্তি পূর্ব্বক পিতৃকার্য্য করা পুত্রাদির নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তি শব্দের অর্থ ভালবাসা; তাহা তিন প্রকার, অর্থাৎ আপনা হইতে গুরুতর ব্যক্তিকে ভাল বাসা হইলে তাহাকে ভক্তি বলে; ও তুল্য ব্যক্তিকে ভালবাসার নাম প্রেম; এবং লঘুকে ভালবাসার নাম স্নেহ। তাহাতে পিতা মাতা যে প্রকার স্নেহ করেন; পুত্রাদিরও পিতা মাতার প্রতি তাদৃশী ভক্তি করা উচিত; এবং পিতা মাতাই লোকের ভক্তির পাত্র। কেন না পিতা বিধি পূর্ব্বক মাতার পাণিগ্রহণ করণানন্তর যথাকালে পুত্র উৎপাদন ও মাতা দশম মাস পর্য্যন্ত গর্ভে ধারণ করেন, ইহাতে যে উদরের মধ্যে একটা মনুষ্যের ভার বহন করিতে হয় এবং গাত্র ভঙ্গ প্রভৃতি বাহ্যিক ও আন্তরিক যাতনা সহ্য করিতে হয় তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন; পরে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে সে যাতনাতে মৃত্যু-প্রায় হইতে হয়। এমন কি কেহ কেহ ঐ সময়ে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর ভূমিষ্ঠ বালকের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয়; অর্থাৎ বালকের বিষ্ঠা মূত্রাদি পরিত্যাগ করান; এবং সময়ে সময়ে ঐ বালকের নিমিত্ত আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া থাকেন। পিতা স্নেহ-বশতঃ বহু কষ্টে ঐ পুত্রের নানা প্রকার আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রদান; এবং যথা বিধি সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস দ্বারা পরম উপকার করেন; এবং অন্যান্য কত প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া পিতা মাতা পুত্রের মঙ্গল সাধন করেন, তাহা সমুদায় লেখা অসাধ্য। অতএব যাহারা পুত্রাদির নিমিত্ত এতাধিক

কষ্ট ভোগ করেন এবং যথোচিত স্নেহ করেন; তাঁহাদিগের ভক্তি অর্থাৎ ভালবাসার পাত্র, পিতা মাতা ব্যতীত জগতে আর কে হইতে পারে? তাঁহাদিগকে এই রূপে ভক্তি করা আবশ্যক যে, জীবতমানে বাক্য প্রতিপালন, এবং নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট এবং প্রিয়দ্রব্য সাধ্যানুসারে প্রদান, ও যাহাতে তাঁহাদিগের হিতসাধন হয় এমত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য। কোন ক্রমে তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ অথবা যাহাতে তাঁহাদিগের অহিত হয় শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে; বরং তাঁহাদিগের সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে হউক অনুরাগ কবা বিধেয়। স্বভাবতঃ তাহা করিতেও দেখা যায়; এবং তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলেও শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা তৃপ্তি সাধন করা কর্ত্তব্য; এই সকল কার্য্যই ভক্তির চিহ্ন। যদি বল যে, মরণোত্তর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, মরণোত্তর মনুষ্যের যে প্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং তাহা এই তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময়ে শ্রাদ্ধবিধানে দানাদি দ্বারা তাঁহাদিগেব তৃপ্তি সাধন করা অতীব কর্ত্তব্য। কেন না যাঁহারা জীবতমানে পুত্রাদির প্রতি অতি স্নেহ করেন, এবং মৃত্যু হইলে যাঁহাদিগের ত্যাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাঁহাদিগের পারলৌকিক কষ্ট নিবারণ করা যে, নিতান্ত আবশ্যক তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যদি বল যে, পিতা মাতা জীবত্মান থাকন সময়ে তাঁহাদিগকে যে সকল দ্রব্য দেওয়া যায়, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হয়েন। কিন্তু মৃত হইলে তদুদ্দেশে যে দ্রব্যসকল প্রদান করা যায়, তাঁহরা তাহা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব এবং তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকিলে ঐ দ্রব্য তাঁহারা নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন না? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে দানাদি বিফল? তাহাতে ব্যক্তব্য এই যে, পিতা মাতা মুক্তি লাভ করিয়াছেন কি না তাহা জানা যায় না; এজন্য দানাদির আবশ্যক এবং মুক্তি লাভ না করিলেও ঐ সকল দ্রব্যাদি তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন কি না, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন হইবেক কি না, তাহা আপাততঃ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। কেন না ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে, শ্রাদ্ধাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং শ্রাদ্ধাদির দ্বাবা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে; ঐ কথার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কেন না

যাঁহারা পুত্রাদির জন্য কষ্ট ভোগ করেন; এবং যাঁহাদিগের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থলে তাঁহাদিগের উদ্দেশে দান করা শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। যদি বলা যায় যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে যে দ্রব্য দান করা যায়, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত না হইলে তৃপ্তি সাধন হওয়া সম্ভব নহে? তবে শাস্ত্রে যে তৃপ্তি সাধন হওয়ার কথা লেখা আছে তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, যে সকল দ্রব্য পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করা যায়, তাহা পঞ্চভুতাত্মক; এবং পঞ্চ ভূত সকল পরস্পর যোগ যুক্ত আছে; ও ও আত্মা এবং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ জগদ্ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্র-পাঠ-দ্বারা ঐ শব্দের ও বায়ু এবং সূর্য্য-তেজের আকর্ষণে পিতৃলোকেরা পুত্রাদির শ্রাদ্ধ-কার্য্য জানিতে পারেন; এবং দ্রব্যাদিব সার-ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। যেরূপ বিদ্যুত্তীয় যন্ত্রের* দ্বারা বহুতর তার সংযুক্ত থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্যান্য দৃশ্য বস্তু সকল তাহার প্রতিবন্ধক করিতে পারে না; তদ্রূপ মন্ত্রের† শব্দ সহযোগ হইয়া, এবং শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার আত্মার সহিত পিতৃলোকের আত্মার যোগ থাকায়, আত্ম-মনঃ সংযোগে ধ্যান দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পিতৃলোকেরা সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন; এবং দ্রব্যাদির সূক্ষ্ম সার ভাগ তথায় যাইতে পারে; অথবা তাঁহারা মন্ত্রের আকর্ষণে সূক্ষ্মরূপে আসিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। যদি পিতৃলোকেরা অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন; তথায় শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সার ভাগ দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য দান করা যায়, তাহার সার-ভাগ অলক্ষিত ভাবে অর্থাৎ লোকের দর্শনাভাবে পিতৃলোক যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহার আহারীয় দ্রব্যের সহিত সংলগ্ন হয়; এবং তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। ফলিতার্থে মনুষ্যেরা প্রাত্যহিক যে আহার করেন তাহাতে কোন কোন সময় একটী শাকান্ন ভোজনেও যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্ব জন্মের পুত্রাদির

---

* টেলিগ্রাফ্।

† বিধি পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করায় ঐ মন্ত্রের গুণ দ্রব্যগুণ বিবেচনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ বাক্য দ্বারা বশীভূত বা বৈরতা হইয়া থাকে, ইহা দ্রব্য-গুণের ন্যায় গুণ বলিতে হইবেক।

কৃত শ্রাদ্ধ। যদিচ ইহা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধ, এবং বিবেক সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যে পুত্রাদির শ্রাদ্ধ জন্য ঐ তৃপ্তি লাভ হয় তাহা অনুভব করা যাইতেও পারে। এই বিষয় ঋষিরা যোগবলে স্পষ্ট অনুভব করিয়া শাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ দ্বারা যে পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হয় তাহা কখনই মিথ্যা নহে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এক্ষণে কর্ম্ম সকল প্রকৃত প্রস্তাবে না হওয়ায়. এবং লোকের বিবেক শক্তি ও যোগ-বল না থাকায় জানা যায় না; পুরাণাদিতে আছে যে, পূর্ব্বে দেবতারা ও পিতৃলোক আরাধিত হইলে তাঁহারা প্রত্যক্ষ হইয়া বর প্রদান করিতেন। ভীষ্মদেব পিতৃবর প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছা মৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন* অতএব পিতা প্রভৃতির মৃত্যুর পর হইতে যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পূবগ পিণ্ড প্রদান; তদনন্তর আদ্য শ্রাদ্ধ ও মাসিক সপিণ্ডীকরণ এবং একোদ্দিষ্ট ও প্রতি মাসে অমাবস্যার পার্ব্বণ এবং পিতৃষোড়শী ও মাতৃষোড়শী এবং নবান্ন ও নবোদক শ্রাদ্ধ এবং নব-যব-শ্রাদ্ধ, শাকাষ্টকা, পূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং গয়াশ্রাদ্ধ ও তীর্থশ্রাদ্ধ ও শুভকর্ম্মে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার শ্রাদ্ধের বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা সময় মত করা অতীব কর্ত্তব্য; ইহা অকরণে প্রত্যবায় হয়; এবং প্রাত্যহিক তর্পণ ও পিতৃ উদ্দেশে জল দান করাও প্রয়োজন। নতুবা পাপভাগী হইতে হয়। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে, শ্রাদ্ধে ও দেবপূজায় কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন; এবং দ্রব্যাদি ব্যতীত কেবল স্তবের দ্বারা শ্রাদ্ধাদি সিদ্ধি হয় কি না।

* মহাভারতে ও অন্যান্য শাস্ত্রেও ইহার অনেক উদাহরণ আছে। ইহা অসম্ভব নহে কেন না ঈশ্বরের কার্য্য সকলই সম্ভব।

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রাদ্ধ ও দেবপূজার দ্রব্যাদির নিয়ম, ও স্তবের ফল কি, তাহার নির্ণয়।

প্রথমতঃ শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, যে সকল বৈধ দ্রব্য আমরা নিত্য পান ভোজন করি; এবং ভালবাসি তাহা আমাদিগের ভক্তির পাত্রকে দান করা অতীব কর্ত্তব্য। এবং পুষ্প চন্দন ধূপ প্রভৃতি মনোহর সুগন্ধি দ্রব্য প্রদান করা, ও নানা দ্রব্য মিশ্রিত পিণ্ডদান করাও কর্ত্তব্য*। বিশেষতঃ পিতা মাতা প্রভৃতি যে বর্ণের অথবা যে জাতির লোক হউন তদনুসারে তাঁহার বৈধ পান ভোজনীয় এবং ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রদান করাও বিধেয়। এই সকল কারণে ষোড়শ দান ও নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করা হইয়া থাকে; ইহাতে বিত্ত শাঠ্য † করা উচিত নহে। আর পিতৃলোকের স্তব করা, যে শাস্ত্রে বিধি হইয়াছে তাহা করাও কর্ত্তব্য; কিন্তু ধন সত্ত্বে কেবল স্তব করিলে কিছুই ফল হয় না। কেননা ক্ষুধার যাতনা বচনে নিবৃত্তি করা হইতে পারে না। অতএব যেরূপ সঙ্গতি থাকে তদনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধে দ্রব্যাদি দান করা বিধেয়। তবে সঙ্গতি না থাকিলে ক্রমে ফল মূল গন্ধ পুষ্প জল ও স্তব দ্বারা অর্চ্চনা সিদ্ধি হইতে পারে। কারণ স্তব অতি উৎকৃষ্ট বিষয়; যে হেতু সামান্য মনুষ্য যখন স্তবের দ্বারা তুষ্ট হয়, তখন দেবতা ও পিতৃদেবতা যে স্তবে তুষ্ট হইবেন ইহার সন্দেহ কি? ‡ পরন্তু শ্রাদ্ধাদিতে শ্রেষ্ঠ-বর্ণ ব্রাহ্মণ-দিগকে ও সজাতীয় ও সবর্ণ লোককে ভোজন করান আবশ্যক, ইহাতেও পিতৃলোকের

---

* মধুকৈটব অসুরের মাংসে মেদিনী হওযায় মৃত্তিকাতে পিণ্ডদান হয় না. কুশ ও দুর্ব্বার উপর অমৃতভাণ্ড স্থাপিত হওয়ায় কুশের উপর পিণ্ডদান বিধি হইয়াছে।

† বিত্ত শাঠ্য ধন সত্ত্বে কৃপণতা।

‡ রামায়ণে আছে যে. এককালীন সঙ্গতি অভাবে কেবল স্তব দ্বারা শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা হয়।

তৃপ্তি সাধন হইতে পারে; কেননা ভোজন দ্বারা সকলেরই তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে; ইহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হওয়ারও সম্ভব। ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র, জটায়ু পক্ষীর নিমিত্তে পক্ষী-গণকে মাংস ভোজন করাইয়া তাহার তৃপ্তি-সাধন করিয়াছিলেন। এই কারণে সজাতীয় লোককে উপযুক্ত পান ভোজন করান নিতান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার তাৎপর্য্য বিবেচনা করিলে জানা যায় যে, যে জাতির ও যে বর্ণের যাহা ভক্ষ্য তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদি করা বিধি সিদ্ধ বটে; তবে অধম বর্ণের শ্রাদ্ধে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেওয়া যাইবে না এরূপ বিধি হয় নাই। যেরূপ পিতৃশ্রাদ্ধে দ্রব্যাদি দানের বিধি হইয়াছে; তদ্রূপ দেব পূজাতেও বিধি আছে। কেননা যে সকল পুষ্প চন্দনাদি এবং নূতন দ্রব্য ও ফল জল ও অন্ন প্রভৃতি পিতৃ লোকের অর্চ্চনাতে দিতে হয় তৎ সমুদায় দেব পূজাতেও দেওয়ার বিধি হইয়াছে। অতএব এই সকল কার্য্য দ্বারা ভক্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দেব-যজ্ঞ ও পিতৃশ্রাদ্ধ দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা হয়। যদিচ স্বতন্ত্র রূপে ঈশ্বর আরাধনার নিয়ম আছে। কিন্তু শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা তাহার প্রধান অঙ্গ। ফলিতার্থে অন্য কামনা রহিত হইয়া ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে তাহা কেবল ঈশ্বর আরাধনায় পর্য্যাপ্ত হয়। আর ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক দেব-পূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধ যাহা করা যায় তাহার ফল দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত যে হইয়া থাকে তাহাও ঈশ্বর আরাধনা, যেহেতু তিনি সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর। এই বিষয় মোক্ষ প্রকরণে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে, দেবযজ্ঞে ও পিতৃশ্রাদ্ধে যে পশু হিংসার বিধি হইয়াছে ইহার কারণ কি?

সপ্তদশ অধ্যায়।

যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার কারণ নির্ণয়।

বেদে আছে' যে, মনুষ্যেরা প্রাণী হিংসা করিবেন না।* ইহা মাংস ভোজী পশুপক্ষীদিগের প্রতি নহে। যে হেতু ঈশ্বর তাহাদিগের মাংসের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের নিয়ম করিয়াছেন। এজন্য উপরি উক্ত বিধি মনুষ্যের প্রতি হইয়াছে। কেননা মনুষ্যেরা বুদ্ধিমান্ প্রযুক্ত তাহারা হিংসা করিলে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তু নষ্ট করিয়া ফেলিবেক বলিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। বেদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, বায়ুব পূজা শ্বেত ছাগল দ্বারা, এবং পশুর দ্বাবা রুদ্রের পূজা, অগ্নি সোমীয় যাগ পশু দ্বারা করিবেক † এবং পশু মাংস দ্বারা যজ্ঞ ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেক‡ ইহাতে কিছু বিরোধ দেখা যায় বটে; কিন্তু ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞাদির জন্য যে হিংসা তাহা অহিংসা ইহা মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির গ্রন্থে লেখা আছে। অতএব বিধিপূর্ব্বক হিংসা ব্যতীত অন্য হিংসা কবিবেক না। তাৎপর্য্য এই যে, মাংস সুস্বাদু বস্তু বিবেচনায় মনুষ্যেবা অকারণে পশু সকল ভক্ষণ করিয়া এককালীন বিনাশ করিবেক বিবেচনায় মনুষ্যের প্রবৃত্তির সার্থক্য হয় অথচ পশু-দিগের উদ্ধার হয়, এবং সৃষ্টিকার্য্য সুচারু রূপে চলিতে পারে বিবেচনায় ঈশ্বর নিয়ম করিয়াছেন যে, যজ্ঞের জন্য বিধিপূর্ব্বক যে পশু বিনষ্ট করা যাইবেক, তাহাতে পাপভাগী হইবেক না।§ যজ্ঞ শব্দে দেব-যজ্ঞ, ও পিতৃযজ্ঞ। ঐ যজ্ঞে যে সকল পশু ও পক্ষী এবং জলচর বিনষ্ট হইবেক, তাহারা স্বর্গে গমন করিবেক। এবং পশুযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হই-

* মা হিংসাৎ সর্ব্বা ভূতানি।

† বায়ব্যাং শ্বেত ছাগল মালভেত। পশুনা রুদ্রং যজেত। অগ্নি সোমীয় পশু মালভেত ইতি বেদ।

‡ মনুতে বিধি আছে।

§ মনুব পঞ্চম অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকে।

বেক। ও যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক পশু পক্ষী দ্বারা যজ্ঞাদি কার্য্য করে, সে এবং পশু প্রভৃতিরা স্বর্গে গমন করে। ইহা পশু উৎসর্গের মন্ত্রে প্রকাশ আছে; ইহাতে যজ্ঞাদি সাধনের জন্য দানকর্ত্তা ও পশু উভয়েরই উপকার বিবেচনায় এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হওয়াই শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ। যদি বল যে, স্ত্রীপশু যজ্ঞে গ্রাহ্য না হওয়ার কারণ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, স্ত্রীপশু হিংসা হইলে পশু সম্বন্ধীয় প্রজা বিনষ্ট হয়। কেননা প্রজা বৃদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রীজাতির অধিক আবশ্যক; যথা একজন পুরুষ একশত স্ত্রীতে অধিক প্রজা বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু একটী স্ত্রী ও একশত পুরুষে তাদৃশ পরিমাণে প্রজা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভব নহে। তজ্জন্য স্ত্রীর অধিক আবশ্যক বিধায় স্ত্রী পশুর হিংসা নিষেধ হইয়াছে। এইরূপ মনুষ্য বিষয়ে বৈধ হিংসার বিধি আছে যে, যুদ্ধে যাহারা হিংসা করে, তাহারা এবং যাহারা প্রাণত্যাগ করে তাহারা উভয়েই পাপী হয় না, বরং যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের যুদ্ধের বিধি নাই। পূর্ব্বে নরমেধ ও গোমেধ যজ্ঞের বিধি ছিল; তাহা এক্ষণে শাস্ত্র দ্বারা রহিত হইয়াছে; কারণ তদুপযোগী মন্ত্র পাঠ এবং দ্রব্যাদি সকল প্রাপ্ত না হওয়ায় অঙ্গ হীন প্রযুক্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না; বরং অবৈধ হিংসা জন্য পাপ-ভাগী হইতে হয়। আর প্রাণী হত্যাকারী পাপী-দিগের প্রাণ নাশ করা বিধি আছে; ইহাতেও পাপ নাই, বরং হত্যারূপ-পাপ-কার্য্য নিবারণ হয়। বিশেষতঃ রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি নিষ্পাপ হইতে পারে* এতাবতায় বিধিপূর্ব্বক হিংসায় পাপ নাই। কেবল অবৈধ হিংসায় পাপ থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রকাশ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, সাত্ত্বিকী কর্ম্মে হিংসা নিষেধ হইয়াছে; তাহা শাস্ত্র সঙ্গত নহে; কারণ সাত্ত্বিকী রাজসিকী কর্ম্মের প্রভেদ এই যে, ফলাভিসন্ধান ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই সাত্ত্বিকী। এবং ফল কামনায় যে কর্ম্ম করা যায় তাহা রাজসিকী। তাহাতে স্বর্গাদি কামনা করিয়া যজ্ঞে যে হিংসা করা যায়, তাহা

---

* মনু ৮ম অধ্যায়ের ৩১৮ শ্লোকে বিধি আছে। কিন্তু যদি স্বয়ং অপরাধ স্বীকার করিয়া দণ্ড প্রাপ্ত হয় তবে।

রাজসী; এবং ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞে যে হিংসা করা যায়, তাহা সাত্ত্বিকী। তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গ কামনায় অশ্বমেধ যাগ করা, ও ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত অশ্বমেধ যাগ করা উভয়বিধি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এ স্থলে উভয় যজ্ঞেই অশ্ব পশু বিনাশ ব্যতীত যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না; এবং দেবী পূজা প্রভৃতিতে পশু বলিদান প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহাতে সাত্ত্বিকী রাজসিকী ভেদ নাই। কেবল দুর্গোৎসবে নিরামিষ ও সামিষ নৈবিদ্য সাত্ত্বিক রাজসিক ভেদের কারণ হইয়াছে*। বরং বলিদান ব্যতীত প্রধান অঙ্গের হানী হইতে পারে; তজ্জন্য শক্ত পক্ষে তাহার অনুকল্পও বিধেয় নহে। তবে যাহারা ফল কামনা করে না, তাহাদিগের অঙ্গ হানী হইলেও ক্ষতি নাই; এই বিবেচনায় কেহ কেহ বলিদান করেন না। ও কেহ কেহ কুলাচার না থাকা বলিয়াই বলিদানে ক্ষান্ত থাকেন। ফলিতার্থে বলিদানে দোষ নাই; ও তাহাতে সাত্ত্বিকী কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না; এবং শাস্ত্রেও নিষেধ হয় নাই; এ বিষয় মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত মহাশয় দুর্গোৎসব তত্ত্বের বলিদান প্রকরণে বিশেষ বিচার করিয়া লিখিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক সভ্য মহাশয়েরা কেহ কেহ অকারণে পশু বধ করিয়া ভক্ষণ করেন, অথচ বলিদান করণ সময়ে পশু হিংসা বড় দূষ্য ও নিষ্ঠুরের কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে, কোন্ প্রকার পশু পক্ষী ও জলচর বলিদান, ও যজ্ঞের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত; তাহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে বহুতর পশু পক্ষী ইত্যাদি যজ্ঞ সাধনের নিমিত্ত বিধি নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহার প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মন্ত্র ও স্বতন্ত্র প্রকরণ ছিল। এক্ষণে তৎসমুদায় প্রায় লোপ হওয়াতে কেবল ছাগ পশু ও মেষ এবং মহিষ বলিদানের বিধি প্রচলিত আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পশু যাগাদি কর্ম্ম না হওয়াতে অন্য পশু-হিংসা কেবল অবৈধ হিংসা হইয়া পড়ে। এজন্য অন্য পশু বলিদান করা কর্ত্তব্য নহে†। তবে কতক-

* সাত্ত্বিকী কর্ম্মে বলিদান ও নিরামিষ নৈবেদ্য, রাজসীতে বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য, দুর্গোৎসব তত্ত্বে লিখিত আছে। ঐ বচনের তাৎপর্য্য দ্বারা নির্ণয় হইবেক।

† তন্ত্র শাস্ত্রে অভিচারাদি কার্য্যের নিমিত্ত নানা প্রকার বলিদানের বিধি আছে তাহা অন্য কার্য্যে নহে।

গুলি পশু পক্ষী ও জলচর ভক্ষ্য ও কতকগুলি ভক্ষ্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতে জীবের অভক্ষ্য কিছুই নাই; কেবল সাত্ত্বিকী ও রাজসিকী ও তামসিকী প্রবৃত্তিযুক্ত হওয়াতে ঐ ঐ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সকল দেশ ভেদ ও ব্যক্তি ভেদে এবং জাতি ও বর্ণ ভেদে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ হইয়াছে। এ বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় তাহা আর লেখা গেল না। পূর্ব্বাপর প্রচলিত আচার যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত, তদ্দৃষ্টে জানা যাইবেক যে, যে জাতির ও ব্যক্তির যে যে দ্রব্য ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য তাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়মের সহিত ঐক্য আছে; অর্থাৎ যাহার যাহা ভক্ষ্য নহে, তাহা ভক্ষণে অধর্ম্ম, এবং ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণে অধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করাই শ্রেয়; অভক্ষ্য ভক্ষণ করা উচিত নহে; ইহাতে ইহকালে পীড়া হয় না ও পরকালেও দোষ থাকে না। এই সকল কারণে বিবেচনা করা যাউক যে, নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত থাকায়, ধর্ম্মাচরণের কোন নিয়ম আছে অথবা যথেচ্ছা রূপ ধর্ম্মাচরণ করা যাইতে পারে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত মধ্যে কি প্রকার ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য, তাহার নির্ণয় ও স্বেচ্ছাচার অনৌচিত্য।

ভগবদ্গীতার ১৬ অধ্যায় ২৪ শ্লোকে আছে যে, যিনি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার রূপে চলেন, তাঁহার ইহকালেও সুখ নাই এবং পরকালেও সদ্গতি লাভ হয় না। এবং স্বধর্ম্মে নিধন হওয়াও ভাল, তত্রাপি পরধর্ম্ম ভয়াবহ প্রযুক্ত তাহা আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই বিধি সকল দেশের ও সকল লোকের এবং সমুদায় বর্ণের ও জাতির উপকার-জনক; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরকালের এবং ইহকালের উপকার ও অপকার-জনক। পরকাল যে আছে, তাহা পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে*। যদ্যপি

* এই ভাগের ৩য় অধ্যায় দৃষ্ট কর।

ক্ষমা ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়, সংযমন, অহিংসা, সত্য, দান ও অচৌর্য্য এবং প্রতিষ্ঠা ও পরোপকার, এই ধর্ম্ম সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত আছে। কিন্তু পান, ভোজন, বিবাহাদি সংস্কার ও দেবপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, ব্রতোপবাসাদি এবং ঈশ্বরের উপাসনা সর্ব্বত্র একরূপ নহে, তাহা পৃথক্-পৃথক্-রূপে চলিতেছে। ইহার কারণ অনন্ত শক্তিমান্ ও অনন্ত কীর্ত্তিমান্ পরমেশ্বর অনন্ত কার্য্য সাধনের জন্য নানাপ্রকার ধর্ম্মাচরণের নিয়ম করিয়াছেন; কিন্তু যে জাতির ও যে দেশের এবং ব্যক্তি ভেদের যে পান ভোজনাদি ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই স্বধর্ম্ম; ও তাহার ব্যতিক্রম আচরণ করিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়; এবং তাহাতে পাপ জন্মে। যদিচ ঈশ্বর এক বস্তু এবং তাঁহাকে যে ব্যক্তি যে ভাবে উপাসনা করে, তাহা ভক্তি সহকারে করিলে সকলই তাঁহার তুষ্টিজনক হয় বটে; কিন্তু উপাসনার পথ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা স্বধর্ম্মাচরণে থাকিয়া করিতে হয়। যেরূপ নানা পথগামী নদ নদী সকল সমুদ্রে গমন করে, অথচ তাহাদিগের পথ সকল পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে, তাহারা স্ব স্ব পথে অতি শীঘ্র গমন করিতে পারে; তদ্রূপ স্বধর্ম্মাচরণে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে অতি শীঘ্র মুক্তি লাভের সম্ভাবনা হয়। যদি বল যে, সকল ধর্ম্মাচরণে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিলে, যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাচরণ করুক না কেন, তাহাতেই মুক্তি ফল লাভ করিতে পারিবেক; তবে স্বধর্ম্ম ও বিধর্ম্মের আচরণে প্রভেদ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। কেননা স্বধর্ম্ম ভাল নহে, পরধর্ম্ম বিশ্বাস্য; এই উদ্দেশেই লোক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে ধর্ম্ম বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহাই আচরণ করে; সুতরাং পবিত্র বস্তু যে ধর্ম্ম, তাহার নিন্দা করা হইল। পরন্তু স্বধর্ম্ম ভাল নহে, পরধর্ম্ম ভাল, এ কথা মুখে উচ্চারণ না করিলেও কার্য্যতঃ তাহাই ঘটনা হইয়া পড়ে। অতএব স্বধর্ম্মই হউক বা পর ধর্ম্মই হউক, ধর্ম্ম নিন্দা করা মহাপাপের কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। কেননা রাজনিয়ম সকল মুখে নিন্দা না করিয়াও যদি কেহ ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করে, তবে কি সে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না? অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। তদ্রূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও পরধর্ম্মাচরণ অতিশয় ভয়াবহ তাহারও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় বস্তু, তাঁহার

উপাসনার দ্বারা ফললাভ চেষ্টা করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণে থাকিয়া মনঃ-সংযোগ দ্বারা উপাসনা করিতে হয়, তাহাতে বহুদিন উপাসনা না করিলে তাঁহার তুষ্টি জন্মাইতে পারা যায় না; বরং ধর্ম্মাচরণের প্রতি অগ্রে দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে উপাসনার পথ নির্ণয় হয় না। কেননা কি প্রকার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হইবেক, এবং তাহার শরীর রক্ষার্থে পান ভোজন কি রূপ করিতে হয় ও উপাসনার দ্রব্যাদিই বা কিরূপ আবশ্যক ইত্যাদি নানাপ্রকার বিষয় নির্ণয় করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক শুচি থাকিয়া উপাসনা করিতে হয়; নতুবা কিছুই হইতে পারে না* তাহাতে যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মাচরণ করে তাহার সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তৃপ্তি সাধন হয় না। কেননা ধর্ম্মের প্রতি তাহার বিশ্বাসের অভাব হেতু আর একটী অন্য ধর্ম্মে যাইতে হয়; তাহাতেও কোন্ ধর্ম্ম ভাল তাহা সে নির্ণয় করিতে পারে না; তাহার চিরকাল ভাল ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিতেই কাল গত হয়: তাহার ঈশ্বরের উপাসনা করা না ঘটিয়া কেবল সেই জন্ম বিফল হইতে থাকে; কখনই কোন ধর্ম্মে আস্থা জন্মে না, এবং ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা না জন্মিলেও ভক্তি হয় না, ও ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের উপাসনা বিফল হইয়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তি বহুদিন একস্থানে বাস করিলে তথাকার প্রতিবাসী লোকদিগের সহিত যেরূপ প্রণয় হয়, প্রত্যহ নূতন নূতন গ্রামে বাস করিলে তথাকার লোকের সহিত তদ্রূপ প্রণয় হয় না। এবং অল্প কলহে বৈরতা ঘটে। তদ্রূপ পূর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্মাচরণেও ঘটিয়া থাকে। যেমন পীড়িত ব্যক্তি একটী ঔষধ দীর্ঘ-কাল সেবন না করিয়া প্রত্যহ নূতন ঔষধ সেবন করিলে কোনক্রমে রোগ শান্তি হয় না, তদ্রূপ ভব-রোগ শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মগ্রহণে ঐ রোগ শান্তি হইতে পারে না; বরং বৃদ্ধি হইতে থাকে। আরও দেখা যাউক যে, জীবন অতি অনিত্য ও অচিরস্থায়ী, অথচ ঈশ্বরের আরাধনার দ্বারা শান্তিলাভ করাও নিতান্ত আবশ্যক; এমতাবস্থায় স্বধর্ম্মে থাকিয়া যেরূপ অতি শীঘ্র শান্তিলাভ হইতে পারে, তদ্রূপ পরধর্ম্মের দ্বারা হইতে পারে না। কারণ পূর্ব্ব পুরুষের এবং সমধর্ম্মাবলম্বী ও সুবর্ণ প্রতিবাসীদিগের আচরণ দৃষ্টে স্ব-ধর্ম্ম কি, তাহা

* এই মত সুর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে।

এক প্রকার অভ্যাস হইয়া যায়, প্রায় শাস্ত্র দেখিবার অধিক প্রযোজন থাকে না। কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ঐ ধর্ম্মের মর্ম্ম কি ও তাহার শাস্ত্র এবং ব্যবহার জানিতে ও শিক্ষা করিতে (তদ্ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ হয় না) অধিককাল সাপেক্ষ হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে অনিত্য জীবন শীঘ্র ধ্বংস হইলে কিছুই হয় না, কেবল স্বধর্ম্ম ত্যাগ মাত্র ঘটনা হইয়া পরিণামে নরকভোগ করিতে হয়। আরো দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পবিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় বা বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাতেও তদ্দেশবাসী ভদ্র সমাজের লোকেরা তাহার সহিত একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক পান ভোজন ও বিবাহাদি কার্য্য করেন না; এবং সময়ে সময়ে ঘৃণা: প্রদর্শন করেন; এমতাবস্থায় ইহকালেও যাতনা ভোগ করিতে হয়; অতএব স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তবে যদি কোন ব্যক্তির দৃঢ় প্রারব্ধ বশতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ হইয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করা ঘটিযা উঠে; তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, তিনি তদ্ধর্ম্মে থাকিয়াই ঈশ্বরেব আবাধনা করেন; তাহার আর অন্য ধর্ম্মেব আচরণে কিম্বা পুনরায় পূর্ব্বধর্ম্মে আসিবার চেষ্টা করা অথবা পূর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী অন্য ব্যক্তিদিগের সহিত পান ভোজনাদি কবিয়া তাহাদিগকে দূষিত ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করা উচিত নহে; তাহাতে সমধিক পাপ ঘটনা হয়। আমাদিগের শাস্ত্র মতে কোন ব্যক্তিকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইলে মহা-পাপ জন্মে। কিন্তু বিদেশীয় ও বিজাতীয় লোক সমাজের মধ্যে ইহার বিপরীত প্রথা প্রচলিত থাকা দেখা যায়। অর্থাৎ তাহাদিগের ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি দিগকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া নিজ ধর্ম্মে লইতে চেষ্টা করেন। ইহাতে বিবেচনা হয় যে, সনাতন বৈদিক আচার-সঙ্গত হিন্দু ধর্ম্মই আদি; এবং তদ্ভিন্ন সকল ধর্ম্মই আধুনিক; কেননা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অধিক লোক পূর্ব্ব হইতে থাকায় তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোককে হিন্দু ধর্ম্মে লইতে চেষ্টা করেন না; এবং তাহা লইবার বিধিও শাস্ত্রে নাই। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুদিগকে নিজ ধর্ম্মে লইয়া লোক শ্রেণি অর্থাৎ অদ্যাপি সমাজ বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন; এবং তাহাতে তাহাদিগের মতে দোষ হইতেছে না। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম যে, আদি তাহার আর সন্দেহ নাই*। যদি বল যে, একজাতীয়দিগের

* এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ১০ ও ১২ অধ্যায় দৃষ্ট কর।

মধ্যে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত; অর্থাৎ হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি; এবং প্রতিমা পূজা, ঘটস্থাপন ইত্যাদি নানা প্রকার প্রচলিত থাকায় কর্ত্তব্য কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, স্ব স্ব কুলাচার অনুসারে যে ধর্ম্মাচরণ হইয়া আসিতেছে, তাহাই আচরণ করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারতে আছে মহাজনগণ যে ধর্ম্মাচবণ করিয়াছেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহার সহিত মনুর ৪ র্থ অধ্যায়ের ১৩৮ শ্লোকে* ঐক্য করিলে মহাজন শব্দে পিতৃপিতামহাদি বুঝায়; কেননা ঐ শ্লোকে আছে যে, বহুবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রচলিত থাকাতে পিতা ও পিতামহগণ যে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, লোকের তাহাই করা কর্ত্তব্য; এবং তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। অতএব পিতৃ পিতামহ ব্যতীত মহাজন অন্য ব্যক্তির পথাবলম্বন করা উচিত নহে। কারণ ধর্ম্মাচরণকারী মহাত্মারা সকলেই মহাজন; কেহ ন্যূন নহেন; তবে তাহার মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিবেক ইহার সংশয় ছেদ হয় না। বিশেষতঃ মহাভারতের বচনেরা† প্রকৃত অর্থ করিলে এই সিদ্ধান্তই হইতে পারে। পরন্তু পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির ব্যবস্থা বলবতী; কেননা স্মৃতিই ব্যবস্থাশাস্ত্র; তাহার সহিত পুরাণের ঐক্য রূপে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। যদি বল যে, মনুর বচনে পিতা ও পিতামহাদির পথাবলম্বন করিতে বলাব কারণ কি? তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পিতা যদি হঠাৎ বিজাতীয় বর্ম্মাচরণ করেন অথবা তাহার মৃত্যু হইলে তৎ পুত্রাদিরা বালক থাকা প্রযুক্ত তাহাব প্রকৃত ধর্ম্ম কি ছিল, তাহা যদি জানিতে না পারে, তবে পিতামহাদি বংশ পরম্পরায় ক্রমাগত প্রচলিত ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য; তাহা জানিতে না পারিলেও অগত্যা মাতামহাদির ধর্ম্মাচরণ করা উচিত; নতুবা ধর্ম্মের নিষ্ঠা থাকে না। এইরূপ পিতৃ পিতামহাদির ধর্ম্মাচরণ করা অতি সহজ, কেননা এই ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে প্রায় নিয়ম কিছু শিক্ষা করিতে হয় না;

---

* যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে ॥ মনুর চতুর্থ অধ্যায় ১৭৮ শ্লোক।

† বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা, ইতি মহাভারতে বনপর্ব্বে।

কারণ বাল্যকাল হইতে একরূপ বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া থাকে। তবে দুর্ভাগ্য-বশতঃ যাহার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকে, সে ব্যক্তি কেবল কুতর্কের বশ-বর্ত্তী হইয়া অসঙ্গত ছিদ্রান্বেষণ করে। এবং কেহ কেহ বলেন যে, পিতা যদি দস্যু থাকেন, তবে পুত্র কি দস্যু হইবেক? এই তর্ক অতি অকিঞ্চিৎ, কেননা এই বিষয় এইরূপ মীমাংসা হইতেছে যে, কেবল নানা প্রকার শাস্ত্রের দ্বারা ধর্ম্মের নানা প্রকার পথ থাকাতে পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম আচরণ করিবেক; যাহা শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম নহে, তাহা আচরণ করিবেক না; কিন্তু দস্যুতা কোন দেশেরই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এবং পিতা কোন কারণ বশতঃ কোন সময়ে শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাও পুত্রাদির বৈধরূপে প্রতিপালন করিতে হয় না। যেমন এক গৃহস্থের বাটীতে একটী দুষ্ট বিড়াল ছিল, শ্রাদ্ধের সময়ে দ্রব্যাদি ভক্ষণ করে বলিয়া তাহাকে বান্ধিয়া রাখিত; ইহা কোন শাস্ত্র সঙ্গত নহে; অতএব পুত্রেরা শ্রাদ্ধ করণ সময়ে, পিতার অনুকরণরূপ যেন একটী বিড়াল বান্ধিয়া না রাখেন। অর্থাৎ তাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে। তবে পিতা পিতামহ যদি শাক্ত অথবা শৈব বা বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্ম্মাবলম্বী থাকেন; তবে পুত্রাদির তাহাই হওয়া উচিত; এবং তাহারা হিন্দু হইলে পুত্রাদিরা তাহাই হইবেক। যদি বংশে বলিদানের প্রথা না থাকে, তবে তাহা করা উচিত নহে। এবং বৈধপান ভোজন পূর্ব্বানুরূপ করা উচিত। ইত্যাদি বহুতর বিষয় আছে তৎ সমুদায় বিবেচনা করিয়া পিতৃ পিতামহাদির কুলাচারোচিত ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য; স্বেচ্ছামতে চলা উচিত নহে; তাহাই সিদ্ধান্ত হইল। এক্ষণে স্ত্রীলোকের কোন বিশেষ ধর্ম্ম আছে কি না, তাহা আলোচনা করা যাউক।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের ও বালকের ধর্ম্ম কি, তাহা নির্ণয়।

যে দেশীয় ও যে জাতীয় পুরুষের যে প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, স্ত্রীলোকেরও তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে স্ত্রীলোকের একটী বিশেষ ধর্ম্ম নিরূপণ হইয়াছে অর্থাৎ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম। তাহাতে স্ত্রীলোক পতিপরায়ণা হইলে তাহাদিগের অন্য কোন ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন নাই*। এবং যাহাতে রাজ দণ্ড হইতে পাবে, সেইরূপ অধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যতীত অন্য অধর্ম্ম কর্ম্মও কিছু নাই। যদ্যপি পতিব্রতাদিগের রাজ-দণ্ডোচিত অধর্ম্ম কর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু প্রাবব্ধ বশতঃ ঘটনা হইতেও পারে; এজন্য ঐ কার্য্য বর্জ্জিত আছে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অন্তর্গত ক্ষমা, ধৈর্য্য, দয়া, সত্য ও অহিংসা প্রভৃতি সকল ধর্ম্মই আছে; অর্থাৎ ইহা তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের ন্যায় হইয়া পড়ে। যদি বল যে, স্ত্রীলোকের প্রধানতঃ এই একটী বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইবার কারণ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ উভয় সৃষ্টি করিয়াছেন বটে; কিন্তু তন্মধ্যে স্ত্রীকেই শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। কেননা জগৎ কার্য্যে যাহারা অধিক কষ্ট সহ্য করে ও অধিক শক্তি ধারণ করে, যাহাদিগের ক্ষমা, ধৈর্য্য, ও দয়া অধিক তাহারাই শ্রেষ্ঠ। তাহাতে স্ত্রীলোকের ঐ সকল গুণ সমধিক থাকাতে তাহারাই শ্রেষ্ঠা। বিশেষতঃ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে যে সন্তান হয়, তাহাতে পুরুষ সুখ সম্ভোগে তৃপ্তি লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন; স্ত্রী-লোকের দশম মাস পর্য্যন্ত সন্তানটীকে উদর মধ্যে ধারণের কষ্ট সহ্য করিতে হয়। যাহা কদাপি পুরুষের দ্বারা হইতে পারে না। যদ্যপি শিক্ষাচরিত কর্ম্ম সকলেরই সমান হইতে পারে; কেননা শ্রম সহকারে যে যাহা শিক্ষা করে, অথবা অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ তুল্যরূপে কার্য্য

* মনু ৩য় অধ্যায় ১৫৫ হইতে ১৬২ শ্লোকে স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

সাধন করিতে পারে।" কিন্তু উদরে সন্তান ধারণ রূপ কষ্ট সহ্য কখনই পুরুষের হওয়ার সম্ভব নহে। ইহা স্ত্রীলোকের বিশেষ গুণ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবাতে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবেক। বিশেষতঃ সাধ্বী স্ত্রীলোকের ক্ষমা ধৈর্য্য দয়া সচরাচর পুরুষ অপেক্ষা অধিক দেখা যায়, তাহাতেও তাহারা শ্রেষ্ঠা; তজ্জন্য মনুর ৩য় অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক হইতে ৬২ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, বসন ভূষণ ও ভোক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা স্ত্রীলোক পূজনীয়া; এবং তাহারা পূজিতা না হইলে অমঙ্গল ঘটনা হয়; ও পূজিতা হইলে মঙ্গল সাধন হয়। আরও দেখা যায় যে, যেরূপ এ দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিধি আছে; তদ্রূপ অন্যান্য দেশেও আছে, তাহাদিগের ব্যবহার দৃষ্টে প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে। অতএব এইসকল বিশেষ কারণ যাহা সচরাচর দেখা যায় সেই সকল কারণে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠা; এজন্য তাহার দিগের একটী পাতিব্রাত্য ধর্ম্ম থাকিলেই অন্য কোন ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি স্ত্রীলোক শ্রেষ্ঠা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে এককালীন হীন অপেক্ষাও হীনতরা হইয়া পড়ে। যেমন দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট বস্তু, তাহাতে গোমূত্র মিশ্রিত হইলে তাহা এককালীন নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক নিতান্ত হীনা ও অকর্ম্মণ্যা হইয়া যায়। কেননা ব্যভিচারিণীর ক্ষমা, ধৈর্য্য, দয়ার লেশ মাত্রও থাকে না। তাহারা উপপতির বশবর্ত্তিনী হইয়া সমস্ত গুণে জলাঞ্জলি দিয়া পতি পুত্রের প্রাণবিনষ্ট করণ আদি মহাপাপে লিপ্ত হয়; এবং নরকে বাস করে; ও তাহারা প্রায়ই গর্ভপাত করিয়া থাকে, সেই কষ্ট সহ্য করে না; যদিচ কেহ কেহ গর্ভ ধারণ করিয়া সন্তান রক্ষা করে; কিন্তু ঐ সন্তান বৃথা হইয়া পড়ে। যেহেতু ঐ রূপ পুত্রেরা সকল দেশেই জারজ সন্তান নামে খ্যাত হইয়া জঘন্য ভাবে কালযাপন করে; ও তাহাদিগের শ্রাদ্ধ তর্পনের অধিকার থাকে না; যদি বলা যায় যে, তাহাদিগের কৃত শ্রাদ্ধ, উৎপাদক ব্যক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে? কিন্তু তাহা বলা যায় না; কারণ যে মন্ত্রের প্রভাবে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পিতৃলোকের তৃপ্তিকর হয়, সেই মন্ত্র পাঠ করা জারজ সন্তানের বিধিসিদ্ধ অধিকার না থাকায় ঐ দ্রব্য দান বিফল হইয়া যায়। বিশেষতঃ ধর্ম্মকামনা ব্যতীত অবৈধ সংযোগে পুত্র উৎপন্ন হইলে ঐ মন্ত্রের গুণ প্রকাশ পায় না। যেমন

বিদ্যুতীয় যন্ত্রের সংবাদ প্রেরণ হয়, তাহার বিদ্যুতীয় পদার্থের অভাব হইলে আর সংবাদ চলে না, তদ্রূপ মূল ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিধির অভাবে অশুচি ব্যক্তির মন্ত্রপাঠ কর্ম্মণ্য হয় না; তবে ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে সাধ্বী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন হয়; তাহার মীমাংসা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। অতএব স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে তিনি সর্ব্বপ্রকারে নিকৃষ্টা হয়েন; তাহার সন্দেহ নাই। কেননা যিনি যে গুণে পূজিত, তাহার সেই গুণের অভাব হইলে তাহার সম্ভ্রম থাকে না; তদ্রূপ স্ত্রীলোক কেবল পাতিব্রাত্য ধর্ম্মাচরণে সমধিক মান্যা; তাহার অভাব হইলে আর তাহার সম্ভ্রম থাকে না। এক্ষণে সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ কি তাহা দেখা যাউক। সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ এই যে, বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত পতির সেবা করা; ও পতি ব্যতীত কায়-মনোবাক্যে পর-পুরুষকে পতি ভাব না করা; ও পতি হর্ষ হইলে হর্ষিতা, এবং দুঃখিত হইলে দুঃখিতা; এবং পতি বিদেশ-গামী হইলে সর্ব্বদা মানসে তাহার চিন্তা করা, এবং বাহ্যে ম্রিয়মাণা ও ম্লানবদনা হওয়া, ও পতির মৃত্যু হইলে সহ-গমন, অথবা যোগাবলম্বনে প্রাণ ত্যাগ করা; কিম্বা চির-কাল ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে থাকিয়া পতির পারলৌকিক উপকার করাই সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ। তন্নিমিত্ত অপুত্রা স্ত্রীলোক পতির ধন-ভাগী হইয়া থাকে ও মৃত্যু অন্তে স্বর্গে গমন করে। শাস্ত্রে এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে পতিপরায়ণাদিগের প্রধান গুণ পর-পুরুষ সংসর্গ না করাই হইতেছে। কেননা ঐ কার্য্য ঘটিলে আর আর সকল গুণই বৃথা হইয়া পড়ে। যেমন ছিদ্র কুম্ভে জল থাকে না; তদ্রূপ সকল গুণ অভাব হইয়া পড়ে। পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের অর্থ এই যে, পতিই একমাত্র ব্রত যাহার, সেই পতিব্রতা; তাহার কি প্রকারে পতিসেবা করিতে হয় তাহা লেখা বাহুল্য। অর্থাৎ সাংসারিক অবস্থানুসারে পান ভোজনাদি প্রস্তুত এবং বাক্য প্রতিপালন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন; পতির মৃত্যু হইলেও অব্যভিচারিণীরূপে পতির উপকার করাই উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্ম সমুদায় সভ্য-দেশে ও সভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত আছে।*

* পাতিব্রাত্য-ধর্ম্ম কাশীখণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, তাহা দেখিলে জানা যাইবেক।

তবে কোন কোন দেশে ও জাতিতে স্বামীর মৃত্যু অন্তে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে; তাহা সাংসারিক কার্য্য চলিবার জন্যই হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রসম্মত ঐ স্ত্রীরা পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের ফল পাইতে পারে না; কেননা প্রথমতঃ যাহাকে ধর্ম্মানুসারে পতিত্বে বরণ করা হইয়াছে তাহাতে এক নিষ্ঠা থাকাই ভক্তির কার্য্য; এবং তাহাতেই পরকালে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়; নতুবা ভর্ত্তান্তর করিলে কখনই তাহা হয় না। বিশেষতঃ মনুতে আছে যে, সাধ্বীস্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে না; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রীলোকের ভর্ত্তান্তর হইলে পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের অভাব হইয়া পড়ে। তবে দ্বিতীয়বার বিবাহ হইলে জাতি ও দেশ ভেদে ব্যভিচার দোষ খণ্ডন হয় বটে; তাহা সমাজ সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু পরকালে তাহাতে সদ্গতিলাভ হয় না, যদি বল যে, অসহনীয় কাম যাতনা সহ্য করা দুঃসাধ্য, ইহাতে ভর্ত্তান্তর নিষেধ হইলে সমাজ উচ্ছিন্ন যায় ও শারীরিক কষ্টকর হইয়া থাকে কিন্তু কাম দমন ব্যতীতও পরকালে শুভ হয় না। তজ্জন্য অনেক দেশের স্ত্রী-পুরুষ আদৌ বিবাহ না করিয়া আজন্ম মরণ কাল পর্য্যন্ত কাম যাতনা সহ্য করিয়া থাকে। যদি বল যে, এ দেশীয় শাস্ত্র অনুসারেও পূর্ব্বে বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে নিষেধ হওয়ার বা কারণ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বকালে অক্ষত-যোনি বিধবা স্ত্রীর বিবাহ বিধি প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু তাহাতে তাহার পাতিব্রাত্য ধর্ম্ম রক্ষা হইত না। তবে প্রবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোক যে পতির সহগামিনী হইতে এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে অশক্তা হইত সেই প্রকার অক্ষত যোনি স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার বিবাহ করিত; তাহার কারণ এই যে, ঐ স্ত্রীলোক পতিকে জানিতে এবং সহবাস সুখ অনুভব করিতে ও পতিপরায়ণা হইতে না পারায়; বিশেষতঃ বীর্য্যপাতাদি দোষে দূষিত না হওয়ায়; বালিকা বিধবার পুনর্ভর্তৃগ্রহণের আদেশ ছিল, তাহাও সমাজ সিদ্ধ মাত্র, কিন্তু পরকালের শুভকর ছিল না; এবং যাহাদিগের বীর্য্যপাতাদি সংঘটন হইত, তাহাদিগের পুনর্ব্বিবাহে দ্বিচারিণী দোষ হওয়াতে সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল; অপিচ পুত্রবতী স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই; কেননা যাহার পুত্র অর্থাৎ ভর্ত্তার অংশ বর্ত্তমান থাকে তাহার স্বামীর মৃত্যু হওয়াই গণ্য করা যাইতে পারে না; কেননা আত্মাই পুত্র

রূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ*। তবে অক্ষত-যোনি-বালিকা-বিধবার যে বিবাহের রীতি ছিল, তাহাও কলিযুগে রহিত হইয়াছে। কারণ এই যে, কলিযুগে সাধ্বী স্ত্রী প্রায়শ অভাব হইবেক জানিয়া ঐ রূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কেননা অক্ষতযোনির বিবাহের বিধি চলন থাকিলে ঐ উপলক্ষে পতিসহবাসিনী এবং পুত্রবতী বিধবারা পুনর্ভর্তৃগ্রহণ করিবেক; তাহাতে এককালীন সাধ্বী স্ত্রীর অভাব হইবেক। পরন্তু অধুনা স্ত্রীলোক সকল যে প্রকার স্বাধীন হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, ইহাতেও ক্রমশ সাধ্বী স্ত্রীর অভাব হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা জানিয়া মহাত্মারা বিধবার বিবাহ রহিত করিবার বিধি করিয়া ছিলেন। যদ্যপি বিধবার বিবাহ হইবার সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতানুসারে হিন্দু-সমাজ রাজনিয়ম বিধি-বদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু সাধুসমাজে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয় নাই; তবে কাল সহকারে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না†। যদি বল যে, পুরুষেরা স্ত্রীর মৃত্যুর অন্তে অথবা অন্য স্ত্রী সত্বে বিবাহ করেন কেন? তাহাতে বক্তব্য যে পুরুষের পুত্রের নিতান্ত আবশ্যক বিধায় স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অথবা পুত্র না জন্মিলে স্ত্রী সত্বে ও অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা বিধি সিদ্ধ বটে; কিন্তু কামতঃ অনেক বিবাহ বৈধ নহে; তাহা পরকালে অশুভকর হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। যদি বল যে, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী ইহাঁরা পুরুষান্তর ভজনা করাতেও তাঁহাদিগের নাম স্মরণে পাপ নাশ হয়, ইহার কারণ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, গৌতম-পত্নী অহল্যা সাধ্বী ছিলেন, ইহা রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণে আছে; তাহাতে ইন্দ্র-দেব ছলনা করিয়া গৌতমের বেশ ধারণ করতঃ তাঁহাতে উপগত হয়েন। তজ্জন্য গৌতমের শাপে ইন্দ্রের শাস্তি হইয়াছিল। কিন্তু অহল্যা ইন্দ্রকে কোন শাপ প্রদান না করায় গৌতম তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, অহল্যা পাষাণবৎ হইয়া থাকিবেন। তাহাতে অহল্যার রোদনে তাঁহাকে নিরপরাধিনী জানিয়া ঋষি অনুগ্রহ করতঃ এই রূপে

* আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি বেদ সূত্র। এবং মহাভারতে শকুন্তলার উপাখ্যান দৃষ্ট কর।

† পরাশর সংহিতার বচনের অর্থ দ্বারা যে ভর্ত্তান্তেয়র ব্যবস্থা মীমাংসা হইয়াছে তাহা বাগ্দত্তা কন্যার প্রতিব্যবস্থা বলিয়া অন্যান্য পণ্ডিতেরা যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত।

শাপান্ত করিয়া ছিলেম যে, ভগবান বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের পদস্পর্শে তিনি নিষ্পাপী হইয়া পুনর্ব্বার গৌতমের পত্নীরূপে পরিগৃহীত হইবেন। তজ্জন্য অহল্যা পুনর্ব্বার সাধ্বীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে যে, যদি, স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাতে কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অথবা ছলনা করিয়া তাহাতে উপগত হয়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলে, ও স্বামী তাহাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, তাহার দোষ ক্ষালন হইয়া পুনরায় স্বাধ্বীপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পর পুরুষ আসক্ত হইলে কোন ক্রমেই সাধ্বীপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই কারণে অহল্যা দোষশূন্যা হইয়াছিলেন। দ্রৌপদী স্বর্গ-লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং পাণ্ডবগণ ইন্দ্রের অংশ সম্ভূত দেবতা বিশেষ। জৈমিনি ভারতে আছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রের শরীব নষ্ট হইয়া তাহার এক এক অংশ ধর্ম্ম ও পবন এবং অশ্বিনী-কুমার, এবং ইন্দ্রেব শরীরান্তর হইয়া একাংশ তাহার নিজ শরীরে ছিল। পরে ঐ ঐ দেবতা হইতে পাণ্ডবদিগের* জন্ম হয় তাহাতে তাহাদিগের পঞ্চজনের সহিত দ্রৌপদীর বিধি পূর্ব্বক বিবাহ হইয়াছিল। এবং কপিলার শাপ ও মহাদেবের বর ছিল।† তাহা মহাভারতে ব্যক্ত আছে; এই সকল কারণে দ্রৌপদীর সতীত্ব রহিত হয় নাই। কুন্তী অবিবাহিতা কালে সূর্য্য-দেবের সহিত সংগতা হওয়ায় তাঁহার বরে সতীত্ব রহিত হয় নাই; এবং তৎপরে পূর্ব্ব প্রচলিত শাস্ত্রের মর্ম্ম মতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে পতির আজ্ঞাক্রমে দেবতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার কোন দোষ বর্ত্তে নাই। তারা বানরী, ও মন্দোদরী রাক্ষসী, ইহাঁরা ঈশ্বর রামচন্দ্রের আজ্ঞা ক্রমে দেবরকে ভর্ত্তা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহাদিগের স্মরণ করিলে রামচন্দ্রের স্মরণ হয় বলিয়া পাপ নাশক হইয়াছে। পরন্তু পুরাকালে দেবর দ্বারা সন্তান উৎ-পত্তি করার নিয়ম ছিল। কিন্তু কলির লোক হীনবীর্য্য এবং কামাসক্ত প্রযুক্ত

* কপিলা শাপ দেন যে,তোমার পঞ্চপতি হইবেক। মহাদেব বর দেন যে, তোমার পঞ্চপতি হইলেও সতীত্ব নষ্ট হইবে না।

† মনুতে যে দেবর দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করার বিধি আছে, তাহা ঘৃতাভ্যঙ্গ প্রভৃতি অনেক কঠিন কার্য্য তাহা এইক্ষণে করা অসাধ্য। তবে উৎকলে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা বিধিসিদ্ধ নহে।

ঐ সকল কার্য্য বিধিপূর্ব্বক প্রতিপালন হইবে না ভাবিয়াই তাহা এক্ষণে রহিত হইয়াছে। অতএব উক্ত পঞ্চকন্যা শাস্ত্র সঙ্গত সতী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই; লোকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ঐ পঞ্চ কন্যার শবণ করা বিধি হইয়াছে। যে রূপ স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসার সার প্রকাশ করা হইল; তদ্রূপ বালক ও বালিকার ধর্ম্ম নিরূপণ হইয়াছে। মহাভারতে আছে যে, পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই; তদনন্তর চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পাপপুণ্য কি তাহা যদি বুঝিতে না পারে তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, আর যদি বুঝিতে পারে তবে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে পাপ হয়; তাহার, লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে নিরূপণ হইয়াছে। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে, লোকের পরমায়ুর সংখ্যা নিরূপণ আছে কি না ও কি কারণে তাহা ক্ষয় হয়, তদ্বিষয় নির্ণয় কি।

বিংশতি অধ্যায়।

পরমায়ুর সংখ্যা; ও তাহার সদসৎ কার্য্যে বৃদ্ধি ও ক্ষয়।

মনুর প্রথম অধ্যায় ৮৩ শ্লোকে; সত্যযুগে চারি শত বৎসর, ত্রেতা ও দ্বাপরে ও কলিতে তাহার এক এক শত বর্ষ ন্যূন, লোকের পরমায়ু সংখ্যা নিরূপণ হইয়াছিল; কিন্তু ঐ অধ্যায়ের ৮৪শী শ্লোকে আছে যে, কাম্য কর্ম্মের ফল জন্য, এবং ব্রাহ্মণাদির শাপ ও অনুগ্রহ দ্বারা পরমায়ুর হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। পুরাণে আছে যে, সত্যযুগে লক্ষবর্ষ, ত্রেতায় দশসহস্র ও দ্বাপরে সহস্র বৎসর, কলিতে প্রথমতঃ এক শত বৎসর তৎপরে নির্ণয় নাই। ইহাতে কিছু বিরোধ দেখা যায় বটে; কিন্তু বৎসর কিরূপে ধরা হইয়াছে তাহা দেখা যাউক্। মনু প্রধান শাস্ত্র, তাহাতে পরমায়ু যাহা ধরা হইয়াছে তাহা শ্বাস সংখ্যা অনুসারে; এবং পুরাণ শাস্ত্র প্রত্যক্ষ কার্য্য প্রকাশক তাহাতে তাঁহারা সৌর অথবা সাবন বৎসর ধরিয়া ঐ সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রে গণনা স্থলে প্রায় সাবন বৎসর ধরা

হইয়া থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই যে, সারদা তিলক নামক তন্ত্রটীকায় রাঘব ভট্টাচার্য্য ধৃত বচনে আছে যে, ষাইট্ শ্বাসে এক প্রাণ, ছয় প্রাণে এক দণ্ড, ইহার ষাইট্ দণ্ডে এক দিবা রাত্রি হয়; তাহাতে এক দিবসে ও রাত্রিতে জীবহংস মন্ত্র ২১ হাজার ৬ শত পরিমাণে জপ করে; এই জপ যতক্ষণে সমাধা হয় তত ক্ষণকে এক দিবস বলা যায়। তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য প্রবাহিত যে দিন তাহা ধরা যাইবে না; হয় ত সৌর সাবন দিনের ৫ কিম্বা অধিক দিনে হংসমন্ত্র জপের নিয়মানুসারে এক দিন হইতে পারে; ইহা যোগ শাস্ত্র সম্মত। কেননা যাঁহারা কুম্ভক প্রভৃতি যোগাবলম্বন করিয়া থাকেন; তাঁহারাও এই কালেও সহস্র বৎসরের ঊর্দ্ধকাল জীবিত থাকেন। এবং অনেক লোকের মৃত্যু সময় ঘনশ্বাস বহিতে দেখা যায়। তাহাতে অনুভব হয় যে, অজপা মন্ত্র যাহার যত পরিমাণ জপ সংখ্যক পর মায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে; তৎ সংখ্যা ক্ষয় না হইলে মৃত্যু হইবেক না বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস বহিতে থাকে। ইহাতে সৌর অথবা সাবন মতের সহিত জপ সংখ্যার বৎসরের ঐক্য নাই অথচ পরমায়ু বিষয়ে শ্বাস প্রশ্বাসই বলবৎ? তাহাতে বক্তব্য এই যে, সত্যযুগের মনুষ্য ২১শ হাত পরিমিত অর্থাৎ তাহাদিগের ব্যবহারিক হস্তের ২১শ হাত পরিমিত ছিল*। কিন্তু এখনকার মনুষ্যেবহস্ত নহে; ইহাতে এইক্ষণকার হস্তের যে কত হস্ত হইবেক তাহা নিরূপণ করাযায় না; ফলতঃ অতিশয় দীর্ঘাকার ছিল; তাহাদিগের শ্বাস দনান্তে এক কি দুই অথবা অধিকবার বহন হইত সেই পরিমাণে চারি শত বর্ষ ধরিলে সৌর অথবা সাবন মতের লক্ষবর্ষ হইতে পারে ইহার সন্দেহ নাই; তদ্রূপ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মনুষ্যের পরিমাণ ন্যূন হওয়াতে শ্বাস বহন কিছু দ্রুত হইয়া আয়ু সংখ্যা ন্যূন হইয়াছে। এইরূপ শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যে সাবন বা সৌর দিনের অনৈক্য; তাহার আর একটী উদাহরণ এই যে, পরমেশ্বর সকলের শ্রেষ্ঠ তাঁহার এক নিশ্বাসে সৃষ্টি স্থিতি, ও এক প্রশ্বাসে লয় হইয়া থাকে। অপিচ শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়;

* যেমন এইক্ষণকার মনুষ্যের যাহার যে রূপ হস্ত তাহার চোদ্দপোয়া হয় তদ্রূপ। ষড় যবে এক অঙ্গুলি তাহার ২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত হয় তাহার ২১ হস্ত পরিমাণ শরীর ছিল কিন্তু মনুষ্যমাত্রই যাহার যে হস্ত তাহার সাড়ে তিন হাত হইবেক তখনও ঐরূপ ছিল।

ঐ দিবস তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা নিরূপণ হইয়াছে; কেননা দিবা রাত্রি চন্দ্র সূর্য্যের গতির দ্বারা যাহা হয়, তাহা এক নিয়মে চলিতেছে; তবে ব্রহ্মার দিবস ঐ রূপে নিরূপণ না হইলে সঙ্গত হয় না। অতএব সাধারণ রূপে পরমায়ু, উপরি উক্ত নিয়মানুসারে নিরূপণ হইয়াছে।* কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের পরমায়ু অদৃষ্টানুসারে হইতে পারে, তাহাতে দৃঢ় প্রারব্ধ বশতঃ যাহার যে পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ যত সংখ্যা যত সৌর বা সাবন দিনে অজপামন্ত্র, জপের নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই ভোগ হইবেক। আর নিয়মাধীন প্রারব্ধ বশতঃ যে পরমায়ু ভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পুরুষের কার্য্য বশতঃ হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হইতে পারে। ফলতঃ অজপার সংখ্যার বৃদ্ধি হইবেক না; সৌর সাবন মতে বৎসরের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র রোগাদির দ্বারা ঘন শ্বাস বহিয়া অজপা ক্ষয় হয়। এবং স্বাস্থ্যতা ও যোগাদির দ্বারা দীর্ঘ কালপর্য্যন্ত মৃদুভাবে শ্বাস বহন, এবং কুম্ভকাদির দ্বারা কিয়ৎকাল শ্বাস বহন রহিত থাকিয়া দীর্ঘপরমায়ু ভোগ করে। মনুর পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম হইতে, বিশেষত ৪র্থ শ্লোকে আছে যে, বেদ অভ্যাস এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করায়, ও সদাচার পরিত্যাগ করায়, ও অভক্ষ্য ভক্ষণ, ও অপেয় পান দ্বারা, ব্রাহ্মণাদির পরমায়ু ক্ষয় হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তদনন্তর ৫ম শ্লোক হইতে ব্রাহ্মণাদির অভক্ষ্য ও অপেয় প্রভৃতি অকার্য্য সকল বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে নিয়মাধীন প্রারব্ধ বশতঃ ব্রাহ্মণাদিরা ঐ রূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান এবং অগম্যা গমন ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ ইত্যাদি কার্য্য করাতে নানা প্রকার রোগাদি হইয়া অকাল মৃত্যু হয়। যাহা এক্ষণে লোকের অধিকাংশ হইতে দেখা যাইতেছে। যদি সাবধান পূর্ব্বক শাস্ত্র বিধি প্রতিপালন করে তবে কদাচ এই রূপ ঘটনা হয় না। কেবল দৃঢ় প্রারব্ধ স্থলে হইতে পারে তাহা প্রারব্ধ বিচারে তৃতীয় ভাগের ৮ম অধ্যায়ে বিশেষ মীমাংসা করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় এইক্ষণ কার অনেক লোকেই অবিশ্বাস করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা কলির প্রভাবে হইয়া থাকে; নতুবা আমাদিগের প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসের কোন

---

* "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" ও "দাতা শতং জীবতু" ইত্যাদি স্থলে শত শব্দে বহুকাল বলা যায়।

কারণ নাই। ফলতঃ বিবেক সহকারে ইহা আলোচনা করিলে অবশ্যই ইহার ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভগবান কল্কী অবতার না হইবেন; ততদিন শাস্ত্র সকল অনেক লোকের বিশ্বাস্য হইবেক না। এক্ষণে দেখা যাউক্ যে, ভগবানের অবতার হওয়ার কারণ কি ও তাহা কত প্রকার।

একবিংশতি অধ্যায়।

ঈশ্বরের অবতার হওয়ার কারণ কি ও তাহা কত প্রকার।

ঈশ্বরের অবতার অনেক, তাহার সংখ্যা করা যায় না; তবে প্রধানতঃ কতকগুলি অবতার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্দের তৃতীয় অধ্যায়ে হইয়াছে তাহার সার ভাগ সঙ্কলন করা যাইতেছে। ফলতঃ তাহা অন্যান্য পুরাণে বহু বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে; কিন্তু ঐ সকল অবতার কারণ বশতই হইয়াছিল। ভগবান বিষ্ণু পালনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার অংশে যাঁহারা অবতরণ করিয়াছেন তাঁহাকেই অবতার বলা যায়; তদ্ভিন্ন ভগবতী দুর্গা ও শিব প্রভৃতি যে, যেরূপ ধারণ করিয়া অসুর আদি বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া গণনা করা হয় নাই; হনুমানকে রুদ্রাবতার বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন দুর্গার মূর্ত্তি বিশষকে আবির্ভাব শব্দে কথিত হইয়াছে* যদ্যপি ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার বিখ্যাত ও সকলেই জ্ঞাত আছেন; কিন্তু কারণ বশতঃ আরও কতকগুলি অবতার আছে, তাহার সমুদায় কারণের সহিত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বিরাট পুরুষ প্রথমতঃ সাকার রূপে প্রকাশ হয়েন; ঐ বিরাটের অংশ প্রজাপতি প্রভৃতি এবং তাঁহার একাংশে এই জগত রহিয়াছে। ঐ বিরাট প্রথমতঃ ব্রাহ্মণরূপ

* অংশরূপে ষোড়ষকলা সম্পূর্ণ অবতারকে পূর্ণ অবতার বলা যায়, তদপেক্ষা ন্যূনাংশকে অংশাবতার বলা যায়। ভাগবতে বলেন কৃষ্ণ পর্ণাবতার আর সকলে অংশ ও কলা বলিয়াছেন। ফলতঃ সকলই ঈশ্বরাবতার তাহার সন্দেহ নাই।

পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিয়াছিলেন। ইহাঁকে অন্য পুরাণে নর নারায়ণ বলিয়া থাকে। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া রসাতল গামিনী পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। এবং তিনি দেবর্ষি নারদাবতার হইয়া মনুষ্যের কর্ম্মভোগ নিবারণার্থ বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচার করেন। এবং ধর্ম্মের অংশে নরনারায়ণ রূপে তপস্যা করিয়াছিলেন। কপিলাবতারে সাংখ্য-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন; এবং দত্তাত্রেয়রূপে অলর্ক প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা বিষয়ক উপদেশ দেন। তিনি যজ্ঞ নামে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রতিপালন করেন। ঋষভাবতারে সকলকে পরমহংস পথ প্রদর্শন করেন। মুনিগণের প্রার্থনা পরতন্ত্র হইয়া পৃথুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি দোহন করিয়াছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাগর-সলিলে সমুদায় আপ্লাবিত হইলে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া নৌকা-সংযোগে বৈবস্বত মনুকে জীব জন্তুগণের সহিত পরিত্রাণ করেন। সাগর মন্থন-সময়ে মন্থন-দণ্ড স্বরূপ মন্দর পর্ব্বতকে কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন*। ধন্বন্তরীরূপে সাগরগর্ভ হইতে অমৃত-কলস আহরণ করেন; এবং মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরগণ হইতে অমৃত হরণ করতঃ দেবগণকে পান করাইয়াছিলেন। নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপু নামা অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। বামন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিকে নিরস্ত করতঃ ইন্দ্রকে ত্রিভুবন প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় গণের প্রতি ক্রোধ বশতঃ পরশুরামরূপ ধারণ করতঃ পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। দশানন রাবণকে বধকরিবার নিমিত্ত রামরূপ ধারণ করতঃ সমুদ্র বন্ধন ও রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। বেদব্যাস রূপ ধারণ করতঃ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত এবং পুরাণসকল প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। এবং ভূমির ভার অপহরণ নিমিত্ত রামকৃষ্ণ রূপধারী হইয়া কংস প্রভৃতির বধসাধন করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুর দিগের মোহনার্থে গয়া প্রদেশে বুদ্ধ অবতার হইবেন† পরে ভয়ঙ্কর কলিযুগাবসানে নরপতিগণ

* কেহ বলেন যে মীনরূপে বেদের উদ্ধার করেন এবং কূর্ম্ম রূপে পৃথিবীকে ধারণ ইহায়া অবতার, কেহ বলেন তাঁহারা আবির্ভাব ইঁহারাই অবতার।

† ইহার দ্বারা বোধ হয় যে বুদ্ধ অবতারের পূর্ব্বে এই ভাগবত গ্রন্থ প্রচার হইয়াছিল।

বেদমার্গ পরিভ্রষ্ট ও সদাচার বিহীন হইলে কল্কীরূপে অবতার হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন; ইত্যাদি লিখিত আছে; তদ্ভিন্ন আর কতপ্রকার অবতার আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না; যখন যখন ধর্ম্মের হানী হয় এবং অসুরের বৃদ্ধি হয় সেই সময় পালন কর্ত্তা অবতার হইয়া রক্ষা করেন; এই যে সকল অবতার কথিত হইল ইহার মধ্যে কৃষ্ণ অবতারকে এক্ষণকার অনেক লোকেই বলেন ইনি ঈশ্বর নহেন; কেননা ইনি পরদার গোপীদিগের সহিত রতিক্রীড়া করাতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইতে পারেন না ইহা অতি ভ্রম মূলক বিধায় কৃষ্ণ অবতারের বৃত্তান্ত শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব সমেত সারাংশ প্রকাশ করা যাইতেছে। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম পরমেশ্বর তাঁহার স্বদার পরদার নাই; তথাপি মানুষরূপে লীলা করায় কোন মন্দকার্য্য করেন কি না তাহা দেখাযাউক্।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার নির্ণয়।

কৃষ্ণাবতারের মূল গ্রন্থ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উত্তর খণ্ড; তাহা পাঠকরিলে জানা যায় যে, আদ্যাশক্তি রাধা, যিনি পরমা প্রকৃতি, এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন; কোন প্রলয় সময়ে বাসুদেব বিষ্ণু যখন বট পত্রে যোগ নিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলেন, তখন ঐ রাধিকা তেজোময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ করতঃ তাঁহাকে সৃষ্টিকর বলিয়া অন্তর্ধ্যান হয়েন। বিষ্ণু তখন কাহাকেও না দেখিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। রাধিকা তখন প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন বর লও; তাহাতে বিষ্ণু কহিলেন আমার কিসে সিদ্ধি লাভ হয়? এরূপ বর প্রদান কর? রাধিকা বলিলেন তুমি প্রথমতঃ গুরুর উপাসনা কর, পরে শক্তির সহিত কুলাচার সাধনে সিদ্ধি লাভ করিবে। বিষ্ণু বলিলেন তুমি আমার শক্তি হও তাহাতে রাধিকা শাপ প্রদান করিয়া বলিলেন তুমি আমাকে মন্দ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ এজন্য তুমি, মানুষরূপে

আবির্ভাব হইলে আমি তোমার পুংশ্চলীরূপা শক্তি হইব*। বিষ্ণু রাধিকাকে শাপ দিলেন যে, তুমি ময়ূরী হও; রাধিকা বলিলেন এই ময়ূরের পুচ্ছ তোমার মস্তকের চূড়া হইবেক। পরে গোলোকধামে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিস্তারিত হইয়াছিল। তদনন্তর ভূভারহরণের জন্য পৃথিবীর প্রার্থনা মতে বৃন্দাবনে লীলা হয়। তাহাতে অপুত্রক বৃষভানু রাজা পুত্রার্থে তপস্যা করায় এক পদ্মাকার ডিম্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ঐ ডিম্বে রাধার জন্ম হয়। রাধা কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন; তাহাতে ভগবান সাক্ষাৎকার হইয়া বর দেন যে, তুমি পূর্ব্বে স্বয়ং অভিশাপ দিয়াছিলে যে, পুংশ্চলী শক্তি রূপে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইবে তজ্জন্য বিষ্ণুর অংশে আয়ান ঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়া, সে নপুংসক হইবেক তাহার সহিত তোমার প্রকাশ্য বিবাহ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার-কার্য্য সম্পন্ন হইবেক। এ দিকে বসুদেবের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া বসুদেব কর্তৃক বৃন্দাবনে নন্দালয়ে আনীত হইয়া তথায় বাল্যলীলা প্রভৃতি নানারূপ ক্রীড়া এবং অসুরাদি বধ করিয়াছিলেন। যখন আয়ান ঘোষের সহিত রাধার বিবাহ হয়, তৎকালীন শ্রীকৃষ্ণ আয়ানের ক্রোড়ে থাকাতে† রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের মহিমা ও মায়া, কে বুঝিতে পারে; লোকে জানিলে যে, আয়ানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তৎসময়ে আয়ান ঘোষ নপুংসক হইয়াছিল। তাহার রাধার সহিত কখনই সহবাস হয় নাই; কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানা প্রকার ক্রীড়া ও লীলা হইয়াছিল; এবং কৃষ্ণকালী রূপ দেখাইয়াছিলেন। ও রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য এবং বহুবিধ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। আর গোলোক ধামে থাকন সময়ে গঙ্গার সহিত রাধার বিবাদ হওয়াতে রাধিকার শাপে গঙ্গা অংশত মানুষ হইয়া চন্দ্রাবলি রূপে জন্মগ্রহণ করেন; এবং রাধার অংশে আর কয়েকটী গোপী যাহারা কুমারী ও সহচরী ছিলেন; তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ

* পরপত্নী পুংশ্চলী।

† এই অবধি কোলবর হইতে আরম্ভ হইল।

রাধার নিকট গমন করিতেছিলেন ; তৎকালীন পথিমধ্যে চন্দ্রাবলীর সহিত সাক্ষাৎ হইবায় তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। ঐ রাত্রিতে রাধিকার নিকটস্থ না হওয়ায় তাঁহার মান হইয়াছিল। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শিবের উপাসনা করতঃ যোগীবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষার ছলে মান ভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে শারদীয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে রাসক্রীড়া করেন; ঐ রাস মণ্ডলে রাধার শরীর হইতে তৎ স্বরূপা ষোড়শ সহস্র কামিনী, এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে ঐ সংখ্যক কৃষ্ণরূপধারি পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং অন্যান্য গোপ গোপীগণ সহায় থাকিয়া নৃত্য গীত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত ঐশ্বরিক কার্য্য দর্শন জন্য দেবতা ও ঋষিরা এবং গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি সকলই তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শন করিয়াছিলেন। এই একখানি পুরাণ প্রায় সমুদায় সংক্ষেপে অনুবাদ করাইল ; ইহার কোন স্থানেই পরদার গমনের লেশ মাত্র কথাও নাই। এই বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যাহা আছে তাহাতেও পরদার গমন বৃত্তান্ত কিছুই নাই। বিষ্ণু পুরাণ এবং হরিবংশ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় লীলা বর্ণনা আছে; কিন্তু রাধিকার বৃত্তান্ত কিছুই নাই এবং কোন গোপীর নামও উল্লেখ হয় নাই। তাহাতে রাস লীলা বর্ণনা আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, কেবল গোপীর সহিত নৃত্য গীতাদি ক্রীড়া করা হইয়াছিল ; তাহাতে পরপত্নী গোপীকাকে রমণ করার কোন কথা নাই ; বরং গোপিনীরা তৎকালীন ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ সমুদায় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণময় জ্ঞান করিয়াছিলেন। এইক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা যাইতেছে ; ঐ গ্রন্থের দশমস্কন্দে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্য লীলা প্রভৃতি সমুদায় বর্ণনা আছে ; কিন্তু রাধিকার জন্মবৃত্তান্ত ও লীলা এবং আয়ান ঘোষের কথা কিছুই নাই। পরন্তু ঐ গ্রন্থে রাধিকার নামও নাই। তবে ঐ গ্রন্থে বস্ত্র হরণ ও রাসলীলা বিস্তারিত বর্ণনা আছে ; কিন্তু পরদার গমনের কোন কথা নাই তাহাতে আছে যে, কতকগুলি কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা গোপী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য কাত্যায়নীর আরাধনা করেন ; ব্রত পূজা সমাধা করিয়া অবভৃত-স্নান* করণ জন্য বিবস্ত্রা

* যজ্ঞান্তে যে স্নান করা যায়।

হইয়া তাহারা যমুনার জলে নিপতিত হইয়াছিল: ঐ বিবস্ত্রা হওয়া পাপ-কার্য্য বিবেচনায় তাহা নিবারণ ও বালা-গোপিনীদিগকে শিক্ষা প্রদানার্থে শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল বস্ত্র হরণ করতঃ প্রত্যর্পিত কালে বলিয়াছিলেন যে, বিবস্ত্রা হইয়া জলে নিমগ্ন হওয়া পাপকার্য্য: বিশেষতঃ ব্রতধারিণী দিগের পক্ষে অতিশয় দূষ্য এজন্য বস্ত্র-হরণ করা হইয়াছে; যে হউক আগামী রাসপূর্ণিমার রাত্রিতে তোমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যাইবেক। তদনন্তর রাসলীলা বর্ণন কালে লেখা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করতঃ গোপিনীরা ঐ রাস-পূর্ণিমার নিশি-যোগে রাস-মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপিনীদিগের রাস-ক্রীড়া অর্থাৎ নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি নানা প্রকার লীলা ও অঙ্গ-স্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ঐ গ্রন্থ বিশেষরূপে লেখা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মৈথুন কার্য্য অর্থাৎ বীর্য্যপাত করেন নাই নিজ শুক্র স্তম্ভন করিয়া রাখিয়াছিলেন।* কেবল গোপিনীরা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন: ইহা ঈশ্বরের মায়ার কার্য্য। ঐ রূপ অঙ্গ স্পর্শের তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, পূর্ব্বে যে সকল কুমারী গোপিনী দিগের বর প্রদান করিয়াছিলেন তাহাদিগের বাঞ্ছা পূরণার্থে ঐ রূপ ঘটনা হইয়াছিল। কেননা ঈশ্বর যে বরদান করেন তাহা অবশ্যই সফল হইবার সম্ভব। যদ্যপি ঐ অধ্যায়ে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপিনী দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা পতি পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়া মন্দ কার্য্য করিয়াছ ইত্যাদি প্রয়োগ করতঃ পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন; তাহা রস পূরিত মধুর কাব্য বটে: তাহা শ্রীরাধিকার প্রতি উক্ত হইতে পারে; কেন না কোন গোপীর নাম ঐ গ্রন্থে না থাকায় যেস্থলে সম্ভব তথায় সংলগ্ন হইতে পারে। যদি বল যে, অন্যের পত্নী অন্যান্য গোপিনীদিগের প্রতি ঐ রূপ উক্তি হইতে পারে তাহাতেও দোষ বর্ত্তে না; কেননা বীর্য্য পাতাদি কার্য্য তাহাদিগের সহিত হওয়া লিখিত হয় নাই; তবে কুমারী গোপীদিগের সহিত গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ

* এবং শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা নিশা স সত্য কামোঽনুরতা বলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ সর্ব্বাঃ সরৎ কাব্যকথারসাশ্রয়॥ ভগবতে রাস লীলায়াং।

হওয়াই অনুভব হইতে পারে ; তাহাতেও ধর্ম্মতঃ কোন বিরুদ্ধ কার্য্য ঘটনা হয় নাই। যদ্যপি ঐ রাস-ক্রীড়া সময়ে যে যে কার্য্য হইয়াছিল তাহা দৃশ্যতঃ দূষ্য বটে ; কেননা মৈথুন আট প্রকার অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ গুপ্ত-ভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি ; ইহার মধ্যে ক্রিয়া-নিষ্পত্তি অর্থাৎ বীর্য্যপাত ব্যতীত আর ৭ সাত প্রকার কার্য্য হইয়াছিল। তাহা দৃশ্যতঃ দূষণাবহ বটে ; কিন্তু ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ নহে ; ও তাহাতে ঈশ্বরের পরম ভক্ত গোপিনীরা থাকায় তাহারা তৎকালীন শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে তাহাদিগের বাঞ্ছা পূরণার্থে ঐ কার্য্য করায় ঈশ্বরের কোন দোষ বা ঈশ্বরত্বের মহিমার হানী হয় নাই তজ্জন্য রাজা পরিক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন* যে, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম পরমেশ্বর তাঁহার স্বদার পরদার কেহ নাই। বাস্তবিক রাসলীলার অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে জানা যায় যে, ঐ রূপ কার্য্য ঈশ্বর ব্যতীত মনুষ্যের সাধায়ত্ব নহে; কেননা একটী গোপিনীর দক্ষিণ ভাগে একটী কৃষ্ণ এরূপ অনেক কৃষ্ণ রূপ হইয়া রাস-মণ্ডল সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; ইহা কখনই মনুষ্য সাধ্য নহে। অনেকেই ভাগবতের ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া বলেন যে ঐ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে পরদারগামী বলা হইয়াছে ; ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ; কেননা ঐ গ্রন্থে যখন স্পষ্ট বাক্যে লেখা আছে যে, রাসক্রীড়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ বীর্য্যপাত করেন নাই শুক্রস্তম্ভন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; তখন যিনি যাহা ব্যাখ্যা করুন না কেন কোন ক্রমেই ঐ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না ; তবে কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসের কৃত নহে ; কেননা অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে যে, ভাগবত বলিয়া লেখা আছে তাহা মহাভাগবত ; তদ্ভিন্ন দেবীভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত তদন্তর্গত নহে। এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ইতিহাস ভাগ স্থানে স্থানে অন্য পুরাণের সহিত অনৈক্য থাকায় তাহা পুরাণ অথবা উপপুরাণ মধ্যে গণিত নহে। যদি ইহা সত্য হয় তবে শ্রীকৃষ্ণের পরদার গমন করার সন্দেহ মাত্রও থাকে না ; কেননা অষ্টাদশ

---

* পরিক্ষিত যে পরদার গমন বলিয়া প্রশ্ন করেন সে অন্য সাত প্রকার মৈথুন কার্য্য উপলক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন বলিতে হইবেক নতুবা পূর্ব্বে যখন বলিয়াছেন যে বীর্য্যপাত হয় নাই তখন তদ্বিষয় উপলক্ষ করিয়া প্রশ্ন করা সঙ্গত নহে।

পুরাণে এবং মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বাখ্যা করা হইয়াছে তাহার কোন পুরাণেই শ্রীকৃষ্ণের পরদার গমনের কথা লেশমাত্রও নাই। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল শব্দ প্রয়োগ আছে তাহাতেও ঐ রূপ নাই কেবল কামী লম্পট স্বভাব ব্যক্তিরা ঐ রূপ মন্দ ব্যাখ্যা করিয়া লোকের ভ্রম জন্মাইয়াছে। ফলিতার্থে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাস কৃত কিনা তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য বটে ; কিন্তু গ্রন্থ খানি যে উৎকৃষ্ট এবং তাহার রচনা চমৎকার ও জ্ঞান ও ভক্তি পরিপূরিত তাহার সন্দেহ নাই। ঐ গ্রন্থ বহুদিনের প্রাচীন এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত মহাশয় তাঁহার স্মৃতিতে ঐ গ্রন্থের প্রমাণ ধরিয়াছেন ; এবং সাধু সমাজে বহুদিন হইতে আদরণীয় হইয়া চলিতেছে। বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থে মাধুর্য্য রসের যে বর্ণনা আছে তাহাও ভক্তি রস মিশ্রিত থাকায় গ্রন্থখানি সামান্য লোকের রচনা বলিয়াও বোধ হয় না*। অতএব কৃষ্ণ লীলা যে, সকল অবতারের প্রধান তাহা তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ থাকাতে সিদ্ধান্ত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ও দ্বারকাতে অনেক পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা কেহই পরদার ছিলেন না সকলেই তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ছিল। পুরাণ সমস্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, কৃষ্ণ অবতারে শৃঙ্গার, বীর, করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, এবং শান্তি এই নব রস সম্যক্ প্রকারে প্রকাশ হইয়াছিল ; তাহাতে মাধুর্য্য রস কিছু অধিক প্রকাশ হয় বটে ; তাহার কারণ এই যে, রাম অবতারে বীর এবং করুণা রসের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মাধুর্য্য রসের কিছু অভাব থাকায় কৃষ্ণাবতারে ঐ রস অধিক প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাতে বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকার সহিত যে পরকীয় ভাবে লীলা করা হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকল লোকে রাধাকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে না পারে ; কেননা মনুষ্যরূপে লীলা করাতে সকল লোকের দৃষ্ট হইবেক ; তাহাতে যদি ঈশ্বর রূপে লোকদর্শন করে তবে সকলেরই মুক্তি হওয়ার

* নখলু গোপিকা নন্দনো ভবানখিল দেহিনা মন্তরাত্মদৃক্। বিখন সার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান সাত্বতং কুলে। ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়, গোপিনীরা বলিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণ হে সখে তুমি গোপিকা নন্দন নহ তুমি পরমাত্মা।

সম্ভব ; এই জন্য পাষণ্ডদিগের মুক্তিলাভ না হয় বলিয়া বাহ্যিক ঘৃণিত ভাব প্রদর্শন করাতে পাষণ্ডেরা ঘৃণা করিয়াছিল। এবং যাহারা পুণ্যাত্মা ও জ্ঞানী তাহারা ঈশ্বর জ্ঞান করিয়াছিলেন। ইহা সকল পুরাণেই প্রকাশ আছে। অতএব লীলা বিস্তার করণ-জন্য গূঢ় ভাবে কপট মনুষ্যরূপে লীলা করিয়াছিলেন* ইহা ঈশ্বরের মহিমা ; নতুবা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ, বাড়বানল ভক্ষণ, কালীয়দমন, ব্রহ্মার সম্মোহন, সান্দিপনীর মৃত পুত্রকে পুনরানয়ন, প্রভৃতি অসংখ্য অলৌকিক কার্য্য সকল ঈশ্বর ব্যতিত সামান্য মনুষ্যের কার্য্য হইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রবিধি না জানিয়া লোকে যে ঈশ্বর-নিন্দা করে সে কেবল সমূহ পাপ কার্য্য ভিন্ন নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের এ দেশে অনেক শাস্ত্র ছাড়া প্রবাদ ও পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে দেশ উচ্ছিন্ন-প্রায় হইতেছে। অতএব যাহার যে বিষয় সন্দেহ থাকে, তিনি যেন প্রকৃত শাস্ত্রের মূল দৃষ্টে তাহার মীমাংসা করেন ; নতুবা তাহার সংশয় ছেদ হইবেক না। এই পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম লিখিয়া তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত করা হইল। এক্ষণে নিবৃত্তি ধর্ম্ম কি অর্থাৎ কিরূপে লোকের মুক্তি লাভ হইয়া সংসার যাতনা এককালীন নিবৃত্তি হইতে পারে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।

* শৃঙ্গার বিষয়ে পরকীয় রস উৎকৃষ্ট।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

মোক্ষ-ধর্ম্ম বিষয় ও বৈরাগ্য কি তাহা নির্ণয়।

মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে হইলে বৈরাগ্য পরিচালন অর্থাৎ সংসার হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য*; কিন্তু সংসার দুঃখময় বলিয়া স্থির করিলে সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে; তাহাকে সুখ জ্ঞান করিলে হয় না। অতএব সংসার দুঃখময় কি সুখময় তাহা বিবেক সহকারে সম্যক আলোচনা করিলে দুঃখময় বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। কেন না প্রথমতঃ গর্ত্তযন্ত্রনা, তদনন্তর ভূমিষ্ঠ হইয়া জ্ঞান ও বাক্‌শক্তি এবং গতিশক্তি রহিত প্রযুক্ত নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়; এবং ক্ষুৎপিপাসায় কেবল রোদন করিতে, ও সর্ব্বদা বিষ্ঠা মূত্রে সংলিপ্ত থাকিতে হয়। তদনন্তর বিদ্যোপার্জ্জন নিমিত্ত নানা প্রকার দুশ্চিন্তা ও তাড়না ভোগ করে। পরে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করতঃ অর্থ উপার্জ্জন ও তাহা রক্ষার নিমিত্ত অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়; এবং মধ্যে মধ্যে ঘোরতর রোগ শোকে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সকলেরই অনুভব আছে। বিশেষতঃ বিষয় প্রলোভে, যে কত প্রকার কুকর্ম্ম করিতে হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। ফলতঃ কেহ কেহ তজ্জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাবাস প্রভৃতি শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ দারিদ্র-দোষে সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া ধনীদিগের উপাসনায় কালক্ষেপণ করিতে থাকেন। এবং কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই ক্রীড়াকারকের হস্তস্থিত শৃঙ্খলে বদ্ধ বানরের নৃত্য করার ন্যায় স্ত্রী পুত্রাদির বশবর্ত্তী হইয়া অনবরত পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। সময় সময় এরূপ ঘৃণা বোধ হয় যে, পরাধীন মনুষ্য অপেক্ষা স্বাধীন পশু পক্ষীরাও সুখী আছে। বিশেষতঃ ধনীরা সময় সময় বিষয়ের নিমিত্ত এরূপ পরপীড়নে রত হয়েন

---

* সংসার শব্দের অর্থ মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনা,

যে, তাহাদিগের কার্য্য অপেক্ষা দস্যু কার্য্যও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু যৌবনকাল কেবল অনর্থের মূলীভূত; কারণ যৌবনকাল কেবল অভিমানাত্মক মদগর্ব্ব পরিপূরিত; এবং তৎকালে সম্পত্তি প্রাপ্তে অধিক প্রভুতা হইয়া উঠে; সুতরাং নিরন্তর অবিবেকের বশীভূত হইয়া নানা প্রকার কুকর্ম্ম করিতে থাকে। তদনন্তর বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন শক্তিহীন ও দুর্ব্বল অবস্থাপন্ন হয়; তাহাতে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, রতিশক্তি, গতিশক্তি বুদ্ধিশক্তি রহিত হইয়া নিরন্তর শ্বাস কাশ উদরাময় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, ক্রমাধীন পক্ককেশ বিগলিত-দন্ত ললিত-চর্ম্ম হইয়া শ্রীভ্রষ্ট এবং উত্থানশক্তি রহিত হইয়া যায়; যেরূপ বাল্যকালে বিষ্ঠা মূত্রাদিতে পরিপ্লুত থাকিয়া পরাধীনতা-রূপে পান ভোজন করিতে হয় তদ্রূপ বৃদ্ধাবস্থায় জরাগ্রস্ত হইয়া পরিবার-বর্গের বশবর্ত্তীতায় সতত দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয়; যেরূপ যাবজ্জীবন কারাবাসে থাকিয়া অপরাধীরা দুঃখ ভোগ ও রাজকিঙ্করের তাড়না সহ্য করে; ততোঽধিক সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। তদনন্তর ভয়ঙ্কর মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে মৃত্যু যাতনাতে এরূপ কষ্ট হয় যে, যেন অবিরত সহস্র সহস্র বৃশ্চিকে দংশন অথবা অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ করিতেছে। তদনন্তর কালের করালগ্রাসে নিপতিত হইলে যমকিঙ্করগণ নানা প্রকার তাড়না করিতে থাকে। পরিশেষে পাপ কর্ম্ম জন্য নরকে নিমগ্ন করায়। ইহাতে যে কত যাতনা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে; এবং যুক্তি দ্বারা অনুভব হইতেছে, তাহা লিখিতে প্রবর্ত্ত হওয়ায় কাষ্ঠের লেখনীও রোদন করিতে লাগিল বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া গেল।* অতঃপর দেখা যাউক যে, সংসারে কিছু সুখ আছে কি না; তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সাংসারিক অনিত্য সুখ সুখই নহে; কেননা যাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সুখ বিবেচনা করা যায় তাহা বাহ্যে কিছু সুখ বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কিছুই নহে, বরং দুঃখময় বলিয়াই বোধ হয়। যেমন তপ্ত বালুকাময় ভূমিতে প্রবেশ করতঃ রৌদ্রের উত্তাপে শ্রান্ত হইয়া একটী কুপিত কালসর্পের ফণার ছায়ায় উপবেশন করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব

* এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত থাকায় পুনরুক্তি করা হইল না।

করিবার চেষ্টা করে; তন্নায় দারা পুত্রাদি স্নেহ ও বিষয়োপভোগাদিতে সুখানুভব হয় মাত্র। ফলতঃ যাহাকে উৎকৃষ্ট বস্তু বিবেচনায় ভোগ করতঃ সুখানুভব করার চেষ্টা করা যায়, তাহা বিষ মিশ্রিত ক্ষীর লড্ডুকের ন্যায় ভোজন করিলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়; কেন না স্ত্রী সংসর্গে আপাততঃ কিছু সুখজ্ঞান হয় বটে : কিন্তু ক্রমশঃ বহু সন্তান উৎপন্ন হইয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়; এবং স্ত্রী বস্তু কি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ রূপ সুখজ্ঞান কদাচ হইতে পারে না; কেননা কতকগুলিন অস্থি চর্ম্ম-রক্ত-মাংস-বসা-মজ্জা-ময় একটা শরীর, ও তাহার মুখ লালাকীর্ণ-ময়, এবং সুখের স্থান অতি দুর্গন্ধ মূত্র পুরীষ পরিপূর্ণ ; (ঐ রূপ স্ত্রীর পক্ষে পুরুষ) ইহাতে কখনই সুখ হইবার নহে। তবে ঐশ্বরিক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মূঢ়ের স্ত্রী ও পুত্রে সুখজ্ঞান করে*। এবং নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য ও সুখকর নহে; কেননা তাহা জল ও মৃণ্ময় পদার্থ; তাহা ভোজনান্তে বিষ্ঠা মূত্র হইয়া নির্গত হয়; পুনরায় মৃত্তিকা হইয়া দ্রব্যরূপে উৎপন্ন হইতে থাকে। এবং যান বাহন ও অট্টালিকায় শয়ন প্রভৃতিতে যে সুখানুভব হয় তাহা নিতান্ত ক্ষণ-ধ্বংসী; এবং কষ্টে তাহার আহরণ করিতে হয়। তাহা আপাততঃ রমণীয় অথচ পরকাল বিরোধী; যেমন বড়শীর সহিত আহার্য্য দ্রব্য দেওয়াতে মীন তাহা গ্রাস করিয়া প্রথমতঃ সুখী হইতে থাকে; কিন্তু পশ্চাৎ বড়শীর দ্বারা প্রাণত্যাগ করে। এবং যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি দৃষ্টে পতঙ্গ পতিত হয়, সে পতিত হইবার পূর্ব্বে সুখানুভব করে (নতুবা পতিত হইবে কেন) কিন্তু পরিশেষে দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ সাংসারিক সুখ পরকাল বিরোধী জানিবে। যদি বল যে, চিরকাল পর্য্যন্ত রোগ শোক বর্জ্জিত হইয়া কোন ব্যক্তি নানা প্রকার বস্তু উপভোগ করে তাহাকে সুখী বলা যায়? কিন্তু তাহা কদাপি কাহারও হয় না; কারণ মনুষ্য মাত্রেরই কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য আছে; তাহাতে কোন ক্রমেই সর্ব্বক্ষণ সুখী হইতে পারে না; এবং আকল্প পর্য্যন্তও কেহ জীবিত থাকে না; জীবন অতি ক্ষণ-ধ্বংসী; যদিচ কিয়ৎদিন ঐ রূপ ঘটনা হয় তাহাও

* পুত্র মূর্খ হইলে যন্ত্রণা ও পণ্ডিত এবং উপার্জ্জক হইলে সর্ব্বদা তাহার মৃত্যু আশঙ্কা হয় এবং রোগাক্রান্ত হইলে কষ্ট ভোগ করিতে থাকে।

সুখের কারণ নহে। কেননা আহার নিদ্রা মৈথুনাদি বিষয় উপভোগের সীমা নাই, বরং অনলে ঘৃত প্রদান করিলে যেপ্রকার অনল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে তদ্রূপ বিষয় উপভোগ যত কর তাহাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বিষয়াসক্ত প্রযুক্ত পরকালের শুভ চেষ্টা এককালীন রহিত হইতে থাকে; কেবল পশুর ন্যায় জন্ম যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ফলতঃ মৃত্যু নিশ্চয় হইবেক তাহার যাতনা, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণে, গর্ব্ভযাতনা প্রভৃতি নানা প্রকার যাতনা নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবেক; তবে কি জন্য এক দ্রব্য প্রত্যহ ভোগ করিয়া সুখানুভব করা যায়, তাহা বলিতে পারি না। যদি মৃত্যু না হইত, অথবা এক দ্রব্য একবার ব্যবহার করিয়া চিরকালের জন্যে তৃপ্তিলাভ করা যাইতে পারিত; তবে বিষয় ভোগকে সুখ বলা যাইত। অতএব বিষয় ভোগ কেবল আপাত রমণীয়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় তাহার আব সন্দেহ নাই। এই বিষয় যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে সুব্যক্ত করা হইয়াছে। যদি বল যে, লোকে ইহা জানিয়াও কিজন্যে সংসার পরিত্যাগ করে না?* তাহার কারণ কেবল ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া লোকে সংসার পরিত্যাগ করিতে পারে না। যদি কেহ ঐ মায়া হইতে পবিত্রান লাভ করিতে পারে, তবে তাহার মুক্তি হয়; কিন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্যতীত ঐ মায়ার বিনাশ হয় না। অতএব ঐ ব্রহ্মজ্ঞান কি; যাহাতে ভগবানের মায়া হইতে লোকে উদ্ধার হইতে পারে; তাহা বিবেচনা করা যাউক্।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান কি তাহা নির্ণয়।

ব্রহ্মজ্ঞান এই যে, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ মায়া দ্বারা কল্পিত বিধায় এই জগৎ মিথ্যা; কেবল অদ্বৈত শক্তিমান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সত্য; অতএব জীবও ব্রহ্ম হইতেছে; সুতরাং

* সংসার পবিত্যাগ কবিযা উদাসীন হওয়া অথবা আসক্তি পরিত্যাগ করা এই উভয়কে সংসার পরিত্যাগ বলা যায়।

আমিও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই*। এই অপরোক্ষ ব্রহ্ম-জ্ঞান ইহার দ্বারা সমুদায় সাংসারিক যাতনা এককালীন নিবারণ হয়; ইহাই মহাত্মারা শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনার নাম সংসার; ঐ জ্ঞান রহিত হইয়া সত্য-জ্ঞান অর্থাৎ পরমেশ্বরই সত্য আর সকলই মিথ্যা; এই মিথ্যা বস্তুতে বাসনা করাও মিথ্যা; এইরূপ জ্ঞান হইলে সংসার হইতে নিবর্ত্ত হয়। দৃশ্যমান্ জগৎ কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে? তদ্বিষয়ের মীমাংসা এই যে, বেদে আছে এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময়†। ইহা চারি প্রকার সামানাধিকরণ্যের অর্থের দ্বারা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ রূপে নির্ণয় করা হইয়াছে! ঐ সামানাধি-করণ্য এই, বিশেষ্য বিশেষণ সামানাধিকরণ্য, ঐক্য সামানাধিকরণ্য, অধ্যাস সামানামিকরণ্য ও বাধ সামানাধিকরণ্য। বিশেষ্য বিশেষণ অর্থাৎ ব্রহ্ম বিশিষ্ট এই সমুদায় জগৎ; তাহাতে সমুদায় পদার্থেই ব্রহ্ম আছেন। এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা সাংখ্য মতের সহিত ঐক্য হইতে পারে; কেন না ঐ মতে আছে যে, পদার্থ সকল জড়া প্রকৃতি এবং চৈতন্য পুরুষ। ইহা যোগ হইয়া এই জগৎ হইয়াছে; এবং বিদ্যমান আছে। তাহাতে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্ন জ্ঞান করিতে পারিলে ব্রহ্ম জ্ঞান হয়। যেমন জলের সহিত মীন পৃথক্ ভাবে থাকে, তদ্রূপ জড়ের সহিত চৈতন্যময় আত্মা পৃথক্‌রূপে আছেন। ঐ আত্মা চৈতন্য, দেহ ব্যতীত উপলব্ধি হয় না বটে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তিনি সমুদায় বস্তুতেই আছেন। তাহা জানিবার জন্য বেদান্ত মতের সহিত ঐক্য করিয়া অন্য তিন প্রকার সামানাধিকরণ্যের মীমাংসা করা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ঐক্য সামানাধিকরণ্যের অর্থ এই যে, এই জগতের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য অর্থাৎ অভিন্নতা আছে। যেমন স্বর্ণের কুণ্ডল ও মৃত্তিকার ঘট সমুদ্রের ঊর্ম্মীমালা অর্থাৎ ঢেউ এবং জলবিম্ব এই সকল বস্তু যেরূপ স্বকীয় বস্তুর বিকার ব্যতীত ভিন্ন বস্তু নহে; তদ্রূপ ব্রহ্ম নিমিত্ত এবং সহকারী ও উপদান কারণ হও-

---

* আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং মায়য়া কলপিতো জগৎ। ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব কেবলং। ইতি শঙ্করাচার্য্য ধৃতং।

† সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

যাতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে আছে ; সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন, আর কিছুই নহে। যদি বল যে, ব্যবহারে জড় ও চৈতন্য ভিন্ন ভাব দেখা যায়, এবং জড়ের সহিত চৈতন্যের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অর্থাৎ মিশ্রিত ভাব নাই? তজ্জন্য অধ্যাস সামানাধিকরণ্যের মীমাংসা করা হইতেছে ; তাহার অর্থ এই যে, দৃশ্যমান জড় বস্তু সকল চৈতন্যতে অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ অথবা কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ কোন পদার্থই নহে ; যেমন রজ্জুতে সর্প, ও শুক্তিতে রজত, এবং মৃগতৃষ্ণা অর্থাৎ মরীচিকাতে জল ভ্রম হয়, তদ্রূপ পর ব্রহ্ম চৈতন্যে জড়রূপ জগৎ আরোপ হইয়াছে ; ভ্রম প্রযুক্ত তাহা দ্রব্যরূপে প্রতীয়মান হয় ; বাস্তবিক তাহা কোন বস্তুই নহে। তবে পূর্ব্বে যে, এই জগতের উপাদান কারণ পরমেশ্বরকে বলা হইয়াছে ; তাহা বিবর্ত্ত উপাদান অর্থাৎ মায়িক ও মিথ্যা ; যেরূপ ইন্দ্রজাল বিদ্যা অর্থাৎ ভোজবাজীর দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীতি জন্মে ; তদ্রূপ পরমেশ্বরীয় মায়া কর্ত্তৃক এই জগৎ উৎপত্তি হইয়া চৈতন্য বস্তুতে জড়ের আরোপ হওয়াতে তাহা বস্তুরূপে প্রতীতি হইতেছে। ফলতঃ যাহারা ইন্দ্রজাল বিদ্যা না জানেন তাঁহারা তাহার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য বোধ করেন ; আর যাহারা ঐ বিদ্যা জানেন তাহারা মিথ্যা বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন ; তদ্রূপ অজ্ঞানীরা এই জগতের দৃশ্য জড় বস্তু সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন; জ্ঞানীরা ইহা মিথ্যা ও আরোপিত বলিয়া জানেন। ফলতঃ ইহা দীর্ঘস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান মাত্র বস্তুত কিছুই নহে। ইহা বস্তুবিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বাধ সামানাধিকরণ্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; অর্থাৎ এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই ; ভ্রম প্রযুক্ত ব্যবহারে যাহা দেখা যায়, তাহা কিছুই নহে কেবল এই জগৎ ব্রহ্মময় যেহেতু শক্তিমান চৈতন্য নিত্য পদার্থ তিনি কারণরূপে মুখ্যগুণ গুণ পদার্থে ; এবং ঐ গুণ ভৌতিক জড়পদার্থে দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়াছে। এতাবতায় সমুদায় পদার্থেই কারণরূপে বস্তুর সর্ব্বাবয়বে শক্তিমচ্চৈতন্য আছেন ; তাহা অবশ্যই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে পঞ্চভূত রূপ জড়ের সর্ব্বাবয়বে যে শব্দাদিগুণ আছে তাহাতে

ঐ জড় কেবল গুণময় পদার্থ মাত্র*। তদ্রূপ গুণের সর্ব্বাবয়বে শক্তিমচ্চৈতন্য আছেন তাহাতে সমুদায় বস্তুই শক্তিমচ্চৈতন্য; তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে শক্তি অব্যক্ত এবং অব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্য অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র পদার্থই সিদ্ধান্ত হয়। অতএব সমুদায় বস্তু আর কিছুই নহে, তাহা কেবল অব্যক্ত শক্তিমচ্চৈতন্যময় অর্থাৎ ব্রহ্মময় মাত্র। এইরূপ জ্ঞানকেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়। এই বিষয় সৃষ্টি ও প্রলয় এবং পদার্থ বিচার প্রকরণে অধিক ব্যক্ত আছে, তদ্দৃষ্টে জানা যাইতে পারিবেক, এই জ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ স্বীয় দেহস্থিত আত্মার অনুসন্ধান করিতে হয় নতুবা জানা যায় না; এই বিষয় জানিবার জন্য বেদের চারিটী মহামন্ত্র দ্বারা আত্মার স্বরূপের প্রত্যক্ষ হইতে পারে।† এই মন্ত্রের সারার্থ গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেওয়াতে শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল। প্রথমতঃ গুরু বলেন যে, প্রজ্ঞান আনন্দ যে জীব তিনিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ শরীরস্থ জীবাত্মাই ব্রহ্ম। শিষ্য বলিলেন জীব কি? গুরু বলিলেন এই আত্মাই জীব এবং আত্মাই ব্রহ্ম। তাহাতে শিষ্য আত্মা কি অর্থাৎ শরীরের মধ্যে আত্মা কোন পদার্থ তাহা বুঝিতে না পারায় ব্রহ্ম কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পরে গুরু বলিলেন যে, তুমিই আত্মা ও তুমিই ব্রহ্ম। এই তুমি শব্দের প্রতিপাদ্য যে বস্তু তাহাই ব্রহ্ম। তাহাতে শিষ্য বিবেচনা করিলেন যে, তবে আমিই ব্রহ্ম। কেননা আমি স্থূলদেহ নহি, এবং দেহস্থিত গুণ পদার্থও নহি আমিই সেই চৈতন্য অর্থাৎ দেহের মধ্যে আমি যে জ্ঞান পদার্থ তাহাই ব্রহ্ম; এবং ঐ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। কিন্তু জ্ঞান কোন কার্য্য করেন না অথচ মূল কর্ত্তা; যেমন প্রদীপের আলোকে লোকে কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহার মূল কর্ত্তা প্রদীপ কিন্তু কার্য্যের কর্ত্তা প্রদীপ নহে; কেননা প্রদীপ ব্যতীত কোন কার্য্য হয়

---

* এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের চতুর্থ অধ্যায় দৃষ্ট কর।

† প্রজ্ঞানমানন্দ ব্রহ্ম।	ঋকবেদ।	অর্থ। জীবই ব্রহ্ম।
অয়মাত্মা ব্রহ্ম।	যজু।	" আত্মাই ব্রহ্ম।
তত্ত্বমসি।	সাম।	" তুমিই ব্রহ্ম।
অহং ব্রহ্মাস্মি।	অথর্ব্ব	" আমিই ব্রহ্ম।

না অথচ প্রদীপ নিজে কিছু করেন না। তদ্রূপ জ্ঞানময় আমি নিজে করি না, আমাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে আশ্রয় কবিয়া মন বুদ্ধি প্রভৃতিরা কার্য্য করিতেছেন; সুতরাং আমি কার্য্যের কর্ত্তা নহি; আমি মূলকর্ত্তা অথচ কার্য্য বিষয়ে অকর্ত্তা। তবে আমি অজ্ঞান অবস্থায় যে আমাকে আমি ভাবিয়াছিলাম সে আমি প্রকৃত আমি নহি; সে আমি মিথ্যা কেবল কাল্পনিক আমি; ও তাহাতে আমি যে কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া ভান করিয়াছি এবং সুখ দুঃখ ও পাপ পুণ্যাদি অনুভব করিয়াছি তাহাও মিথ্যা; বাস্তবিক আমি সুখী নহি ও দুঃখী নহি ও পাপপুণ্যে লিপ্ত নহি যেরূপ পদ্মপত্রস্থিত জল ঐ পত্রে লিপ্ত হয় না। আমিও তদ্রূপ অলিপ্ত; অতএব আমিই ব্রহ্ম; ঐ ব্রহ্মই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তাঁহা হইতে এই মায়িক জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে। আমিই সর্ব্বত্র ব্যাপী আমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা শিষ্যের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল। যদি বল যে, দেহস্থিত আত্মাকে জানিয়া যে, আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিয়া শিষ্যের জ্ঞান হইয়াছিল ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, বস্তুর এক দেশ নির্দ্দিষ্ট হইলেই তাহার স্বরূপ জানা যাইতে পারে। যেমন বৃহৎ জলময় পদার্থ সমুদ্র, তাহার এক দেশ দেখিলে জানা যায় যে, সমুদ্রের সর্ব্বত্রই কেবল জলময় মাত্র তাহার সর্ব্বস্থান না দেখিলেও সমুদ্র দেখা সত্য হয়, তদ্রূপ অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্যের একদেশ অর্থাৎ দেহস্থিত আত্মার প্রত্যক্ষ হইলেই সমুদায় প্রত্যক্ষ হয়। যেরূপ মহাকাশ ও ঘটাকাশ একবস্তু কেবল উপাধিভেদে বিভিন্ন নাম মাত্র। ফলিতার্থে ঐ ঘট ভগ্ন হইলে উভয় আকাশই এক আকাশ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তদ্রূপ দেহস্থিত আত্মা অর্থাৎ জ্ঞান, অজ্ঞানে আবৃত থাকায় জন্তু সকল ভ্রান্ত হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ অজ্ঞানরূপ ঘটের বিনাশ হইলে একই অখণ্ড চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না অতএব দেহস্থিত আত্মার দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই আমি যে সর্ব্বব্যাপী আত্মা তাহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে। অতএব যেমন মধুর মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে অন্য মিষ্টদ্রব্যের প্রয়োজন হয় না; ও দীপ দর্শন করিতে হইলে দীপান্তরের প্রয়োজন থাকে

না; তদ্রূপ নির্ম্মল মনের দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে;* অন্য বস্তুর প্রয়োজন থাকে না মনঃপ্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হইলেই ঐ মনঃ আত্মাকারাকারিত হইয়া যায়। অর্থাৎ মনের মল কেবল নানাপ্রকার বাসনাকে বলা যায়; যদি বিবেকের দ্বারা ঐ বাসনা রহিত হয়; তবে সুতরাং মনঃ আত্মাতে লয় হইয়া কেবল আত্মা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ঐ মন কি প্রকারে নির্ম্মল হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাহার উপায় কি তদ্বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় নির্ণয়।

ভগবতীগীতায় আছে যে, যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি জন্মায়; এবং ভক্তিতেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে ঐ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে; উপাসনা দ্বারা জ্ঞান জন্মে না; ইহা সত্য বটে যে, জ্ঞানশাস্ত্র আলোচনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু কেবল শাস্ত্র আলোচনা করিলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে না; এবং ঐ জ্ঞান ধারণাও হয় না, তবে কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে গুরুর নিকট শাস্ত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করতঃ ঐ জ্ঞান ধারণা হইতে পারে। তাহাতে মুক্তি লাভ হয় নতুবা চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান ধাবণা হয় না। তবে যদি কাহার শাস্ত্রে আলোচনার দ্বারা ঐ জ্ঞান হয়, তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম করিয়া চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়াছিল; ইতিমধ্যে দেহ-ত্যাগ হওয়ায়, ঐ পূর্ব্বকর্ম্ম প্রারব্ধ স্বরূপ হইয়া আছে; কেবল বেদান্তাদি শাস্ত্র বিচার করতঃ বস্তুর স্বরূপ অবগত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত ও ধারণা করিয়া মুক্তি লাভ করে†। নতুবা কেবল শাস্ত্র বিষয়ক তর্কের দ্বারা ফল

---

* মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক ও তাহার টিপ্পনী দৃষ্ট কর।

† ভগবদ্গীতায় আছে যে, বহু জন্মান্তে জ্ঞানবান্ হইয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। এবং যোগ ভ্রষ্ট হইলে যোগীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ব যোগ প্রাপ্ত হয়।

লাভ করিতে পারে না। যদি উপাসনা ও শাস্ত্র আলোচনা উভয় কার্য্য করিতে পারে তবে অতি শীঘ্র ফল প্রাপ্তি হয়। যেমন স্রোতাভিমুখে নৌকা চালনের সময় যদি বাহকেরা নৌকাদণ্ড দ্বারা বাহন কার্য্য করে, তবে অতি শীঘ্র অভিমত স্থানে যাওয়া যায়; এবং সুবাতাসে পাইল্ উঠাইয়া দিতে পারিলে আরও শীঘ্র যাইতে পারে; তদ্রূপ গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রে আলোচনা এবং উপাসনার দ্বারা অতি শীঘ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। নতুবা জল স্রোতের বিপরীত দিগে গমনের ন্যায় বহু কষ্টে কেবল বাহক কার্য্যের দ্বারা বিলম্বে অভিমত স্থানে যাওয়ার ন্যায়, উপাসনা ব্যতীত কেবল শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা হইতে পারে *। অতএব কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ করতঃ শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হইবার বিষয় যাহা বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে তাহাই শাস্ত্র, এবং যুক্তি সিদ্ধ বটে; তবে জ্ঞান লাভ হইলে আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না। যেমন নদী পার গমন করিবার জন্য নৌকার প্রয়োজন হয়; কিন্তু পার হইলে তীরে আর নৌকা চালনের প্রয়োজন থাকে না; তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া জীবন্মুক্ততা প্রাপ্ত হইলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না; তাহার কর্ম্মত্যাগ হইয়া বিশ্রাম সুখ লাভ হয়। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া ঐ জ্ঞান ধারণা না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করা আবশ্যক। ফলতঃ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। যেমন চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইলে কণ্টক-দ্বারা তাহা বাহির করিয়া নিরাময় হইতে পারে; তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা সংসারে আবদ্ধ জীব আবার কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু কর্ম্মের কৌশল জ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম করা আবশ্যক; কেননা যে কর্ম্ম-দ্বারা জীব বদ্ধ হইয়া সংসার যাতনা ভোগ করিতে থাকে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ছয় প্রকার; যথা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ, নৈমিত্তিক-নিত্য, নৈমিত্তিক-কাম্য। নিত্যকর্ম্ম, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা এবং পঞ্চযজ্ঞ

---

* কেবল শাস্ত্রালোচনা দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা ভক্তি ও উপাসনা ভিন্ন পরে থাকে না, যেমন কূপ খননে প্রথম চোঁয়া জল উঠে পরে শুখাইয়া যায় যদি উনুই উঠাইতে পারে তবে তাহা ক্ষয় হয় না তদ্রূপ ভক্তি-যুক্ত-জ্ঞানের ক্ষয় নাই।

অর্থাৎ বেদমন্ত্র পাঠ, হোম, অতিথি-সেবা, তর্পণ, নিত্যশ্রাদ্ধ, বলিবশ্ব, ও শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য ও শক্তি দেবী ; এবং ইষ্টদেবতা পূজা ইত্যাদি যাহা প্রত্যহ করিবার বিধি আছে তাহা। নৈমিত্তিক কর্ম্ম ; প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রতাদি ও তীর্থ স্নান, নাম সংকীর্ত্তনাদি পাপক্ষয় নিমিত্তক কর্ম্ম, ও দেবতা প্রতিষ্ঠা, মঠ এবং বৃক্ষ ও পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্টা, পীড়া জন্য স্বস্ত্যয়নাদি, গ্রহণ জন্য শ্রাদ্ধ ও পুরশ্চরণ প্রভৃতি নিমিত্ত জন্য যে, সকল কার্য্য করা যায় তাহা। কাম্য কর্ম্ম স্বর্গাদি কামনা পূর্ব্বক যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি যাহা করা যায় তাহা। নিষিদ্ধ কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি হত্যা ও অবৈধ হিংসা, এবং অসত্য কথন ও চৌর্য্য পারদারিক প্রভৃতি শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল। নৈমিত্তিক নিত্য পিতৃ শ্রাদ্ধ ও পুত্রেষ্টি যাগ ও পুত্র কন্যার বিবাহাদি সংস্কার, এবং একাদশ্যুপবাসাদি, এবং দুর্গোৎসব প্রভৃতি তিথি বিশেষে অথবা ঘটনা বিশেষে যে কর্ম্মের আবশ্যক শাস্ত্রে বিধি বদ্ধ হইয়াছে তাহা*। নৈমিত্তিক কাম্য, রিপুজয় প্রভৃতি অভিষ্ট সিদ্ধি কামনায় মারণ উচাটন বশীকরণ স্তম্ভন মোহন আকর্ষণ প্রভৃতি যাহা কামনা পূর্ব্বক করা যায় তাহা। ইহার মধ্যে কাম্য ও নিষিদ্ধ ও নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মসকল বন্ধজনক বিধায় তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবর্ণাশ্রমানুসারে নিত্য ; নৈমিত্তক, এবং নৈমিত্তিক নিত্য, কর্ম্ম সকল চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত আবশ্যক, তাহাতে স্বর্গাদি ফল কামনা করা কর্ত্তব্য নহে। যদিচ কামনা ব্যতীত কোন কর্ম্মই হইতে পারে না, কিন্তু শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের প্রীতি কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধকর হয় না ও ঐ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিলে মুক্তি কালে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না। যদি কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ মুক্তি লাভ না হয় তবে ঐ কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল সকল ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া ভোগ হয় ; তনন্তর জন্মগ্রহণ করতঃ উত্তম প্রবৃত্তি হইতে থাকে এবং পীড়ার উপশম জন্য স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্ম ও পাপক্ষয় জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও তৎ ফলে পর্য্যাপ্ত হয় ; তাহা বন্ধকর হয় না। পিতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম, পিতৃ লোকের তৃপ্তি সাধন হয় ; তাহা বন্ধকর নহে। কেবল স্বর্গাদি কামনা পরতন্ত্র

* বিধবার পক্ষে একাদশীর উপবাস নিত্য অলঙ্ঘনীয়। কারণ ইহা ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত প্রধান রূপে ঈশ্বরের উপাসনা এই তিথির মাহাত্ম্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হইয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাও নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল বন্ধকর হয় ইহাই শাস্ত্রকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব চিত্ত শুদ্ধির জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক এবং নৈমিত্তিক নিত্য কর্ম্ম করা আবশ্যক। ও ঈশ্বরের ভক্তি হইবার নিমিত্ত সগুণ ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি অর্থাৎ শক্তি ও শিব ও বিষ্ণু এবং সূর্য্য ও গণেশ ইঁহাদিগের কোন এক স্থূল মূর্ত্তির উপাসনা করা বিধেয়। ঐ উপাসনা এই রূপে করিতে হয় যে, প্রথমতঃ গুরুদেবের নিকট ঐ ঐ দেবতার মন্ত্র গ্রহণ* করতঃ নিত্য সন্ধ্যা ও ইষ্টদেবতার নিত্য পূজার অতিরিক্ত ঐ ইষ্ট দেবতার উপাসনা অর্থাৎ তাহাতে চিত্ত অর্পণ ও তদ্গত প্রাণ ও তন্নাম সংকীর্ত্তন ও শ্রবণ ও তদ্‌গুণ গান করণ ও শ্রবণ ও কথন ও মনন ও মন্ত্র অথবা নাম জপ এবং রূপ চিন্তা† এবং ঐ দেবতার সূক্ষ্ম রূপ জানিবার জন্য পুরাণাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়ন ইত্যাদির দ্বারা ভক্তি লাভ হয়। এই রূপ ভক্তি যোগ দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইলে তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইবার সম্ভব আছে। যদি বল যে, বাসনাত্মক মন তাহার বাসনা ক্ষয় না হইলে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে না; কারণ বাসনা হইতে কর্ম্ম-সূত্র উদ্ভব হয় তদ্দ্বারা আগামী ও সঞ্চিত কর্ম্ম সকল হইতে থাকে। এবং ঐ কর্ম্মের দ্বারা যে প্রারব্ধ জন্মায় তাহাও ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না তবে কি প্রকারে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, দৃঢ় প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ হইতে থাকুক্ কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সঞ্চিত পাপক্ষয় করা যায়; এবং নিত্য নৈমিত্তিক আদি কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি জন্য যে পাপ হইতে পারিত তাহা নিবারণ এবং আনুসাঙ্গিক পুণ্য হয় এবং তৎ পুণ্য ও সঞ্চিত পুণ্য কর্ম্মের বিনিময়ে ঈশ্বরে ভক্তি জন্মাইতে থাকে; কেননা তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী না হওয়ায় সুতরাং ঐ কর্ম্ম বিনিময় স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরে ভক্তি হইতে পারে। তদনন্তর বিবেক বৈরাগ্য ও ক্ষমা ধৈর্য্য পরিচালন পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিলে ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি জন্মাইয়া

* অর্থাৎ কুল গুরুর নিকট কুলদেবতার মন্ত্র গ্রহণ। কিন্তু মূর্খ ও পতিতের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

† ভাগবতে, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্ম সমর্পণ,। ইহার মূল, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, একাদশীতত্ব ধৃত। রোদন, হসন, নৃত্য, ধুলিমুক্ষণাদি উন্মত্ত প্রায়।

মনের একাগ্রতা ও ভাবি অনিষ্ট জনক বিষয় বাসনা রহিত হইয়া ক্রমশঃ জ্ঞান লাভ হইতে পারে*। যদি স্বয়ং বিবেক বৈরাগ্য পরিচালনে অসমর্থ হয় তবে সাধু সঙ্গে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। কি প্রকারে বিবেক বৈরাগ্যাদি পরিচালন করিতে হয় তাহা এই যে, চঞ্চল মনঃ যে যে স্থানে যাউক তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া ঈশ্বরে অর্পণ করা হইলে মন স্থির হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বাসনাত্মক মনকে কোন একটী বাসনাত্মক কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সে অবশ্যই স্থির হইতে পারে; সুতরাং মনঃ যদি মুক্তি লাভের বাসনায় ঈশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকে তবে অন্য বাসনা রহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুস্থির হয়। কিন্তু ইহার প্রতিবন্ধককারী ইন্দ্রিয়গণ ও ষড় রিপু; তজ্জন্য বিবেকাদি দ্বারা মনকে সুশিক্ষিত করিয়া ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে দমন, অর্থাৎ স্ববশে আনিতে হয়। যেরূপ সুশিক্ষিত সারথি অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়া অশিক্ষিত অশ্বগণকে কশাঘাত পূর্ব্বক আপনার রথকে অভিমত স্থানে লইয়া যাইতে পারে; এবং অশিক্ষিত সারথি সুচারু রূপে অশ্বগণকে চালাইতে পারে না; বরং সময় সময় গর্ত্তে পতিত হইয়া কষ্ট পায়। তদ্রূপ সুশিক্ষিত মনঃ ইন্দ্রিয় ও রিপুরূপ অশ্বগণকে বিবেক রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ করিয়া বৈরাগ্য ক্ষমা ও ধৈর্য্য রূপ কশাঘাত করতঃ দেহ রূপ রথ চালনা করিতে থাকিলে অভিমত স্থানে যাইতে পারে; অর্থাৎ মনের একাগ্রতা লাভ করিতে পারে। নতুবা মনঃ অশিক্ষিত হইলে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ সর্ব্বদা কুপথে লইয়া যাইতে থাকায় সময়ে সময়ে মোহগর্ত্তে নিপতিত করে। বিবেক বৈরাগ্য ও ক্ষমা ধৈর্য্য অবলম্বনে ইন্দ্রিয় এবং রিপুগণকে স্ববশে অনিবার প্রণালী এই যে, চক্ষুর স্বভাব দর্শন করা তাহাতে পরস্ত্রী দর্শনে কাম রিপুর উদ্রেক হইয়া বিকার উপস্থিত হইলে বিবেকের দ্বারা এই রূপ মীমাংসা করিতে হয় যে, এই কার্য্য অতিশয় মন্দ; কেননা পরস্ত্রী গমন পাপ কার্য্য এবং দৈহিক কষ্টের কারণ হইবেক। ও বৈরাগ্য পরিচালনে এই রূপ নির্ণয় হয় যে, ঐ স্ত্রী অতি ঘৃণিত বস্তু তৎক্রমে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে ধৈর্য্য হওয়াই উচিত; ইহার দ্বারা চক্ষু এবং উপস্থ ইন্দ্রিয় এবং কাম রিপুর দমন হইতে

* বিবেক, ভাল মন্দ বিচার, বৈরাগ্য, সংসারে ঘৃণা, ক্ষমা, অপকারীর অপকার করিতে সক্ষম থাকিয়া ও তাহা না করা, ধৈর্য, ক্রোধাদি রিপু বেগ সাম্য করা।

পারে। তদ্রূপ কর্ণের দ্বারা পর নিন্দা নিজ নিন্দা ও ঈশ্বরের নিন্দা এবং গুরু নিন্দা ও কটুবাক্য শ্রবণে ক্রোধ, রিপুর উদ্রেক হইলে বিবেক দ্বারা নির্ণয় হয় যে, ক্রোধ অতিশয় অপকারী; এবং বৈরাগ্য দ্বারা নির্ণয় হয় যে, নিন্দাতে শরীরের কিছু ক্ষতি নাই অতএব নিন্দুক্‌কে ক্ষমা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করাই উচিত; তাহাতে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং ক্রোধরিপুর শান্তি হইতে পারে। এইরূপ হস্ত দ্বারা পরধন গ্রহণ ও হিংসাদি এবং রসনার দ্বারা অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান না করিলে হস্ত এবং রসনেন্দ্রিয় ও লোভ রিপুর দমন হইতে পারে। চরণের দ্বারা গুরুতর ব্যক্তিকে ও দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতিতে আঘাত না করায় পাদেন্দ্রিয় দমন হইতে পারে; বিশেষতঃ পাপকার্য্যে অথবা পাপস্থানে গমন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে থাকিলে ক্রমাধীন পাপবিষয়ে বিস্মৃত হইতে থাকায় পাদেন্দ্রিয় ও মোহরিপুর দমন হইয়া যায়। যাহাতে কামের উদ্রেক বৃদ্ধি হয় এ রূপ অবৈধ দ্রব্যাদি অঙ্গে লেপন না করিলে ত্বগিন্দ্রিয়কে বশীভূত করা যায়। দেবস্থান ও যাগ স্থান এবং সভাস্থান ও অন্যান্য প্রকার পবিত্র স্থানে মল মূত্র ও অধোবায়ু নিঃসরণ না করিলে পায্বিন্দ্রিয় অর্থাৎ গুহ্য ইন্দ্রিয় দমন হয়। এবং পরস্ত্রীর সহিত কামভাবে আলাপ না কবিলে কামবেগ উদ্রেক হইতে পারে না; তাহাতে উপস্থেন্দ্রিয় দমন ও তদ্বারা মদরিপু যাহাতে মত্ততা জন্মে সেই রিপুর শান্তি হয়। এবং ধন অথবা বিদ্যা হইলে তাহাতে গর্ব্বিত হইয়া কটুবাক্য ও মিথ্যাবাক্য এবং গর্ব্বযুক্ত বাক্য না বলিলে বাগিন্দ্রিয় এবং মাৎসর্য্য রিপুর দমন হয়। দুর্গন্ধি দ্রব্য অথবা পরস্ত্রীর গাত্রের পরিমল আঘ্রাণ না হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দমন হয়। যদি সহজে উপরি উক্ত কার্য্য পরিচালন না করিতে পারে, তবে ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যান্তরে ও স্থানান্তরে নিযুক্ত করিতে হয়; অর্থাৎ স্বস্ত্রী দর্শন পরগুণ শ্রবণ দান ও সাত্ত্বিক বস্তু আহার সৎপথে ও সৎকার্য্য করণার্থে ভ্রমণ মল মূত্র বায়ু প্রভৃতি যথা স্থানে ত্যাগ এবং মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা শুচি ও স্বদারে নিরত থাকা এবং সুগন্ধি অথচ দোষ শূন্য বস্তুর আঘ্রাণ লওয়া এই সকল কর্ম্মের দ্বারা ঐ ঐ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা যায়। ও স্বদারে কাম এবং ক্রোধের প্রতি ক্রোধ, স্বীয় দ্রব্যে ন্যায্য রূপে লোভ, পাপ বিষয়ে মোহ

অর্থাৎ ভ্রম, ইষ্টদেবতার চরণ স্মরণে মত্ততা, এবং ঈশ্বর আছেন এই বিষয়ে গর্ব্ব প্রকাশের দ্বারা ঐ ঐ রিপুগণকে জয় করা যায়; ইহাতে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে বশীভূত করা যাইতে পারে। ইহা যেরূপ পরকালের উপকারী; তদ্রূপ ব্যবহার বিষয়েও উপকারী তাহার সন্দেহ নাই। পরন্তু জ্ঞান লাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পবিত্র ও বশীভূত করিবার বিশেষ একটী উপায় আছে; যথা দেবমূর্ত্তি দর্শনের দ্বারা চক্ষু, নাম জপ দ্বারা জিহ্বা, পূজার দ্বারা হস্ত, পুরাণাদি ও ঈশ্বরের নাম ও গুণানুবাদ শ্রবণের দ্বারা কর্ণ, তীর্থরজঃ এবং প্রসাদী চন্দন ও গঙ্গামৃত্তিকাদি লেপন দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয় এবং নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা বাগিন্দ্রিয়, নির্ম্মাল্য পুষ্পাদির আঘ্রাণ লওয়ার দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দেবতা প্রদক্ষিণ ও তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা পাদেন্দ্রিয়, এবং মল মূত্রাদি যথা স্থানে ত্যাগানন্তর জল মৃত্তিকাদির দ্বারা শুচি হইয়া উপাসনাদি-করণ-দ্বারা অপানেন্দ্রিয় দ্বয়কে পবিত্র ও বশীভূত করা যায়; সুতরাং এই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদাই বিবেক বৈরাগ্য ও ক্ষমা ধৈর্য্য পরিচালন করিলে মনের একাগ্রতা লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই রূপ আচরণ করেন তিনিই সাধু; এবং সাধুর নিকট উপদেশ গ্রহণ ও তাহার আচরণ দর্শন করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সে ব্যক্তিও সাধু হয়েন। অতএব এই কার্য্যকেই শম দম সাধন বলা যায়। ইহার দ্বারা অথবা তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত কুলকুণ্ডলিনী সাধনের দ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ হইলে, পশ্চাৎ নিত্য নিত্য বস্তু বিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য বস্তু; এবং তদ্ভিন্ন সকলই অনিত্য এই রূপ বিচার করিয়া মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া সর্ব্বদা সবিকল্পক সমাধি দ্বারা ঐ জ্ঞান ধারণা করিতে পারেন। যদি তাহাতে জ্ঞান ধারণা না হয় তবে তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি সহ্য করিবার নিমিত্ত বানপ্রস্থোপযুক্ত পঞ্চতপা ও জলস্তম্ভ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিয়া অবিরত ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান ধারণা হয়। ফলতঃ গৃহাশ্রমে থাকিয়া বেদান্ত ও পুরাণাদি শ্রবণ ও ঈশ্বর বিষয়ক মনন এবং অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবাহ রূপ নিদিধ্যাসন দ্বারা সবিকল্পক সমাধিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে তাহাই অগ্রে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি গৃহস্থা-

শ্রমে থাকিয়া ঐ কার্য্য ঘটনা না হয় তবে মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি বানপ্রস্থ* ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যার দ্বারা শরীরকে বশীভূত করিয়া ঐ আশ্রম অথবা গৃহস্থ আশ্রম হইতে বিধি পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম ত্যাগানন্তর দণ্ড গ্রহণ করিয়া উপরতি অর্থাৎ সন্ন্যাস† আশ্রম অবলম্বন করিবেক; তাহাতে শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন ও সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে‡ শ্রবণ অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ; মনন অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মচিন্তা; ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ঐ চিন্তার প্রবাহ। সমাধি দুই প্রকার সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক; সবিকল্পক অর্থাৎ জ্ঞান, ব্রহ্ম, জ্ঞাতা, জীব, জ্ঞেয় জড়াদি বস্তু সকল, এই ত্রিপুটী অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্ম বস্তুতে চিত্ত বৃত্তির অবস্থান। নির্ব্বিকল্পক সমাধি অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটীর লয় করণ দ্বারা আত্মাকারা করিত জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান না থাকে। বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়; এই প্রকার সাধনা দ্বারা চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল দ্বারা সমাধিতে থাকিতে না পারে তবে যোগশাস্ত্রসম্মত অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিতে হয়; যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সবিকল্পক সমাধি; এই যোগ অভ্যাস করিলে নিশ্চয় নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে স্থিতি করিতে পারে। যম, অহিংসা সত্য অচৌর্য্য ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ অর্থাৎ সঞ্চয় রহিত নিয়ম, শুচি সন্তোষ তপস্যা অধ্যয়ন ঈশ্বরেতে প্রণিধান। আসন, যোগশাস্ত্রোক্ত হটযোগের অন্তর্গত পদ্মাসনাদি। প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক রেচক রূপ প্রাণ দমনাদি। প্রত্যাহার শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ। ধারণা, তদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে মনের অভিনিবেশ। ধ্যান, ব্রহ্মবস্তুতে মনের প্রবাহ। সমাধি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদিচ স্বতন্ত্ররূপে যোগশাস্ত্রানুসারে এই অষ্টাঙ্গযোগ বলা হইল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শম দমাদি

* বানপ্রস্থ কলিতে নাই তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে তীর্থবাসে থাকিতে হয়।

† এক্ষণে তন্ত্রোক্ত সন্ন্যাস বিধি আছে, বৈদিক সন্ন্যাস নাই।

‡ এই আশ্রম দুই প্রকার অর্থাৎ বনে থাকিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন, অথবা পুত্রের গৃহে থাকিয়া তাহার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র গ্রহণ করিবেক। মনু ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯৫ শ্লোক তাৎপর্য্য শরীর রক্ষার্থে ভোজনে দোষ নাই।

ও শ্রবণ মননাদির সহিত ইহার কার্য্যতঃ ঐক্য আছে। এই যোগ দ্বারা অনিমা লঘিমা প্রভৃতি কাম্যযোগও সিদ্ধি হইয়া থাকে। ঋষিদিগের কাম্য-যোগ ও জ্ঞানযোগ দুই সিদ্ধি ছিল; তজ্জন্য তাঁহারা জগৎ পূজ্য ও ঈশ্বর তুল্য ছিলেন। কিন্তু কেবল মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের পক্ষে কাম্যযোগ কর্ম্মণ্য নহে; কেননা তাঁহারা তাহার ফল আকাঙ্ক্ষী নহেন; তবে শরীরকে অধিক কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন কি লোকে আশ্চর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় বটে; কিন্তু জ্ঞানীরা কোন আশ্চর্য্য দেখাইতে চাহেন না; তাঁহারা সমাধি অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন। যদি প্রারব্ধ বশতঃ সমাধি হইতে উত্থিত হইতে হয়; তবে তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করেন। পরে দেহ ত্যাগ হইলে নিশ্চয় মুক্তি লাভ হয়*। অতএব সমাধি হইতে উত্থিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলা যায়। এবং যিনি ভক্তি যোগের দ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ মননাদিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাকেও জ্ঞানী বলা যায়; তাঁহারও দেহান্তে মুক্তি লাভ হইবেক। ঐ জ্ঞানীদিগের চিহ্ন অর্থাৎ লক্ষণ কি তাহা বিবেচনা করা যাউক।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞানী কাহাকে বলে, তাহার নির্ণয়।

ভগবদগীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে যে, যে সময় কোন ব্যক্তির অর্থাৎ সাধকের মনোগত সমস্ত বাসনা রহিত হইয়া আত্মাতে আত্মতুষ্টি জন্মে, তখন তিনি জ্ঞানী হয়েন। এবং যাঁহার মনঃ দুঃখেতে উদ্বিগ্ন না হয়; এবং যাঁহার সুখেতে স্পৃহা না জন্মে ও বিষয়ে অনাসক্তি, এবং ভয় ক্রোধ পরিত্যাগ হয় তিনি জ্ঞানী হয়েন। এবং যিনি শত্রু মিত্র সমান জ্ঞান করেন ও শুভা-শুভ ঘটনা হইলে আনন্দ অথবা দ্বেষযুক্ত না হয়েন; এবং যাঁহার হেয় উপাদেয় কিছুই নাই; ও যিনি নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করেন; এবং

---

* সমাধিতে মনের স্বরূপ লয় হইলে দেহ ত্যাগ হয়। ও মনের বৃত্তি লয় হইলে পুনরু-দিত হইতে পারে সমাধির এই অবস্থা আছে।

কূর্ম্ম অর্থাৎ কচ্ছপ স্বীয় হস্ত পাদাদি ইচ্ছা পূর্ব্বক যেরূপ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করায়; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী। ইহার দ্বারা জ্ঞানীকে দেখিয়া তাঁহার বাহ্য অবস্থানুসারে প্রায় জ্ঞানী বলিয়া জানা যায় না; তবে যিনি জ্ঞানী হয়েন, তিনি আপনাকে আপনি জানিতে পারেন। কিন্তু কখন কখন কার্য্য দৃষ্টে এবং তাঁহার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইতে লাগিলে অন্যেরা তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া অনুভব করিতে পারে। যদি বল শাস্ত্রে আছে যে, জ্ঞানীদিগের কোন কর্ম্মই নাই তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগী ও বিধি নিষেধের বশীভূত নহেন, তবে তাঁহাদিগের কার্য্য দৃষ্টে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানী দুই শ্রেণিতে বিভক্ত; অর্থাৎ উদাসীন ও গৃহস্থ; তাহার মধ্যে যাঁহারা চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়া বিধিপূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগানন্তর সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয়, অর্থাৎ দণ্ড গ্রহণান্তর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া উত্থিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের কোন কর্ম্ম নাই; তাঁহারা পূর্ব্বেই বিধি পূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন; আর যাঁহারা দণ্ড গ্রহণ ব্যতীত কেবল সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া ঐ রূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ নহেন; এবং না করিলেও তাঁহাদিগের দোষ নাই। তবে লোক শিক্ষার্থে কেহ কেহ কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এই দুই প্রকার জ্ঞানীই একশ্রেণী অর্থাৎ উদাসীন শ্রেণি ভুক্ত বটেন; আর যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম রূপে ভক্তিযোগ সহকারে জ্ঞান লাভ করিয়া সংসার অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে আছেন; তাঁহারা জ্ঞানী হওয়ার পূর্ব্বাপর সমভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন; অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করেন তাহা চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা রূপ ভক্তির নিমিত্ত; তদনন্তর জ্ঞান হইলে লোক শিক্ষার নিমিত্তে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যদিচ তাহারা কর্ম্ম করিতে বদ্ধ নহেন তথাপি লোক শিক্ষার্থে কর্ম্ম করা তাহাদিগের অতীব কর্ত্তব্য।* ভগবদ্গীতার শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ

* সক্তাঃ কর্ম্মণ্য বিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহং। ভগবদ্গীতা ৩য় অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোক।

অর্থ। যেরূপ আসক্তি পূর্ব্বক অজ্ঞানীরা কর্ম্ম করে, লোক শিক্ষার্থে জ্ঞানীরা তদ্রূপ কর্ম্ম করিবেন কিন্তু আসক্তি না থাকে।

অজ্ঞানীরা আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে; তদ্রূপ অনাসক্ত হইয়া লোক শিক্ষার্থে জ্ঞানীরা কর্ম্ম করিবেন। ফলিতার্থে ঐ গীতা শাস্ত্রে আছে যে, জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলই নিষ্কামরূপে কর্ম্ম করিবেক; তদনন্তর জ্ঞান লাভ হইলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। এবং লোক শিক্ষার্থে কর্ম্ম করার প্রয়োজন আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গৃহস্থ জ্ঞানীরা অনাসক্ত রূপে লোক শিক্ষার্থে কর্ম্ম করিবেন।* দণ্ডীরা কোন কর্ম্ম করিবেন না; এবং কেবল উদাসীনেরা কর্ম্ম করিতে অথবা না করিতে বদ্ধ নহেন; অর্থাৎ তাহারা কোন বিধি নিষেধের অন্তর্গত নহেন; বাস্তবিক ইহাঁরা সকলেই জ্ঞানী, এবং সকলেই তুল্য রূপে মুক্তি লাভ করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ভগবদ্গীতার ৫ম অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে আছে যে, সাংখ্য অর্থাৎ সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিযোগ ইহা উভয় তুল্য ফলজনক। কেননা কর্ম্ম যোগীরা সাকার উপাসনা ও ঐ সাকারকে নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। এবং সন্ন্যাসীরা প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম ও সাকার ব্রহ্ম চিন্তা করতঃ তদনন্তর নিরাকার চিন্তায় প্রবর্ত্ত হইয়া, নিত্যানিত্য বস্তুবিচার, স্বর্গাদি কামনা বৃথা, এবং শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই রূপ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া শ্রবণ মননাদির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়েন। অতএব এই উভয় জ্ঞানীই তুল্য হইতেছেন। জ্ঞানীরা যে কর্ম্ম করেন তাহাতে তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করেন যে, কর্ত্তা, অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা ব্রহ্ম, এবং দ্রব্যও ব্রহ্ম, ও যাহাকে দেওয়া যায় তিনিও ব্রহ্ম ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। এইরূপ চিন্তাদ্বারা তাঁহারা কি সাংসারিক কি দৈব পৈত্র্যকর্ম্ম সকলই ব্রহ্মজ্ঞান সহকারে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্ম বন্ধকর নহে; কেননা জ্ঞানীদিগের কোন বাসনা নাই; এজন্য ভর্জ্জিত বীজের ন্যায়† তাঁহাদিগের কর্ম্ম ফলবান্ হয়না; তাহারা দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান থাকেন মাত্র; দেখিয়াও দেখেন না শুনিয়াও শোনেন না এই প্রকার জীবন্মৃত রূপে জীবন্মুক্ত জ্ঞানীরা বিচরণ

---

* জনবাদিরা।

† বীজ ভাজিলে তাহাতে অঙ্কুর হয় না।

করেন। এবং তাঁহারা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং গবি ও হস্তী শূনি স্বপাক, চণ্ডাল ইত্যাদি হেয় উপাদেয় সকল বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান করেন। কিন্তু পান ভোজনাদি বিষয়ে যথেচ্ছচার রূপে চলেন না। তবে কোন কোন পরমহংস যাঁহার এককালীন বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছে তাঁহাকে যিনি যাহা দেন তাহা তিনি আহার করেন। কিন্তু যদি তাঁহার ভেদজ্ঞান থাকে তবে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি করিলে তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায় না। এবং তিনি লোক শিক্ষার্থে উপদেষ্টাও হইতে পারেন না। কেন না যিনি গুরু হইবেন তাঁহার আচার ব্যবহার সম্মত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা যদি তাঁহারা অভক্ষ্য ভক্ষণাদি করতঃ পশুর ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে তাঁহাকে গুরু বলিয়া কে মান্য করিবেক। তবে পূর্ব্বোক্ত পরমহংস যাঁহারা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছেন তিনিও উপদেশ দেওয়ার পাত্র নহেন; কেননা বাহ্যজ্ঞান না থাকিলে উপদেশ দিতে পারেন না। এই কারণে জগতে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ এক-কালীন রহিত হয় বলিয়া জ্ঞানীরা ব্যবহার বিষয়ে সদাচাররূপে বিচরণ, ও কেহ কেহ অনাসক্তি রূপে কর্ম্মও করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া অভিমান করতঃ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান এবং অগম্যা গমনাদি ব্যবহার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী ব্যতীত কখনই জ্ঞানী নহেন। কেননা জ্ঞানী হইবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখান হইয়াছে; তাহাতে প্রকাশ আছে যে, শুদ্ধাচারী হইয়া নানা প্রকার সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়; নতুবা কোনক্রমেই হয় না। বাস্তবিক শারীরিক কষ্ট না করিলে ঈশ্বরের দয়া হওয়া সুকঠিন জানিবে। এমতস্থলে অনাচার অবস্থায় থাকিয়া কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া দুই চারিবার ঈশ্বরের নাম ও গুণানুবাদ বক্তৃতা এবং কএকটী সঙ্গীত গান করিলে যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় ইহা কদাচ সম্ভাব্য নহে; সে কেবল বৃথা পরিশ্রম মাত্র।* অতএব সংসার হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে হইলে বিষয় সম্ভোগ পরিত্যাগ ব্যতীত মুক্তির চেষ্টায় আসক্তি পূর্ব্বক বদ্ধকর বিষয় সম্ভোগ করিতে লাগিলে কখনই সিদ্ধি লাভ হয় না;

* যেমন ক্ষীণ পুত্রকে স্থূল করণের নিমিত্ত দুগ্ধ পান করার ব্যবস্থা হইলে একবার একগণ্ডুষ দুগ্ধ পান করাইয়া, জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি স্থূল হইতেছ? তদ্রূপ।

বরং তাহাতে আরও আসক্তি জন্মায়। যেমন পশ্চিম দিগস্থিত বস্তু আনয়ন করিতে হইলে, পূর্ব্ব দিগে গমন করিলে আরও দূর হইয়া পড়ে, তন্ন্যায় বিষয় ভোগীর মুক্তি লাভ হইয়া থাকে; অতএব বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই বিধেয়। তবে ভক্তিতে যে মুক্তিলাভ হয়, তাহা সদাচারে থাকিয়া বৈধ কর্ম্ম করিতে হয়; নতুবা হয় না; ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ বটে। এক্ষণে মুক্তি কি ও তাহা কত প্রকার, তাহা বিবেচনা করা যাইক।

পঞ্চম অধ্যায়।

মুক্তি কি ও তাহা কত প্রকার, তাহা নির্ণয়।

সাংখ্যদর্শনে আছে যে, আত্যন্তিক ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি; ও বেদান্তদর্শনে বলেন যে, নিত্য সুখ প্রাপ্তির নাম মুক্তি; ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের যে দুঃখ তাহা আত্যন্তিক রূপে নিবৃত্তি অর্থাৎ কখনই ঐ দুঃখ হইবেক না; সুতরাং নিত্য সুখ প্রাপ্তি হয়; তাহাকেই মুক্তি বলা যায়। বেদান্তের মতে নিত্য সুখ প্রাপ্তি; তাহাতেও দুঃখাভাব জানা যাইতেছে; অর্থাৎ দুঃখাভাব না হইলে নিত্য সুখ প্রাপ্তি হয় না, অতএব দুই মতই এক হইতেছে। ঐ দুইটী মত যোগ করিলে আরও স্পষ্ট মীমাংসা হইতে পারে যে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া নিত্য সুখ প্রাপ্তি হইলেই তাহাকে মুক্তি বলা যায়। মুক্তি হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না; এবং সংসার যাতনা আর ভোগ করিতে হয় না। মুক্তি চারি প্রকার,— কৈবল্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, এবং সালোক্য। এই কৈবল্য মুক্তিকে কেহ কেহ নির্ব্বাণ, ও কেহ কেহ সার্ষ্টি মুক্তি বলেন। এবং সালোক্য মুক্তিকে সামীপ্য-মুক্তি বলে। কৈবল্য মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী-দিগের দেহত্যাগানন্তর হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদিগের লিঙ্গ শরীর আর পরলোকে যায় না; তাহা স্ব স্ব কারণে লয়প্রাপ্ত হয়; কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হওয়াতে আর জীবের উৎক্রামণ অর্থাৎ স্থানান্তরিত হয় না ইহা বেদান্ত প্রভৃতি

সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত। অন্য তিনপ্রকার মুক্তি কর্ম্ম ফলে লাভ হয়।* অর্থাৎ সালোক্য মুক্তি যে ব্যক্তি যে দেবতার ভক্ত তাহার ঐ ভক্তি ফলে দেহ-ত্যাগানন্তর সেই সেই উপাস্য দেবতার লোক প্রাপ্তি হইয়া, তদনন্তর ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রাপ্তে ঐ ঐ দেবতার সহিত মহাপ্রলয়কালে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ কাল পর্য্যন্ত আর জন্ম গ্রহণ করে না ; এবং অবান্তর প্রলয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সাযুজ্য-মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের যোগ্যতা লাভ ; ইহা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের মধ্যে ঈশিত্ব-যোগের ফল ; ইহা অন্যান্য কর্ম্ম ফলেও লাভ হইতে পারে। ব্যাস, নারদ, বশিষ্ঠ, প্রভৃতিরা যোগ বলে ইহা লাভ করিয়া-ছিলেন। সারূপ্য মুক্তি ঈশ্বরের স্বরূপতা লাভ ; গঙ্গা জলে গঙ্গা জ্ঞান পূর্ব্বক মৃত্যু হইলে বিষ্ণুরূপধারী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ; তাহার পুনর্জন্ম হয় না ; অজ্ঞানে মরিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এবং কাশীতে জলে, অথবা স্থলে কাশী জ্ঞানে, অথবা কোন জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানাবস্থায় মরিলে শিবত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ শিব রূপ ধারণ পূর্ব্বক শিব-লোকে গমন করে ; ও অজ্ঞানী কীট পতঙ্গাদিও মুক্তি লাভ করে। কেহ কেহ বলেন যে, মহাদেব জ্ঞান প্রদান করাতে কৈবল্য-মুক্তি লাভ করে, ইহা একই কথা ; কেননা অন্য মুক্তিতেও পরিশেষে কৈবল্য হইবেক ; না হয় তৎক্ষণাৎ হইল। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, জলে স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে চরমকালে প্রাণত্যাগ হইলে ব্রহ্মলোকে গমন করে। কিন্তু অবৈধ আত্মঘাতীর মুক্তি লাভে সন্দেহ আছে। কেন না তাহারা ঈশ্বরের দ্বেষী প্রযুক্ত তাহাদিগের মুক্তি লাভ যুক্তি সঙ্গত নহে। এই প্রকার অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, (মায়াপুরী হরিদ্বার) কাঞ্চী, অবন্তিকা, দ্বারাবতী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে মৃত্যু হইলে মুক্তি লাভ হয় ; তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন অনেক অনেক সৎকর্ম্মের ফলেও কালিক মুক্তি লাভ হয়, অর্থাৎ কিছু কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বর লোকে বাস হয় ; তাহা স্বর্গ ভোগের ন্যায় ভোগ মাত্র। ফলিতার্থে মৃত্যুকালে যাহার যে প্রকার ভাব মনে উদয় হয়, তাহার তাহাই হইয়া থাকে ; মৃত্যু স্থান ও উপাসনা সহকারী কারণ মাত্র ; কেননা প্রারব্ধের ঘটনাতে মৃত্যু সময়ে মনের অন্য প্রকার

* এই তিন প্রকার মুক্তিতে জীবের লিঙ্গ শরীর অর্চ্চিরাদি মার্গে উৎক্রামণ হইয়া অভিষ্ট লোকে যায়। ভগবদ্গীতার ৮ম অধ্যায় ২৪শ শ্লোক।

চিন্তা হইলে তাহাই প্রাপ্তি হয়*। কেবল জ্ঞানীদিগের নিশ্চয় মুক্তি লাভ হয়; কেননা তাহাদিগের কোন বাসনা থাকে না; তাহাতে মৃত্যু-কালে অন্য কোন চিন্তা হওয়ার সম্ভব নাই; সুতরাং মুক্তি লাভ হয়। যদি বল যে জ্ঞানীদিগের অন্য চিন্তা হইতে পারে? কিন্তু তাহা হইলে তবে তিনি জ্ঞানী নহেন; তাহার ব্রহ্ম জ্ঞান ধারণা হয় নাই। কেননা তাহা হইলে কদাচ অন্য বাসনার লেশ মাত্র থাকার সম্ভব নহে। এজন্য জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ইহা বেদান্ত সম্মত, তবে দৃঢ় ভক্তি পূর্ব্বক যাঁহারা ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশেষ চিন্তা করেন তাঁহাদিগের তাহাতে অত্যন্ত আসক্তি প্রযুক্ত একনিষ্ঠ হত্তযাতে মৃত্যু সময় উপাস্য দেবতাকে মনে হওয়ার নিতান্ত সম্ভব; এবং ঐ রূপ চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহাব অবশ্যই মুক্তি লাভ হইতে পাবে। তদ্ভিন্ন মুক্তি যোগ্য অন্যান্য কর্ম্ম সকল একনিষ্ঠ হইয়া করিলে, অথবা তীর্থাদিতে প্রাণত্যাগ করিলে ঐ ঐ কর্ম্ম ফলে, ও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম শ্রবণে মৃত্যু হইলে সেই ফলে, এবং তীর্থ মৃত্যুর ফলে, মরণকালে অন্য চিন্তা না হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় প্রাণত্যাগ হওয়ার সম্ভব; তাহা হইলে মুক্তি লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ নিরাকার সচ্চিদানন্দ ভাবনায় প্রাণত্যাগ হইলে নির্ব্বাণ-মুক্তি এবং সাকাব চিন্তায় প্রাণত্যাগ হইলে অন্য ত্রিবিধ মুক্তি লাভ হয়। ইহার তাৎপর্য্য, ভগবদ্গীতা ও বেদান্তের বচনের সারার্থ ক্রমে ও যুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে, যে ব্যক্তি যাহাতে নিতান্ত আসক্ত হয় মৃত্যু-কালে তাহার তাহাই মনে উদয় হইয়া তদনুযায়ী ফল লাভ করে। যদি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হয় তবে নিশ্চয় সেই সেই বিষয় মনে হইতে থাকে; এজন্য বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহাতে জ্ঞান লাভ না হইলেও ঘটনাধীন ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকা হেতু মুক্তি লাভ হইতে পারে;

* যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত॥

অর্থ। মৃত্যু সময়ে যে যাহা চিন্তা করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতা ৮ম অধ্যায় ৬ শ্লোক। এই মত প্রবল।

† এই জন্য তীর্থ বাস, মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করান আবশ্যক বলিয়া তাহাই হইয়া থাকে।

অথবা স্বর্গ বা তত্তুল্য পিতৃলোক লাভ হইতে পারে। মুক্তি লাভের জন্য কতপ্রকার বিধি ও কর্ম্ম যে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সকল সংখ্যা করা যায় না। কেননা অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর কতপ্রকার বস্তু ও কতপ্রকার কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং কতপ্রকার বস্তুর কতপ্রকার গুণ ও স্বভাব নিরূপণ করিয়াছেন; এবং কি কর্ম্মের কি ফল নির্ণয় করিয়াছেন তাহা সিদ্ধান্ত করা আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞানী লোকের সাধ্য নহে যদিও শাস্ত্রে ইহার অনেক বিবরণ সিদ্ধান্ত আছে; কিন্তু তাহা আমাদিগের জানা দুঃসাধ্য তবে গুরু উপদেশ ও যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা এই পর্য্যন্ত লেখা হইল। এইক্ষণ এই সংসারে নানাবিধ শাস্ত্র ও ব্যবহার প্রচলিত থাকায় সাংসারিক ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি, তাহা আলোচনা করা যাউক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি, তাহা নির্ণয়।

এই গ্রন্থে শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় এবং জীবের পূর্ব্ব ও পরজন্ম এবং পরকাল ও ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং জ্ঞান মুক্তি প্রভৃতি সকল বিষয় লেখা হইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ অবিশ্বাস করিয়া বলেন যে, ঈশ্বর নাই, ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই, জীব স্বভাব বশতঃ জন্মায়; এবং পুরুষকার সহকারে কার্য্য করিয়াই জন্মে ও সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া মরিয়া যায়; তাহার আর পরলোক গমন ও স্বর্গনরক ভোগ এবং পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই সকল কুতর্ক বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা প্রোক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ দর্শান হইয়াছে। কুতর্কবাদীরা ইহার কোন শাস্ত্র বা প্রমাণ দর্শাইতে পারে না। অতএব তাহার মত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত আস্তিক মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ বিরুদ্ধবাদীরা এ কথা বলিতে পারেন না যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল থাকা বিশ্বাসে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে পরকালে কষ্টভোগ করিতে হইবেক; কেননা তাহাদিগের

মতে আদৌ পরকাল নাই ; তাহাতে আর কষ্টভোগ কি হইবেক। বরং আস্তিক মতে আছে যে, ঈশ্বরের উপাসনা না করিলে পরকালে কষ্টভোগ হইবেক। যেহেতু পরকাল আছে কি না কেহ দেখেন নাই ; কেবল শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে মীমাংসা হইয়াছে। যদি পরকাল না থাকে তবে উভয় মতেই কোন দোষ হইতে পারে না বটে ; কেবল আস্তিকের মতানুযায়ী উপাসনা কার্য্য বিফল হয় মাত্র। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে নাস্তিকের মত অবলম্বন করিলে পরিণামে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হইবেক ; তাহার সন্দেহ নাই। এজন্য নাস্তিকও স্বেচ্ছাচারীর মত পরিত্যাগ করিয়া আস্তিকের মত গ্রহণ করতঃ শাস্ত্র বিধি অনুসারে চলাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, ইহার সন্দেহ নাই। যদি ইহাতেও কেহ অনাদর প্রকাশ করেন, তবে সে মহাত্মাকে বুঝাইবার আর অন্য উপায় নাই। যদি বল যে, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে এইক্ষণ কলিযুগ উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মের সঙ্কোচ ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় আর শাস্ত্র উপদেশ দ্বারা কি উপায় হইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে কলিযুগে যে প্রকার অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়া লিখিত হইয়াছে ; তদ্রূপ কলিযুগে ধর্ম্ম কর্ম্ম করার সহজ উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, সত্যযুগে দশবৎসরে যে ধর্ম্ম হইত ত্রেতাযুগে তাহা এক বৎসরে ও দ্বাপরযুগে এক মাসে এবং কলিযুগে এক দিবসে লাভ হইবেক। এবং কলিতে সংসর্গ দোষ প্রায় থাকিবেক না। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজার যে ফল, কলিতে ঈশ্বরের নাম গুণানুবাদে সেই ফল লাভ হইবেক ; ও কলিতে দান ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম ; এবং ইষ্টদেবতার প্রতি দৃঢ় ভক্তি হইলে সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে। স্ত্রীলোকের স্বামীর সেবায়, ও শূদ্রেরা কেবল বিপ্রসেবায়, সদ্গতি লাভ করিবেক। এবং দ্বিজাতিরা গায়ত্রী মন্ত্র জপে সমধিক ফললাভ করিবেন। ইত্যাদি বহুবিধ সুগম উপায় কলিতে বিধান হইয়াছে অতএব কলিযুগ হইয়াছে বলিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে : বরং সমধিক যত্ন সহকারে স্বধর্ম্ম রক্ষা করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যেমন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যুদ্ধে ব্যাপৃত ব্যক্তি প্রাণ রক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য ; ও তাহাতে সে প্রশংসা ভাজন হইতে পারে। এবং অত্যন্ত গভীর স্রোতস্বতী তরঙ্গশালিনী

নদীতে নৌকা নিমগ্ন হইলে, যদি তথায় তৃণরাশি পাওয়ায় তবে তাহা আশ্রয় করিয়া প্রাণ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য ; নতুবা নৌকা স্রোতের জলে নিমগ্ন হইয়াছে, ইহাতে আর উপায় চেষ্টার ফল নাই বলিয়া প্রাণত্যাগ করা কদাচ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব উদ্ধারের পথ অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরন্তু যদিচ কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এইক্ষণতক ঘোর কলি উপস্থিত হয় নাই ; তাহার অনেক বিলম্ব আছে।* এবং এইক্ষণতক বর্ণভেদ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং রাজশাসন প্রচলিত আছে ; ও অনেক প্রকার পাপীলোকের শাস্তি হইতেছে। এবং বহুতর স্থানের লোকেরা স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন ; কেবল কিয়দংশ স্থানে মন্দকার্য্য চলিতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ; তাহা অজ্ঞাতার নিমিত্ত হওয়াই নিতান্ত সম্ভব। অতএব ঘোর কলি প্রবল না হইতেই ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ করা অকর্ত্তব্য। যেমন অর্দ্ধমগ্ন নৌকাকে স্বয়ং নিমগ্ন করা অত্যন্ত মূর্খের কার্য্য ; তদ্রূপ সময় থাকিতে অগ্রে কুকর্ম্ম করা নিতান্ত মূঢের কার্য্য। অতএব কুতর্ক সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে কালোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই সংসারীদিগের কর্ত্তব্য। কেননা মনুষ্য দেহধারীদিগের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম দুই প্রকার, পারমার্থিক ও ঐহিক অথবা ব্যবহারিক। তাহাতে পারমার্থিক ধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ ও মুক্তি লাভ হয়। ব্যবহারিক ধর্ম্মের দ্বারা ইহকালে সুখ সম্ভোগ হইতে থাকে ; ও পরকালেও স্বর্গ ভোগ হয়। অর্থ, অধর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন করিলে ইহকালে দুঃখ ও পরকালে নরক ভোগ হয়। ধর্ম্মের দ্বারা অর্থ উপার্জন করিলে এবং পৈতৃক ধন প্রাপ্তি হইলে তদ্দ্বারা কাম অর্থাৎ ইহকালে সুখভোগ ও পরকালে স্বর্গভোগ হয়। পারমার্থিক ধর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। ইহাতে অর্থের প্রয়োজন প্রায় থাকে না ; কেবল উপাসনা ও জ্ঞানের আলোচনাতেই সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ উপাসনাদি, গুরু উপদেশ ও সাধু সঙ্গ এবং শারীরিক তপস্যার দ্বারা হইতে পারে। জগতে যতপ্রকার আশ্রম আছে তাহা এইক্ষণে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ; অর্থাৎ উদাসীন ও গৃহী। তাহাতে

* কলির ৫০০ হাজার বৎসর গতে ঘোর কলি আরম্ভ হইয়া আর ৫০০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্ম চলিবেক, তদনন্তর একবর্ণা হইবেক।

উদাসীনের পরমার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে অর্থের প্রয়োজন নাই কেবল শরীর রক্ষার্থে ভিক্ষায় ভোজন করা দোষাবহ নহে; পরন্তু সকলেও তাহা করেন না; কেননা কেহ কেহ বন্য ফল মূল ও জল এবং গলিত পত্রাদি ভোজন ও পর্ব্বতের গুহায় এবং বন্য কুটীরে অবস্থিতি করিয়া বৃক্ষ বল্কল পরিধান করতঃ বন্যকাষ্ঠের অগ্নিতে শীত নিবারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এককালীন অর্থের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ইহা অনেকের ঘটে না; কেননা ইহা অধিক প্রবৃত্তির কার্য্য; এবং ইহার প্রতিবন্ধক অনেক আছে; যথা বৃদ্ধ পিতা মাতা ও সাধ্বী স্ত্রী এবং শিশু সন্তান পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ; বিশেষতঃ এই কলিযুগে মায়া মোহ জন্য অধিকাংশলোকই বিষয়াসক্ত; এজন্য ঘটনা হওয়া সুকঠিন; তবে যাহার কেহ নাই, এবং যে ব্যক্তি উপযুক্ত পুত্রাদির প্রতি সাংসারিক ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহার যদি বিবেক বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তবে তিনি ঐ আশ্রমে যাইতে পারেন: এবং তাহাই যুক্তি ও শাস্ত্র সিদ্ধ বটে। নতুবা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সকল কার্য্য করিতে পারেন* কেন না শাস্ত্রে গৃহীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন; এবং এই আশ্রমেই থাকিয়া চতুর্ব্বর্গ সাধন করিতে পারেন; কিন্তু শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে চলা আবশ্যক। এই আশ্রমে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন; তাহা প্রথমতঃ স্বধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য তাহাতে অচল হইলে আপদ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে অর্থ উপার্জ্জন করিলেও পাপভাগী হয় না। এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ১৪ অধ্যায় দৃষ্ট কর। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও হিংসা প্রভৃতি অন্যায্যরূপে পরধন হরণ ইত্যাদি অধর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদিও কেহ কেহ সাবধান বশতঃ পাপকার্য্য করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত না হয়েন এবং কোন কোন কার্য্যে রাজদণ্ডের বিধানও না থাকে তথাপি তাহাতে পরকালে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ হয়; এবং পাপকার্য্য পুত্র পৌত্রাদিতেও প্রতিফলিত হয়; মনুতে আছে এবং ব্যবহারেও অনেক স্থলে দেখা যায়। অতএব সংসারে ধর্ম্মই সকল সুখের মূল, ও তাহাতেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থদিগের উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা স্বীয় জীবন এবং অবশ্য পোষ্যগণের ভরণ পোষণ অগ্রে

* মনুর ৬ অধ্যায় ৩।৩৮ শ্লোক গৃহস্থোচিত কার্য্য না করিয়া সন্ন্যাস করায় পাপ আছে।

করা কর্ত্তব্য ; কেননা আহার দ্বারা ও পীড়া হইলে ঔষধ সেবন দ্বারা জীবন রক্ষা করা আবশ্যক এবং পোষ্যবর্গের ভরণ পোষনই স্বর্গ সাধনের প্রশস্ত পথ.বলিয়া তাহাও কর্ত্তব্য, কেননা তাহাদিগকে পীড়া দিলে ও ভরণ আদি না করিলে নরকে গতি হয়।* ইহা যেরূপ শাস্ত্র সিদ্ধ ; তদ্রূপ যুক্তি সিদ্ধও বটে। বাস্তবিক পরিবার বর্গের ভরণ পোষণ না করিলে এইক্ষণেও লোক সমাজে নিন্দনীয়ও হইয়া থাকে। ঐ পোষ্যবর্গ এই ; পিতা মাতা ও বৃদ্ধ পুরুষ এবং স্ত্রী ও পুত্র কন্যা অনাথা পুত্রবধূ এবং ভ্রাতৃবধূ ও ভগিনী ও পিসি ও অতিথি ইহাঁরা অবশ্য পোষ্য ; এতদ্ভিন্ন ধন থাকিলে নৈকট্য কুটুম্ব যাঁহারা উপায় হীন তাঁহাদিগকেও পালন করিতে হয়। অতিথি পদে ভিক্ষুকদিগকে নিত্য ভিক্ষা দেওয়ারও বুঝায়; এবং সমর্থ থাকিলে দরিদ্রকে দান করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু উৎসর্গ বস্তু ব্রাহ্মণকে দেওয়াই বিধি, কেননা তাহা ব্রাহ্মণকে দিবার নিমিত্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করা হইয়া থাকে। অন্নদান ক্ষুধিত ব্যক্তিকে, এবং জলদান পিপাসার্থীকে দেওয়াই কর্ত্তব্য ; এবং যথাসাধ্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদিতে অর্থ ব্যয় করা কর্ত্তব্য। ইহাতে লোকের যে প্রকার ব্যবসায় ও যে পরিমাণ ধন উপার্জ্জন করা হয় ; তদ্রূপ ব্যয়াদি দ্বারা পান ভোজন ও বসন ভূষণ পরিধান এবং যান বাহন ও গৃহাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ধন সত্ত্বে কষ্ট ভোগ করা অথবা অপব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা সমূহ পাপের কার্য্য ; ববং উপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা যত্নপূর্ব্বক সঞ্চয় ও তদ্দ্বারা সৎকীর্ত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অধিক ধনের প্রত্যাশা করিয়া নানা প্রকার উপার্জনের কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে ; তাহাতে সময় সময় লোক এককালীন বিনষ্ট হইয়া যায়। পান ভোজনাদি কার্য্য যাহা সবর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় সামাজিক নিয়ম আছে ও যাহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহাই করা কর্ত্তব্য, ও পিতৃ শ্রাদ্ধাদি ও দেবপূজাদি ও যথাবিধ সংস্কার এবং দীক্ষা ও গুরুভক্তি প্রভৃতি কার্য্য পৈতৃক নিয়মানুসারে করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ ভরণ পোষণ ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ এবং পুত্র কন্যাদির বিবাহ ব্যতীত ঋণ করিয়া অন্য নৈমি-

---

* ভরণং পোষ্যবর্গানাং প্রশস্তং স্বর্গ সাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তংভরেৎ ইতি স্মৃতি। এবং শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।

ত্তিক কার্য্য করা উচিত নহে। এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেও সম্ভবতঃ ঋণ করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ যাহা পরিশোধ হইবার সম্ভব থাকে। পরিবার সত্ত্বে সর্ব্বস্ব অথবা যাহাতে কষ্ট হয়, এরূপ দান করা কর্ত্তব্য নহে; বরং মনুর মতে তাহাতে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। যদিও বিদেশীয় বিদ্যা শিক্ষা করা এইক্ষণ আপদকালে ঘটনা হইতেছে ও তদ্দ্বারা অর্থ উপার্জনের কিছু সুগম আছে বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া সামাজিক ও পরকাল-বিরুদ্ধ পান ভোজন ও স্ত্রীসংসর্গাদি করা উচিত নহে; বিশেষতঃ রাজা বা রাজপুরুষের ন্যায় আচরণ করা প্রজাবর্গের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদিচ বর্ত্তমান রাজ নিয়মে ঐ রূপ আচরণে বাহ্যিক কোন দোষ দেখা যায় না বটে; কিন্তু রাজপুরুষেরা অন্তরে বিরক্ত থাকেন তাহার সন্দেহ নাই। কেননা রাজা প্রজা একই ভাবে চলিলে রাজার প্রতাপের হানী হইবার নিতান্ত সম্ভব; বরং তজ্জন্য সময় সময় ঐ রূপ আচরণকারী লোক সকল রাজপুরুষ কর্ত্তৃক তাড়িত হইতেও দেখা যায়। যাহাতে রাজদণ্ড হইতে পারে এরূপ কুকর্ম্ম করা উচিত নহে; বরং রাজনিয়ম পালন প্রভৃতি দ্বারা রাজভক্তি প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। মানী ব্যক্তিকে অপমান ও অকারণে বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে। এতদ্দেশ-বাসী-দিগের মদ্যপান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; কেননা মদ্যপান দ্বারা অনর্থক অর্থ বিনাশ ও শারীরিক পীড়াদি জন্য কষ্ট ও অকালমৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে; এমন কি মদ্যপানের দ্বারা অনেক লোক উচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া দেখা যাই-তেছে। এক্ষণকার নব্য সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকেই বলেন যে, অল্প পরিমাণে মদ্য পান করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়; ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক; কেননা এ দেশীয় লোকেরা অল্প মাত্র পান করিয়া কদাচ থাকিতে পারেন না। প্রথমতঃ ঐ রূপ প্রবৃত্তিতে প্রবর্ত্ত হয়েন বটে; কিন্তু পরিণামে সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইয়া মহতী রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। পূর্ব্বকালে যুদ্ধে ব্যাপৃত ক্ষত্রিয় গণ গৌড়ী মাধ্বী সুরা পান করিতেন বটে; কিন্তু যুদ্ধের সময় অথবা আমোদের কার্য্যের সময় ব্যতীত পান করিতেন না। এক্ষণেও সৈনিক পুরুষেরা সুরা পান করিলে তত দোষের কারণ হয় না; তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণাদির সুরা পান কার্য্য নিতান্ত দূষণাবহ; উহাতে যেরূপ পরকাল বিনষ্ট হয় তদ্রূপ ইহকালে জ্ঞান নাশ হইয়া জাতি ভ্রষ্ট অর্থনাশ প্রভৃতি দোষগ্রস্ত হইতে হয়।

যদিচ তন্ত্রশাস্ত্রে কুলাচার সাধন প্রভৃতি উপাসনাতে সংশোধিত মদ্যপানের বিধি বর্ণিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য মনের একাগ্রতা হওয়ার নিমিত্ত ঐরূপ বিধি হইয়াছিল ;* তাহা এক্ষণে প্রায় রহিত হইয়াছে। কেননা কুলাচার সাধন অত্যন্ত কঠিন ও গোপনীয়। তাহা ভগবান মহাদেব স্বয়ং তন্ত্র শাস্ত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং বা গণেশ ও কার্ত্তিক ব্যতীত অন্যের সাধ্য নাই। তবে অসুরেরা ঐ ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে যাজন করিয়া অনেকে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে বটে ; এবং পূর্ব্বকালেও অনেক সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনা যায় কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য সকল হীন বীর্য্য হওয়াতে ও সাধনার প্রতি অভিরুচি না থাকাতে ঐ কার্য্যে সিদ্ধি লাভ হয় না ; তবে যদি কাহারও পুরুষানুক্রমে ঐ ধর্ম্ম চলিয়া আসিয়া থাকে এবং তিনি তাহা শাস্ত্র বিধিমতে আচরণ করিতে পারেন, তবে করুন, তৎপ্রতি প্রতিবাদ নাই। কিন্তু ঐরূপ বিধির ভান করিয়া উদর পরিপূর্ণ রূপে মদ্যপানে ও বেশ্যাসক্ত হইয়া এককালীন বিনষ্ট না হয়েন। অতএব মদ্যপান করা অতীব গর্হিত কার্য্য। বরং ইহকালে নিন্দা এবং কষ্ট ও পরকালে নরক যাতনা সহ্য করিতে হয়। পরন্তু যদ্যপি দুর্ভাগ্যবশতঃ এ দেশে মদ্য পান নিষেধ করার জন্য কোন রাজ নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বকালের শাস্ত্র দৃষ্টে এই সকল ব্যক্তিরা মদ্যপানে ক্ষান্ত থাকা উচিত ; অর্থাৎ যাহারা দেশের শান্তি রক্ষা করেন, এবং যাহারা বিচার কার্য্য করেন ও যাহারা ব্যবহার-জীবী†, এবং যাহারা চিকিৎসক ও যাহারা পুরোহিত, এবং যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মণ জাতিরা। ইহাঁদিগের পক্ষে নিতান্ত দূষণাবহ ; অর্থাৎ ইহকালে কষ্ট ভোগ, ও পরের অনিষ্ট সাধন, এবং শাস্ত্র সম্মত পরকালেও নরক হইবার সম্ভাবনা থাকায় মদ্য পান না করাই কর্ত্তব্য। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং বৈদ্য ও রাজপুত্র (রজপুত) এবং শূদ্র বর্ণের মধ্যে কায়স্থ ও নবশাখ এবং গন্ধবনিক ও কাংস্যবণিক এবং শংখবণিক প্রভৃতি জাতিরা আপনা হইতে হীনবর্ণের বা ভিন্ন বর্ণের পাক করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে‡।

* সুরামন্ত্র দ্বারা এরূপ সংশোধন হওয়া আবশ্যক যে তাহার গন্ধ রহিত হয়।

† উকিল মোক্তার।

‡ ব্রাহ্মণের অন্ন ব্যতীত অন্য বর্ণে বা ভিন্ন জাতির অন্ন ভোজন করিবে না।

এবং দেশ ভেদে যে জাতির জল ব্যবহার নাই, ও যে জাতিকে স্পর্শ করা হয় না, তাহাদিগের জল পান করাও কর্ত্তব্য নহে। এবং বৈধ মাংস অর্থাৎ দেবোদ্দিশ্য যে ছাগ-পশু বলি দান করা যায়, তদ্ভিন্ন অবৈধ মাংস, এবং গো, শূকর, কুক্কুট প্রভৃতির মাংস ও পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) এবং রসুন প্রভৃতি অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করাও অকর্ত্তব্য*। কেননা ইহা ইহকালে সমাজ নিষিদ্ধ, এবং পরকালে দূষণাবহ। এবং অসবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করা, ও অসবর্ণ পুরুষকে কন্যাদির বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেননা ক্রমশই বর্ণ সঙ্করের বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্ম লোপ হইতে থাকে। আর স্ব দার পরিত্যাগ করিয়া পরদার গমন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ স্বজনা অর্থাৎ স্বম্পর্কীয় স্ত্রীলোক গমন করা অত্যন্ত গর্হিত; তাহাতে আবার পরদারে আসক্তি হইলে কোন ক্রমেই পরকালে শুভ হইতে পারে না। এবং ইহকালেও পরদারগামীকে লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। অতএব স্বদার নিকটস্থ না থাকায় কাম বেগ উপস্থিত হইলে বিবেক দ্বারা বিচার করতঃ ধৈর্য্য অবলম্বন করাই উচিত। যদি বল যে, কাম বেগ সহ্য করা সুকঠিন বিধায় তাহা হয় না? কিন্তু দেশভেদের অনেক লোককে দেখা যায় যে, তাহারা স্ত্রী পুরুষ অনেকেই বিবাহ না করিয়া চিরকাল কামবেগ সহ্য করিয়া থাকে। তবে যদি বল পীড়া প্রযুক্ত লোকে থাকিতে না পারিয়া মল মূত্র ত্যাগের ন্যায় কামবেগ নিবারণ করায় ক্ষতি কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, যদিচ সম্ভব মত কার্য্যের দ্বারা যৌবন কালের পীড়া নিবারণ করিলে লৌকিক নিন্দা সমধিক না হইতে পারে, কিন্তু ঐ ঐ পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পর-কালে কষ্ট ভোগ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। কেননা যে কোন পাপ হউক তাহার সকলেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অতএব সংসারিক লোকের পাপ ঘটনা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য, তাহাতে শুদ্ধ হইতে পারে; তবে যাহাতে জাতি নাশ হইয়া পতিত হয় এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ নাশ হইয়া পরকালের শুভ হয় বটে, কিন্তু ইহকালে তাহার সহিত ব্যবহার করা যায় না; কেননা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে যে, পাপের দুই শক্তি; অর্থাৎ নরক উৎপাদিকা এবং ব্যবহার বিরোধিকা; তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত

* এই সকল দ্রব্য যাহাদিগের ভক্ষ্য, তৎপ্রতি এই ব্যবস্থা নহে।

দ্বারা নরকোৎপাদিকা শক্তি রহিত হইলেও ব্যবহার বিরোধিকা শক্তি রহিত হয় না; এজন্য যাহাতে পতিত হইতে হয়, এবং জাতি নাশ হয় এরূপ কার্য্য কদাচ কর্ত্তব্য নহে। নিজের স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, বধ করা উচিত নহে। এবং আত্মীয় বর্গ, এমন কি, পুত্র ও পিতা প্রভৃতি পতিত হইলে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত। এই সকল বিষয়ে আমাদিগের ব্যবহারিক নিয়ম যাহা শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া সামাজিক নিয়মরূপে চলিয়া আসিতেছে, এই নিয়ম রক্ষা করা কঠিন নহে : বরং বিবেক সহকারে বুদ্ধিমান লোকেরা ইহা অনায়াসে রক্ষা করিতে পারেন ; এবং ইহার দ্বারা ইহকালে সুখী হওয়া যায় ও পরকালে কোন দোষ থাকে না ; এবং স্বর্গাদি ভোগ হইতে পারে *। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণ দ্বারা পারমার্থিক ধর্ম্ম অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ রূপ যে ব্রহ্ম-জ্ঞান তাহা লাভ হইবার সুগম হইতে থাকে। তাহাতে গৃহীদিগের সংক্ষেপে মুক্তি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে; কেননা মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মতে ব্যবহারিক কার্য্য সকল বিবেক সহকারে পরিচালন করত বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়ের দোষ সকল সমালোচনা পূর্ব্বক বিষয়ে নিতান্ত আসক্ত না হইয়া নিষ্কাম রূপে অর্থাৎ স্বর্গাদি কামনা না করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত করণ দ্বারা পাপ ক্ষয় ও চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়া ভক্তি যোগ† দ্বারা সগুণ ঈশ্বর অর্থাৎ আপন ইষ্টদেবতার প্রতি দৃঢ় ভক্তি স্থাপন করিলে তাহাতে ইন্দ্রিয় ও রিপু দমন হইয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয় ; তদনন্তর পুরাণাদি জ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ক্রমশ জ্ঞান হইতে থাকে। অর্থাৎ প্রথমতঃ আমি কেহ নহে, সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরই কর্ত্তা, তিনি যাঁহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি; আমি শুভাশুভ ফলভোগী নহি এবং ফলের অনুসন্ধান করি না এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের

* এই সকল বিষয় ধর্ম্মের সহিত অধিক সংসৃষ্ট থাকায় লিখিত হইল তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষা ও সভ্যতা প্রভৃতি অনেক বিষয় মনু প্রভৃতি গ্রন্থে আছে, তাহা লেখা অপ্রয়োজন বিধায় ক্ষান্ত থাকা গেল।

† এই ভাগের তৃতীয় অধ্যায়।

স্বরূপ জ্ঞাত হইলে আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ ব্রহ্মজ্ঞান ধারণা হইলে দেহ ত্যাগানন্তর মুক্তি লাভ হয়। যদি মরণকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হয় তথাপি ইষ্টদেবতার প্রতি দৃঢ়ভক্তি থাকাতে মৃত্যু-কালে ঐ দেবতার সাকার মূর্ত্তি স্মরণ হইয়া মরণ হইলে সালোক্য মুক্তিলাভ হয়; ও নিরাকার আত্মা রূপ স্মরণ হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। যদি দৃঢ় ভক্তি না জন্মাইতে মরে, তথাপি জন্মান্তরে উত্তম পবিত্র ধনীর বংশে, ভক্তিযোগ কিঞ্চিৎ অধিক পরিণত হইয়া মরিলে যোগীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করত পূর্ব্বজন্মের কৃত ঐ ভক্তি যোগ কখন বিফল হয় না। ভগবদ্গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪০শ শ্লোক হইতে ৪৩শ শ্লোক দৃষ্টে ঐ রূপ জানা যাইতেছে; অতএব ইষ্টদেবতারূপ ঈশ্বরে ভক্তিযোগ সাধন করা অতীব কর্ত্তব্য*। যদি বল যে, সাংসারিক ধনোপার্জ্জনাদি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ঈশ্বরের উপাসনার সময় থাকে না; এবং বিষয় কার্য্যে মনঃ সংযোগ থাকায় উপা-সনায় মনঃ সংযোগ হয় না? যে হেতু মন দুই দিকে রাখা বড় কঠিন; তাহাতে বক্তব্য এই যে, প্রাতঃকাল এবং মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল এই তিনকালে কিঞ্চিৎ সময় অবকাশ সকলেরই হইতে পারে। বিশেষতঃ রাত্রিকাল বিশ্রামের জন্যই পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই সেই সময় অনায়াসে নিত্যক্রিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ এবং পূজা ও কীর্ত্তন ও ধ্যানাদি ও গুণানু-বাদ এবং গান ও আলাপ সর্ব্বদাই হইতে পারে; ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক নাই; তবে অলসতা ও তাচ্ছিল্যতা প্রযুক্ত সময় হয় না। যদিচ প্রাতঃ-কালে স্নান না করা যায়, তথাপি ধৌত-বস্ত্র পরিধান করিয়া ঐ কার্য্য করি-বারও বিধি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কেন না অশক্ত বা পীড়িত ব্যক্তির স্নান করিবার আবশ্যক নাই। তবে মনঃ সংযোগ হওয়ার বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা যে একটী উদাহরণ দিয়াছেন তাহা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত যেমন বাজীকারেরা বাজি করণ সময়ে মুখে গান করে এবং পায়ে নৃত্য করে ও হস্তে তাল ধরে কিন্তু মস্তকে যে কলসী থাকে তাহার প্রতি তাহার মনঃ সংযোগ অবশ্যই থাকে। তদ্রূপ সংসারে ব্যাপৃত থাকিলেও মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি অবশ্যই

* ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে গৃহী অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান ভক্তিযোগের উপদেশ দেও-য়াতে গৃহীর পক্ষে এই যোগই শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে। তাহাতে উপাসনা কালীন মনঃ যে স্থানেই যাউক বিবেক সহকারে তাহাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিবার চেষ্টা করিলে অনায়াসে তাহা করা যায়। যদি বল উপাসনা কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন আছে ? কিন্তু তাহা নাই। গৃহীদিগের যে অর্থ থাকে, তাহার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন নাই; কেন না বনের পুষ্প এবং নদীর জল ও মন্ত্র জপ এবং ধ্যান ইহাতে কোন অর্থ লাগে না, ইহা সুলভ, তবে ভক্তি পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্য এবং সঙ্গতি থাকিলে অন্যান্য দ্রব্যের দ্বারা পূজাদি কর্ম্ম করতঃ তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিলে তাঁহার প্রীতি জন্মে ইহা সকলেই করিতে পারে। তবে স্বেচ্ছাচারীরা কিছুই পারে না; কেন না তাহাদিগের ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি জন্মে না। যদি বল অত্যন্ত পাপী ও দুরাচার এবং স্ত্রী শূদ্র ও অপর হীন জাতি চণ্ডালাদি প্রভৃতিরা পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি করে তবে তাহারাও সাধুমধ্যে পরিগণিত এবং মুক্তির ভাজন হইয়া থাকে*। কিন্তু স্বেচ্ছাচারীরা ঐরূপ হইতে পারে না; এবং ঐরূপ ভক্তও পুনরায় পাপ-কার্য্যে রত হইলে, হস্তী স্নানের ন্যায় তাহার কিছুই সিদ্ধি লাভ হয় না†। কুকর্ম্মশালী পতিত ও হীন জাতীয় ব্যক্তি প্রারব্ধ বশতঃ হঠাৎ ঈশ্বরের ভক্ত ও সাধুশীল হইয়া পুনরায় পাপকার্য্যে রত না হইলে সে মুক্তি লাভ করে ও তাহার নিকট জ্ঞান বিষয়ের উপদেশ লওয়াও যাইতে পারে; ইহা মনু ও মহাভারতে প্রমাণ আছে‡। যদি বল যে ঐ ভক্ত হীনজাতি হইলেও, তাহার সহিত উচ্চ জাতিরা কি জন্যে পান ভোজন করেন না ? তাহার কারণ এই যে, পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ধর্ম্ম পৃথক্। পূর্ব্বে মীমাংসা করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে শুদ্ধ হইলেও ব্যবহারে শুদ্ধ হয় না§ যদি বল যে স্বেচ্ছাচারীরা কি জন্য ঈশ্বরের ভক্ত হয় না ? তাহার কারণ এই যে, ব্যবহারে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি স্বেচ্ছাচারের ন্যায় পান ভোজন ও স্ত্রী

* ভগবদ্গীতা ৯ম অধ্যায়ের ২৬ হইতে ৩২ শ্লোক দৃষ্ট কর।

† হস্তী স্নান করিয়া ধূলি মাখিতে থাকায় স্নান বিফল হয়।

‡ মনুর ২য় অধ্যায়ের ২৩৮ শ্লোক। মহাভারতে ধর্ম্ম ব্যাধের উপাখ্যান।

§ নবদ্বীপের গৌরাঙ্গদেবের চেলা হরিদাস ও রূপ সনাতন, যবন জাতি প্রাপ্তেও অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ তাঁহাদিগের সহিত পান ভোজন করেন নাই। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে আছে।

সঙ্গ করে, তবে তাহার জ্ঞান জন্মে না। কারণ রজস্তমোময়ী অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীব সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। সে যখন সত্বাধিকা বিদ্যার উপাসনা করতঃ তাঁহাকে প্রসন্না করিতে পারে, তখন মুক্তি লাভ হয়। যেমন অবিদ্যারূপা পর পত্নীতে লোকে আসক্তা হইয়া মুগ্ধ প্রায় হইয়া থাকে; যখন বিদ্যারূপা নিজ পত্নীর বশবর্ত্তী হয়; তখন অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করে। তদ্রূপ অবিদ্যা রূপা অজ্ঞানে আবৃত হইয়া জীব মুগ্ধ হয়; এবং বিদ্যারূপা জ্ঞানকে আশ্রয় করিতে পারিলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ঐ অজ্ঞানের মূল কারণ রজস্তমোগুণ, তাহাতে ঐ গুণের কার্য্য পরিত্যাগ ব্যতীত সত্বাধিকা বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হয় না। ঐ রজঃ তমঃ গুণের আহার বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বগুণের আহার বিহার করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হইতে থাকে। নতুবা তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ এবং দুর্গন্ধি ও পর্য্যুসিত ও মদ্য প্রভৃতি অশুচি দ্রব্যাদি যাহা রজঃ তমোগুণের আহার বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ভক্ষণ এবং পরদারাদি সেবা ও হিংসা দ্বেষ নৃশংসতার কার্য্য ও চৌর্য্য এবং পর নিন্দাদি কার্য্য সকল ব্যবহার করিলে কখনই রজঃ তমোগুণের নাশ হয় না; বরং বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহা সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্বিক দ্রব্য অর্থাৎ শুচি ও সুগন্ধি স্নিগ্ধ ও হৃদ্য দ্রব্য যাহা শাস্ত্রে বিধান আছে তাহা আহার করা; এবং স্বদারে অনুরক্ত হওয়া ও দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা ও অচৌর্য্য প্রভৃতি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার করিলে ইহকালের সুখ ও পরকালে জ্ঞান লাভ হইয়া মুক্তি হইতে পারে। আমাদিগের শাস্ত্রে ব্যবহারিক বিষয়ে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিহিত আচারের দ্বারা পারমার্থিক ধর্ম্মের উপকার হওয়া লিখিত হইয়াছে*। যদি বলা যায় যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতীত এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না? এবং সকলে শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতে পারে না, অতএব উপায় কি আছে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, যদি মুক্তি ইচ্ছা হয় তবে সাধুসঙ্গ ও গুরু উপদেশের দ্বারা অনায়াসে এই সকল বিষয় সিদ্ধি লাভ হয়; বিশেষতঃ স্বধর্ম্মাচরণে

* মনুর ৫ম অধ্যায় ৫৬ শ্লোকে আছে যে বৈধ মাংস ভোজন ও মদ্য পান এবং মৈথুন লোকের প্রবৃত্তিজনক কার্য্য তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু নিবৃত্তি হইলে মহাফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ইহার নিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রিয় ও রিপু দমন হইয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইলে জ্ঞান জন্মায়; তাহাতে মুক্তিরূপ মহাফল হইতে পারে।

থাকিলে প্রায় অনেক বিষয় অভ্যাস হইয়া থাকে ; সকল বিষয়ের শাস্ত্র জানিতেও হয় না। তবে যদি কোন ব্যক্তির স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রাজ্ঞা না থাকে ; এবং বিবেক বুদ্ধি পবিচালন না হয় ও বৈরাগ্য না থাকে ; এবং মুক্তির ইচ্ছা না জন্মায়, তবে তাহার সাধুসঙ্গ অথবা গুরু উপদেশ কার্য্যকর হয় না, বরং বিফল হইয়া যায়। যেরূপ বস্তুর গুণানুসারে স্পর্শ প্রস্তর ধাতু সংযোগ হইলে ঐ ধাতু স্বর্ণ হয় ; কাষ্ঠ সংযোগ করিলে তাহা সুবর্ণ হয় না ; এবং উষর ভূমিতে অর্থাৎ বালুকাময় ভূমিতে বীজ বপন করিলে শস্য উৎপন্ন না হইয়া বৃথা হইয়া যায় ; তদ্রূপ দাম্ভিক অভিমানী মূর্খ প্রভৃতি স্বধর্ম্মত্যাগি স্বেচ্ছাচারী ও অবৈধভোগী ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া বিফল হইয়া যায়। কেননা শিশ্নোদরপরায়ণ* ব্যক্তিরা কখনই সদুপদেশ ধারণা করিতে পারে না, এজন্য আমাদিগের শাস্ত্রে নিষেধ আছে পুত্র ও শিষ্য এবং জিজ্ঞাসু ভক্ত ব্যতীত অভক্তকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে অজ্ঞ ব্যক্তিকে সদুপদেশ দেওয়ায় কোন হানী দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অভক্ত ও স্বেচ্ছাচারীরা কেবল শাস্ত্রের ছিদ্রান্বেষণ করেন ; তাহারা শাস্ত্রের উপযুক্ত অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করে না। আমাদিগের শাস্ত্রে যে নানা প্রকার ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধি সকল আছে, তাহা কাল ও দেশ ভেদে, ও ব্যক্তি ভেদে, এবং বর্ণ ভেদে, ও উপাসনা ভেদে হইয়াছে। তাহা যদিচ সর্ব্ব স্থানে ভেদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই ; কিন্তু প্রত্যেক শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত ঐক্য করিলে, ও তাহার তাৎপর্য্য মীমাংসা করিলে, ঐ ভেদ সকল নিরূপণ করা যাইতে পারে ; তজ্জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মা শূলপাণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সংগ্রহকারেরা শাস্ত্র সকল একবাক্য করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ের উদাহরণ এই যে, মন্বাদি শাস্ত্রে মদ্যপান ও পঞ্চনখীর মধ্যে যে সকল পশুপক্ষীর মাংস ভোজন করা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকালে যুদ্ধে নিযুক্ত ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ও হিমপ্রধান দেশবাসীদিগের প্রতি বিধি ছিল। এবং অধিক স্ত্রীসম্ভোগ ক্ষত্রিয় রাজার প্রতি বিধি ছিল। ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত

* যাহারা অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান এবং অগম্যা গমন করে তাহাদিগকে শিশ্নোদরপরায়ণ বলা যায়।

অর্থ ও তাৎপর্য্য এবং পুরাণাদি পাঠে জানা যায়। ফলতঃ ইহা উষ্ণদেশবাসী ও মৃদুস্বভাব ব্রাহ্মণাদির প্রতি; বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে কখনই বিধি সিদ্ধ নহে*। এবং বৈষ্ণবের, মাংস ভোজন কর্ত্তব্য নহে; শাক্তেরা মৎস্য মাংস ভোজন করিতে পারে। এইরূপ ব্যক্তি ও জাতি ও দেশ কালভেদে ব্যবস্থা আছে। আরও উদাহরণ এই যে, হাঁচি হইলে জীব বাক্য বলা ও হাঁই উঠিলে অঙ্গুলিতে স্ফোট করা বিধি আছে; তাহানা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়; এবং তুলসী বৃক্ষে প্রদীপ দান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ খণ্ডে। ইহার তাৎপর্য্য যে, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রদীপ দানে খণ্ডিতেপারে; সাক্ষাৎ ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন কখনই উদ্ধার নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয় শাস্ত্রের অর্থ করিতে হয়। আমিও প্রাচীন গণের মীমাংসা অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয় ও প্রকরসকল লিপি বদ্ধ করিলাম; ইহাতে অশাস্ত্রীয় কথা লিখি নাই। তজ্জন্য আমার কোন দোষ হইতে পারে না; বরং লোককে সৎপথে লওয়াইবার চেষ্টা করাতে উপক রইহইতে পারে। এই গ্রন্থে কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রণালী ওব্যবস্থা সকল লিখিত হইল না। তাহা লেখার উদ্দেশ্যও নহে; সে সকল বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও গুরু উপদেশের কার্য্য। যদি কেহ এই মত ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে তিনি গুরুর নিকট উপদেশ ও পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইতে পারেন। যেহেতুক জগতে অনন্ত কার্য্য নিরূপণ আছে, তাহার কোন এক কর্ম্ম অথবা তপস্যার দ্বারা নানা প্রকার ফল লাভ ও আশ্চর্য্য সকল দেখাইতে পারা যায়; তাহা অনেক ক্লেশসাধ্য বটে, কিন্তু সাধনাতে সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হয়। এবং যিনি ঈশ্বর উপাসনা সহজ জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে দৃঢ় ভক্তি রূপ উপাসনা করেন, তাঁহার সিদ্ধি নিশ্চয় লাভ হয়; এবং ঈশ্বর তাঁহার নিকটে থাকেন; অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজমান হয়েন†। আর যিনি বলেন যে, ঈশ্বর দুজ্ঞের্য় ও তাঁহার উপাসনা কঠিন বিধায় তাহা হইতে পারে না; ঈশ্বর তাঁহার অতি দূরে বিদ্যমান থাকেন। অতএব এই পর্য্যন্ত লিখিয়া গ্রন্থ সমাধা করা হইল, এক্ষণে দোষ গুণাদি সকল লিখিত পূর্ব্বক গ্রন্থের উপসংহার করা যাইতেছে।

* গুইসাপ ও শূকর প্রভৃতি ভক্ষণ করা এ দেশে কখনই চলিত নহে।

† তাৎপর্য্য এই যে, এক জন্মেই বা বহু জন্মেই হউক ঈশ্বর আরাধনাতে জ্ঞান ও মুক্তি লাভ নিশ্চয় হইবেক।

সপ্তম অধ্যায়।

গ্রন্থের উপসংহার।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও উপক্রমে যে সকল বিষয় মীমাংসা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তৎসমুদায় শাস্ত্রযুক্তি ও ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে মীমাংসা করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম ভাগের ১ম অধ্যায়ে গ্রন্থের নাম জ্ঞানতত্ত্বদর্শন, ও তাহা নানা শাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করার উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বারা সাংসারিক ও পারমার্থিক বিষয় জ্ঞানের যথার্থ্য প্রকাশ হইতে পারে বলিয়া ইহার নাম জ্ঞানতত্ত্বদর্শন হইয়াছে। এবং শাস্ত্রসকল বহু বিস্তৃত থাকায় তাহার প্রয়োজনীয় সারভাগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে ভাগ চতুষ্টয়ে একষষ্টি অধ্যায়ে প্রধানতঃ একষষ্টি বিষয় ও তাহার অন্তর্ভূত নানাবিধ বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। তদ্বিস্তারিত সমুদায় গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবেক। গ্রন্থ খানিতে যে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করা হইয়াছে, তাহা জগদীশ্বর জানেন; ও পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করিলেও জানিতে পারিবেন। কিন্তু সমুদায় শাস্ত্রের সংস্কৃত শ্লোক লেখা হয় নাই; তাহা লিখিতে হইলে গ্রন্থখানি ইহার চতুর্গুণের অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়া ক্ষান্ত থাকা হইয়াছে; তবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় শ্লোক সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এবং কোন স্থানে শাস্ত্রের অধ্যায় অথবা শ্লোকাঙ্ক ও কোন কোন স্থানে শাস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে; কোন কোন স্থানে শাস্ত্রের উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু তাহা সমুদায় শাস্ত্র সঙ্গত বটে; তবে কোন স্থানে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যে হইয়াছে তাহাও পূর্ব্বকালের মহাত্মাগণের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হইয়াছে; ফলতঃ সিদ্ধান্ত সকল স্বকপোলকল্পিত হয় নাই। তবে স্থানে স্থানে দ্বিরুক্তি দোষ হইয়াছে বটে, তাহা নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ অধ্যাত্ম বিষয়, এবং সৃষ্টি, ও ঈশ্বরের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয় অতিশয় দুর্জ্ঞেয় তাহা বুঝিবার সুগম করার জন্য বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও

কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাহা পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেও যদি কেহ তৎসমুদায় বুঝিবার ব্যাঘাত বিবেচনা করেন, তবে জনৈক পণ্ডিতের নিকট অত্যল্প উপদেশ লইলেই অতিশীঘ্র সহজে বুঝিতে পারিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি ভরসা করি যে, যাঁহারা বঙ্গীয় ভাষায় পারদর্শী, তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমি এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা অথবা এইক্ষণকার প্রচলিত সাধুভাষার ন্যায় কঠিন শব্দ সকল প্রয়োগও করি নাই, বরং সাধ্য পর্য্যন্ত সরল শব্দই লিখিয়াছি; এবং কঠিন যে শব্দ পরিত্যাজ্য নহে তাহারও উদাহরণের দ্বারা অর্থ পরিষ্কার করিয়াছি। কিন্তু ভাষাগুলিন সুললিত বা সুশ্রাব্য হয় নাই; কারণ স্থানে স্থানে প্রায় তর্ক বিতর্ক করিয়া মীমাংসা করাতেই ঐ রূপ ঘটনা হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সাধনের উপায় ও নানাপ্রকার পদার্থ নির্ণয় করা হইয়াছে। তাহাতে সাংসারিক ও পারমার্থিক বিষয়ের উপকার সাধন ও নানা প্রকার পদার্থ জ্ঞান যে, ইহার দ্বারা হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। তবে যদি কেহ বলেন যে, এই গ্রন্থের প্রকাশক জেলা নদিয়ার জজ্ আদালতের উকিল বিধায় শাস্ত্র সঙ্গত ব্যাপার যে, তদ্দ্বারায় প্রশুদ্ধরূপে প্রকাশ হইবেক, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহের বিষয়; তজ্জন্য এই স্থানে কিঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিতে হইল। অস্মদের পিতৃপিতামহ ও মাতুল মাতামহাদি, পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন; এবং আমিও বাল্য কাল হইতে অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া তদনন্তর দৃঢ় প্রারব্ধ বশত কালোচিত আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছি; তাহাতেও অস্মদের শাস্ত্র বিষয়ে এবং স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার ত্রুটি জন্মে নাই। বিশেষতঃ গ্রন্থখানি যে, শাস্ত্রসঙ্গতরূপে লেখা হইয়াছে; তাহা শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন, তাহাতে অবিশ্বাস করণের কোন কারণ থাকিতে পারে না। পরন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশ করাতে অস্মদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে কিনা তাহা কাহারও দেখিবার প্রয়োজন নাই; কেননা এই গ্রন্থ দ্বারা অস্মদের সম্যক্ জ্ঞানোদয় না হইলেও পাঠক বর্গের মধ্যে কোন কোন মহাত্মার যে উপকার হইতে পারে;

তাহার সন্দেহ নাই। যেমন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের ঔষধ দ্বারা অদৃষ্ট বশতঃ যদি তাহার নিজের অথবা তৎপুত্রাদির পীড়া শান্তি না হয়; তথাপি সেই ঔষধ দ্বারা যে অন্য ব্যক্তির পীড়া শান্তি হইতে পারে না ইহা যুক্তি যুক্ত নহে; বরং তাহা যে হইয়া থাকে, তাহা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। পরমেশ্বর অনন্ত ও তাঁহার কার্য্য অনন্ত; এবং শাস্ত্র অনন্ত, তাহা যে, সমুদায় মীমাংসা মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা হইবেক ইহা কখনই সম্ভব নহে। এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে তাহা হইয়াছে, তাহাও বলি না; অথবা যে যৎকিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে তাহাতে আমি অভিমান অথবা গর্ব্ব প্রকাশও করি না। তবে এই বৃহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় কেহ আমাকে মূর্খ অথবা ক্ষিপ্তপ্রায়ই বলুন কিম্বা প্রশংসাই করুন আমি তাহাতে রুষ্ট বা সন্তুষ্ট হইব না; কেননা ঈশ্বর যাহা করান তাহাই করি; তিনি যাহা লেখান তাহাই লিখি; আমি নিজে কেহ নহি ও কিছুই করি না*। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থ তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিচ তাঁহার স্তব কি তাহা জানিনা; কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে তাঁহাকে যে যাহা বলুক সকলই তাঁহার স্তব হইবেক; তাহার সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

পরমেশ্বরের স্তব।

হে পরমেশ্বর! তুমি অনন্ত শক্তিমচ্চৈতন্য; এবং তুমিই নিত্য অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তুমি অনাদি এবং এই জগতের আদি ও অনন্ত স্বরূপ। অতএব তুমি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ও সর্ব্বত্র ব্যাপী। তুমি নির্গুণ নিরাকার, ও সগুণ, এবং সাকার। হে জগন্ময়! তোমা হইতে এই

---

* ভগবদ্গীতায়াং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

ফলতঃ তিনি যাহা হইয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন ও যাহা হইতেছেন এবং যাহা করিতেছেন ও যাহা হইবেন এবং করিবেন তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে এবং হইবেক।

জগৎ প্রকাশ হয় অর্থাৎ তুমি কর্ত্তারূপে নিমিত্ত কারণ, শক্তিরূপে সহকারী কারণ, ও বস্তু রূপে উপাদান কারণ; এবং তুমি পুরুষ ও প্রকৃতি; মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার; এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অন্তঃকরণ; ও শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পরমাণু, এবং আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, ও পঞ্চীকৃত পঞ্চস্থূল মহাভূত। তুমি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং প্রাণ; ও কারণ সূক্ষ্মস্থূলশরীরধারী ভগবান। অতএব তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমিই শিব, তুমি দুর্গা, তুমি কালী, তুমি সূর্য্য, তুমি গণেশ প্রভৃতি সাকার দেব দেবী; ও গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকল পদার্থই তুমি; তোমা ভিন্ন জগতে আর কি আছে, তুমি কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, করণ, অপাদান ও অধিকরণ। আমরা যে বস্তু যাহাকে অর্পণ করি ও যাহার দ্বারা এবং যাহা হইতে অর্পণ ও যাহাতে অর্পিত হয় তৎসমুদায়ই তুমি। এবং তুমি শাস্ত্র ও গুরু এবং শিষ্য, তুমি সর্ব্বত্রে ও বস্তু মাত্রে এবং ভাবাভাব সকল পদার্থে বিরাজমান আছে, অথচ দৃশ্য বস্তুর কিছুই তুমি নহ। তুমি বিবর্ত্ত উপাদান রূপে স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃজন পালন লয় করিতেছ। তুমি কেবল পরমাত্মাস্বরূপ অনন্ত; কেহ তোমাকে জানিতে ও দেখিতে, এবং তোমার কৌশলও বুঝিতে পারেন না। আমি দীন হীন অবোধ, আমি তোমার ভাব কি জানিব তাহা কিছুই জানিতে পারি না। তোমাকে, যে ব্যক্তি যে ভাবে ও যেরূপে যে বস্তুতে উপাসনা করে; তুমি সেইরূপে ও সেই ভাবে তাহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান কর। কিন্তু বাল্যকালে বাক্য ও বুদ্ধি হীন প্রযুক্ত আমি তোমার উপাসনা করিতে পারি নাই, যৌবনকালে বিষয় মদে মত্ত হইয়া মন কেবল বিষয় চেষ্টায় নিরত থাকায় তোমার সাধনা করা হয় নাই এক্ষণে বৃদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া শ্বাস কাশাতিসার প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইতেছি; এবং চর্ম্মসকল ললিত ও দন্তসকল বিগলিত এবং কেশসকল ধবলিত হইতেছে; ও শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ এবং দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি গতিশক্তি মতিশক্তি রহিত হইতেছে তথাপি বিষয়তৃষ্ণা যাইতেছে না; অথচ মধ্যে মধ্যে কৃতান্তের নাম স্মরণ পূর্ব্বক মৃত্যু যাতনার আশঙ্কা হইতেছে। তাহাতে শমনের সহিত যুদ্ধের আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। কিন্তু তোমার ভক্তিরূপ রথে আরোহণ করিয়া ধ্যানরূপ শরাসন গ্রহণ করিতে

পারিতেছি না বলিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, হে দয়াময়! তুমি যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহাকে জয়ী করিয়াছিলে, তদ্রূপ নিজগুণে আমার হৃদয়-রথের সারথি হইয়া করাল-বদন কৃতান্তের যুদ্ধ হইতে আমাকে রক্ষা কর। যদ্যপি আমি তোমার ভজনা না করিয়া অনেক কুকর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু তুমি ভিন্ন এ পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব তুমি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর। যেরূপ পিতা মাতা পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন; তদ্রূপ তোমার এই অবোধ ও দুরাচার পুত্রের অপরাধ ক্ষমা কর; ও দুর্গতি বিনাশ কর। হে অভীষ্ট দেবতে! আমার মনোরূপ ভৃঙ্গ তব পদকমলে সমর্পণ করিলাম, তুমি শ্রীচরণে স্থান দান করিয়া শমন ভয় নিবারণ পূর্ব্বক সংসার যাতনা হইতে মুক্ত কর। হে পরমাত্মন্! যেন তোমায় আমায় আর প্রভেদ জ্ঞান না হয়। কেন না জগতের দৃশ্য বস্তু মাত্রেই মায়িক ও মিথ্যা, কেবল তুমি এক মাত্র অব্যক্ত শক্তিযুক্ত চৈতন্য; অর্থাৎ শিবশক্ত্যাত্মক ব্রহ্মই সত্য। তুমি ভুত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ে সমভাবে বিরাজমান আছ। এই মায়াময় জগৎ তোমাতে আরোপ মাত্র; বস্তুতঃ তুমিই অবিনাশী আত্মা; তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই; সুতরাং আমিও অন্য কিছু নহি; এবং কিছুই করি না। অতএব আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য; এবং আমার আর কিছুই প্রার্থনা নাই; তবে দেহান্তে যেন আর ভিন্ন ভাব না হয়। যেরূপ ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিত হইয়া অভিন্নভাবে থাকে; তদ্রূপ এই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল দেহ বিনষ্ট হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মা যেন অভিন্ন ভাবে থাকে, আর কখনই পৃথক না হয়। N. B. এক্ষণে গ্রন্থ সমাপ্ত করা যাউক।

যদ্যপি গ্রন্থ সমাপ্তির স্বতন্ত্র অধ্যায় না করিয়া এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা পদ্যাকারে লিখিত হইল। যথা—

গ্রন্থসমাপ্ত পদ্য।

শ্রী-গুরু শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত করি।
জ-গতে নিস্তার হেতু যে চরণ তরি॥

ন-রাধম জনগণে করিতে উদ্ধার।
মে-দিনী মণ্ডলে গুরু বিনা নাহি আর॥
জ-নমেজয় দ্বিজবর ঈশ্বর ইচ্ছায়।
য-ত্ন করি চিন্তা করে জ্ঞানের উপায়॥
ঘ-টনাতে ছিল যাহা তাহাই ঘটিল!
ট-ল মল চিত্ত শেষে সুস্থির হইল॥
কে-বল শাস্ত্রের মর্ম্ম করিয়া গ্রহণ।
র-চনা করিলা জ্ঞানতত্ত্বদর্শন॥
কৃ-তকার্য্য হইলা পরে গুরুর কৃপায়।
ত-থাপি মহাত্মাগণে সমর্পিলা তায়॥
জ্ঞান-তত্ত্বদর্শন দর্শনের সার।
তত্ত্ব-দর্শিগণ তাহে করিয়া বিচার॥
দর্শন-করুন ইহা মনোযোগ করি।
সমাপ্ত-হইল গ্রন্থ, বল হরি হরি॥
শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থ।

এই সমাপ্ত বিষয়ের পদ্যটীর প্রথম হইতে দ্বাদশ চরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চরণের প্রথমাক্ষর এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ চরণের প্রথম দুই দুই অক্ষর এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ চরণের প্রথম তিন তিন অক্ষর পর্য্যায় ক্রমে একত্র যোগ করিলে হইবেক যে, শ্রীজনমেজয় ঘটকের কৃত জ্ঞানতত্ত্বদর্শন সমাপ্ত।

সংগীতানন্দদায়িনী হইতে ২৭ সংখ্যক গীত—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

হরিনাম রসনে, ওরে রসনে।
নয়ন দর্শন কর সদা পীত বসনে।
শ্রবণ কর শ্রবণ, হরিগুণ সংকীর্ত্তন,
নিরন্তর ভাব মনঃ কুন্দরুচি দশনে। ১।
কর তুমি জপে থাক, বাক্য কেবল তাঁরে ডাক,
গাত্র তীর্থরজো মাখ, পদ চল বৃন্দাবনে।
ঘ্রাণ লও তুলসী-ঘ্রাণ, শান্ত হও অপান স্থান,
দীন হীনের এ বিধান, ভব ভয় বিনাশনে। ২।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১০	স্থল	স্থূল
১৫	৪	আন্য	অন্য
,,	১১	দেহা	দেখা
১৬	২৩	শুন	শুণ
২০	৪	কস্মিন কলেও	কস্মিন কালেও
২৩	১৬	হইভে	হইতে
,,	২১	আন্যান্য	অন্যান্য
২৪	২১	তর্জ্জন্য	তজ্জন্য
২৭, ২টীকা	১	বৃহৎ কুর্ম্ম	বৃহৎ ধর্ম্ম
২৮	১৮	ধর্ম্মশাস্ত্রে	ধর্ম্মশাস্ত্র।
২৯	১৯	বাভট্ট	বাগভট্ট †
৩১	১৭	প্রর্থাৎ	অর্থাৎ
৩২	১০	জন্মেজয	জনমেজয়
৩৫	৭	অথবা	অথবা
৩।	৭	উদ্ভৃত	উদ্ধৃত
৪০	১২	কবিস্তে	করিতে
৪৩	২০	দশলে	দর্শনে
৪৬	১	কর যাইতে	করা যাইতে
ঐ	৩	অভিস্ন	অভিন্ন
ঐ, ২টীকা	১	স্যাপ্যো	স্যাপ্য
ঐ, ৩টীকা	১	স্তাস্ত	স্তাংস্ত
৪৭	১	নিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত
ঐ	৯	উশুৃত	উদ্ধৃত
৪৮	৯	মনুর	মনুর গ্রন্থের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ, ১ টীকা	১	সম্ভা	সম্ভবা
৫০	৯	সকলে	সকল
৫১	২	সংখ্যা	সাঙ্খ্য
ঐ	৪	ভোগ	যোগ
ঐ	১০	কাঠিন্যপ	কাঠিন্য°
ঐ	১১	তাতা	তাহা
ঐ	১৫	যোগ	যোগে
৫২	২৬	প্রকশে	প্রকাশ
৫৫	৫	তাহারও	তাহারাও
৬৭	১৬	বুদ্ধদের	বুদ্ধদের
৬৮	৩	রাহিয়াছে	রহিয়াছে
৬৯	২৪	পঞ্চীকয়ন	পঞ্চীকরণ
৭০	২৪	যোগ হওরার	যোগ হওযার
৭১	২০	ইতি	ইনি
৭২	৪	দশা	দশ
ঐ	১৭	প্রনয়াব	প্রলয়াব
ঐ	২৩	খ্যাভ	খ্যাত
৭৪	৬	হইবাছে	হইয়াছে
ঐ	১১	কবেক	করেন
৭৫	১৪	বহা হায়	বলা হয়
৭৯, ১টীকা	১	কেতুমান	কেতুমাল
ঐ, ২টীকা	১	জম্বুদ্বীপে উপদ্বীপ	জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে উপদ্বীপ
৮০	১৫	বসেন	বলেন
৮১, ৩টীকা	১	কোঁপন	ফোঁপল
৮২	৩	পর্ব্বতের উপব সুমেরু	পর্ব্বতের উপর ও সুমেরু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ	৪	কৈলাস সর্ব্বত	কৈলাস পর্ব্বত
৮৩	১৯	বলেন বে	বলেন যে
৮৪	২০	দুববর্ত্তী	দুববর্ত্তী হওয়াতে
৮৫	২	অনেকে	অনেক
ঐ, ১টীকার২		পর্ব্বতেব উত্তব	পর্ব্বতেব উপব
৮৬	১৪	সিদ্ধান্তে	সিদ্ধান্ত
৮৭	৩	পৃথিবীব	পৃথিবী
ঐ, ১টীকা	৩	প্রকৃতি	প্রকৃত
৮৯	১৭	তারাটীব	তাবাটী
ঐ	১৯	তারাটীব	তারাটী
৯১	২	পৃথিবীর	পৃথিবী
ঐ	২০	পৃথিবীর বৃহৎ	পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ
৯৪	৮	যিন	যিনি
ঐ	১৮	ষোবা	ঘোরা
ঐ	২০	ধর্ম্মশাস্ত্রে	ধর্ম্মশাস্ত্র
ঐ	২২	একাবণে	অকারণে

৯৬ ১ পংক্তির শেষ অক্ষব হইতে এই কথা যোগ করিতে হইবেক (ইহার একশত বৎসরে ঈশ্বরের এক দিন ও ঐ কাল রাত্রি হয় তিনি)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ	১৪	এক বৎসরে	একশত বৎসবে
১০৩	৮	কালতে	কালেতে
ঐ	১১	পশ্চিল	পশ্চিম
ঐ	২০	পরেশ্বব	পরমেশ্বর
১০৫, ২টীকা	৩	পদাথ	পদার্থ
১০৮, ২টীকা	১	কনিক	কালীক
১১০	৮	হইলে	হইল
১২০	১০	প্রাকায়	প্রকার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩১	১৩	অদৃষ্টাসারে	অদৃষ্টানুসারে
১২৪	২৫	প্রথন	প্রথম
১৩৩	৬	সর্গ	স্বর্গ
ঐ	৮	পাপ করিয়া	পাপকারিরা
১৩৮	১৯	সহকারে কারণ	সহকারি কারণ
১৪৬	১৮	তদ্বিরিতাচরণ,	তদ্বিপরীতাচরণ
১৪৯	৫২	জানাইতেছে,	জানা যাইতেছে
ঐ	২০	নিযেধ বিধির আচবণ	নিষেধ বিধিব অনাচবণ
১৫০, ২টীকা	২	সবাহুগমন	সবানুগমন
১৫১,১টীকাব	১	নিম্বা	কিম্বা
১৫৩	৩	ইচ্ছ্যা	ইচ্ছা
ঐ	১১	করিয়াছেম	করিয়াছেন
১৫৫	১৪	ভ্রাহ্মণেরা	ব্রাহ্মণেবা
১৫৬	২	অপসাদ	অপসদ
ঐ	২১	দৃশদীতিনদ্বর	দৃশদ্বতীনদীর
ঐ	২৪	আচরই	আচারই
ঐ	২৫	স্থানন্তরিত	স্থানান্তবিত
১৫৭	১	উন্ত্রশব্দ	(হইবেকনা)
ঐ	১৫	হইবার	হইবায়
১৫৯	১২	তন্ত্রবহিত	তন্ত্রবিহিত
১৬৩	১৬	প্রযুক্ত	প্রযুক্ত
১৬৬	১	হানবর্ণের	হীনবর্ণের
ঐ	২২	ভবিষত	ভবিষ্যত
১৬৯	১৮	সতীবেশ্যারা,	বেশ্যারা সতী
১৭৬	১	ও অগ্নিদগ্ধ	ও অনগ্নিদগ্ধ
১৮০	৭	শ্লোকে	শ্লোক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ	১৮	বর্ম্মাচরণ	ধর্ম্মাচরণ
১৯৬	১০	সমাজ	সমাজে
ঐ, ২টীকা	১	ভর্ত্তাণ্ডেযর	ভর্ত্তাণ্ডের
১৯৭	১৩	* চিহ্ন ইহা ১৫ ছত্রের চিহ্ন	হইবেক
১৯৮	২	‡ চিহ্ন ইহা ১৯৭ পৃষ্ঠার	২টীকার চিহ্ন হইবেক
১৯৯	১৮	দনান্তে	দিনান্তে
২০১	১১	বিশষ	বিশেষ
ঐ, ১টীকা	১	পর্ণাবতার	পূর্ণাবতার
২০২, ১টীকা	১	ইহয়া	ইহারা
২০৬১, টীকা	১	কামোদস্থরতা,	কামোৎসুরতা
০৭	২	দৃশ্যাত্য	দৃশ্যাতঃ
০৮	১০	মাধুর্য্য রসে রসে	মাধুর্য্য রসের যে
	১২	অনীর্ব্বচনীর	অনির্ব্বচনীয়
১২	১১	স্মঢ়েরা	মূঢ়েরা
১৫	২৩	সুখ্য গুন গুণ পদার্থে	সুখ্য গুণ পদার্থে
১৬	৩	এবং অব্যক্ত	হইলে অব্যক্ত
ঐ	টীকা শেষে	অহং ব্রহ্মাস্মি,	অহং ব্রহ্মাস্মি
১৮	১৬	শাস্ত্রে	শাস্ত্র
১৯	৫	শাস্ত্রে	শাস্ত্র
ঐ	১৭	নাহর	না হয়
২০	১৬	নেমিত্তক	নৈমিত্তিক
১	৩	ঈশ্বরের	ঈশ্বরে
২২৩	১৫	পাম্বিন্দ্রিয়	পায়িন্দ্রিয়
২২৪	১৮	নিত্য	নিত্যা
ঐ	২১	সমধি	সমাধি
২২৫	১১	করিত	কারিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ	২০	প্রাণায়াস	প্রাণায়াম
ঐ	২২	তদ্বিতীয়	অদ্বিতীয়
২১৬	২১	অববম্বন	অবলম্বন
২২৮	৪	শিক্ষাথে	শিক্ষার্থে
২৩০	৭	যাইক	যাউক
২৩২, ১টীকা	২	বৈতী	বৈতি
ঐ	৬	সম্ভব	সম্ভব
২৩৫	১০	অজ্ঞাতার	অজ্ঞতার
২৩৭	৪	যেরূপ	যেরূপ
২৩৮	১৮	যাইতেছে	যাইতেছে
২৩৯	৪	মহাদব	মহাদেব
২৪১	১৫	দোয়	দোষ
২৪২	১৮	এঘং	এবং
ঐ	১৯	প্রযুক্র	প্রযুক্ত
ঐ	১১	কার্ষ্যে	কার্য্যে
ঐ	২২	তরে	তবে
ঐ	২৩	যে	যে
২৪৩	৯	স্বেচ্ছাচারীয়া	স্বেচ্ছাচারীরা
ঐ	২২	যাদ বল যে	যদি বল যে
২৪৪	৯	সত্থাধিকা	সত্ত্বাধিকা
ঐ	৪	আসক্তা	আসক্ত
২৪৬	৯	করিয়	করিয়া
ঐ	১৩	উপকরই	উপকারই
ঐ	১১	প্রকর	প্রকরণ
ঐ, ২টীকা	১	তাৎপয্য	তাৎপর্য্য
২৪৭	৬	যথার্থ্য	যাথার্থ্য—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৮	২৮	ষে	যে
৪৯	৭	ষে	যে
৫০	২২	বৃদ্ধকালে	বৃদ্ধকাল
:০	১৮	ষে বস্তুতে	যে বস্তুকে
ঐ	২	বক্তু	বস্তু
ঐ	২৭	নৃদ্ধের	যুদ্ধের

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মুদ্রাঙ্কনের দোষে এই গ্রন্থে কতিপয় শব্দ ও অক্ষর অশুদ্ধ ও ভ্রম হইয়াছে তন্নিমিত্ত শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করা ইল। ইহাতে সাধ্যমত সংশোধন করা হইয়াছে, যদি .হাতেও ভ্রম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা সংশোধন র্বক পাঠ করিবেন ; কিন্তু দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কন সময়ে এই ম পরিহারের চেষ্টা করিব। নিবেদন ইতি

সাহায্যপ্রাপ্তি।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থে মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য করায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

নাম।	ধাম।
মহারাজা	বলিহার
বাবু শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	গোয়াড়ি
„ রামবক্স চেৎনঙ্গিয়া	ঐ
„ রামেশ্বর রায়	ঐ
„ রঘুবরদয়াল ওয়াস্তী	ঐ
„ মৃত্যুঞ্জয় রায় উকীল	ঐ
„ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল	ঐ
„ প্রসন্নকুমার বসু উকীল	ঐ
„ নবীনচন্দ্র সরকার	ধোপাদী ডাহুকা
„ নীলকমল সিংহ মোক্তার	জেলা যশোহর
„ রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নায়েব	কাষ্টভঙ্গা
„ ব্রজেন্দ্রগোপাল রায়	ময়ূরহাট
„ দ্বারকানাথ সরকার	সর্ব্বানন্দপুর
„ জয়দেব মুখোপাধ্যায়	হরধাম
„ কুঞ্জলাল ডাক্তার	গোয়াড়ি
„ হীরালাল চৌধুরী	ঐ
„ পাল চৌধুরী মহাশয়গণ	রাণাঘাট